ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও স্থূলতা
প্রতিরোধ ও নিরাময়ে সমান কার্যকর

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ

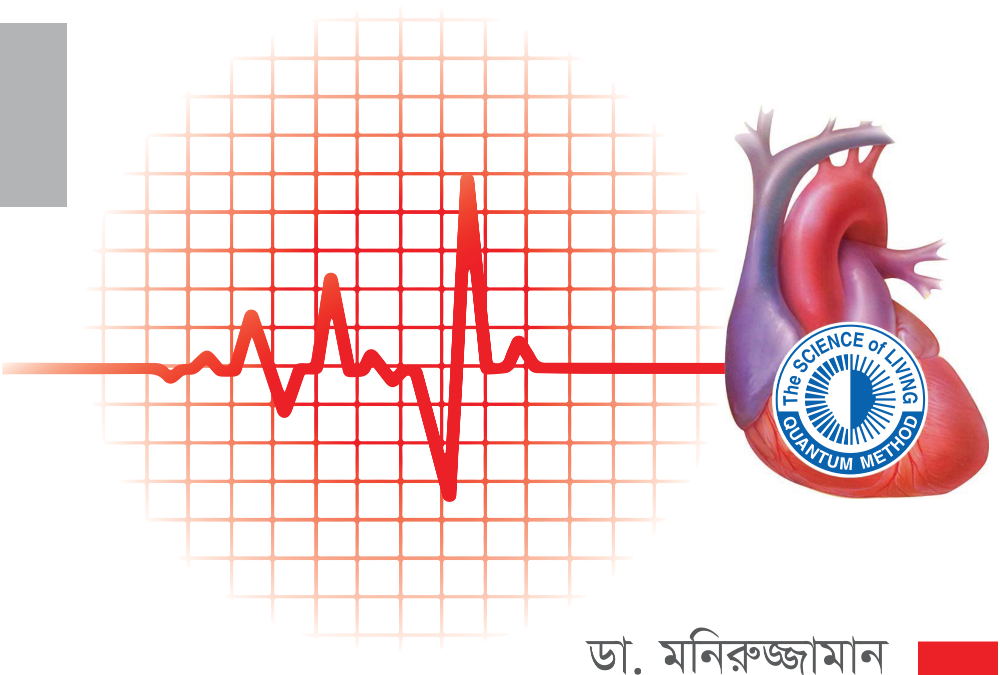

ডা. মনিরুজ্জামান
ডা. আতাউর রহমান

এনজিওপ্লাস্টি ও
বাইপাস সার্জারি ছাড়াই

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ

করোনারি হৃদরোগ কি শুধুই হৃৎপিণ্ডের রোগ? নাকি এর মূলে আছে আমাদের অসুস্থ জীবনাচার? কী সেই আচরণ-অভ্যাস? দিনের পর দিন যা আমরা করে চলেছি না জেনে আর আক্রান্ত হচ্ছি হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতাসহ নানা রকম মরণব্যাধিতে। কিংবা এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারিই কি হৃদরোগের একমাত্র সমাধান?

প্রশ্নগুলো দরকারি। উত্তর জানা থাকলে সমাধানও সহজ। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বশেষ গবেষণা ও তথ্য-উপাত্তের আলোকে সাজানো এই বইটিতে মিলবে এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর।

পড়ুন। বিস্তারিত জানুন করোনারি হৃদরোগের কারণ, প্রতিকার ও নিরাময় সম্পর্কে। পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে অনুসরণ করতে শুরু করুন। জেগে উঠুন সুস্থতার আনন্দে।

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ

সংকলন ও সম্পাদনা

ডা. মনিরুজ্জামান

ডা. আতাউর রহমান

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

quantummethod.org.bd

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই
হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ

সংকলন ও সম্পাদনা

ডা. মনিরুজ্জামান
ডা. আতাউর রহমান

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ২২২২২১৪৪১, ২২২২২৫৭৫৬, ০৯৬১৩-০০২০২৫
০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd

প্রথম প্রকাশ

১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

মার্চ, ২০২১

মুদ্রাকর

প্রজ্ঞাপ্রকাশ
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

৫৫০ টাকা

Angioplasty O Bypass Surgery Chharai
Hridrog Niramoy O Protirodh

(Reversal & Prevention of Heart Disease without Angioplasty & Bypass Surgery)

Published by

Quantum Foundation
quantummethod.org.bd

Price : $30

ISBN : 978-984-34-2478-5

উ ৎ স র্গ

সঠিক জীবনদৃষ্টি ও
সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ করে
সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক
জীবনযাপন করছেন যারা,
কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের
সেইসব সদস্যের প্রতি—

সূচিপত্র

আপনিও পারবেন । ৯
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা । ১১

করোনারি হৃদরোগ : কারণ, প্রতিরোধ ও নিরাময়

হৃৎপিণ্ড পরিচিতি ও করোনারি হৃদরোগ । ১৬
ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি, টেনশন ও স্ট্রেস ॥ হৃদরোগের অন্যতম কারণ । ২৮
করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা ॥ সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকি । ৩৮
সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস হৃদরোগ নিরাময় করে । ৫৩
মেডিটেশন হৃদরোগ নিরাময়ে কার্যকর । ৬৮
বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস ॥ হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে অপরিহার্য । ৭৮
কোয়ান্টাম ইয়োগা করুন ॥ নিয়মিত হাঁটুন । ১৬৮
ধূমপান ॥ নীরবে বাড়িয়ে চলে হৃদরোগের ঝুঁকি । ২০০
শোকরগোজার হোন ॥ আপনি হবেন
সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের অধিকারী । ২০৬
কার্যকর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও দীর্ঘজীবনের রহস্য । ২১৪

সূচিপত্র

অন্যান্য লাইফস্টাইল ডিজিজ ॥ কারণ, প্রতিরোধ ও নিরাময়

উচ্চ রক্তচাপ ॥ ওষুধ ছাড়াই নিরামায় | ২২২
ডায়াবেটিস ॥ ওষুধ ছাড়াই নিরামায় | ২২৯
স্থূলতা ও ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ॥ কারণ, প্রতিরোধ ও নিরাময় | ২৩৭

চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অভিমত ও সাফল্যগাথা

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যা বলছেন | ২৪৭
আমরা ভালো আছি ॥ ওষুধ ছাড়াই
ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ জয়ের অনুভূতি | ২৬৩

বিবিধ

গ্রুপ সাপোর্ট ও কাউন্সেলিং ॥ আপনি একা নন | ২৮০
হৃদবান্ধব খাদ্যতালিকা ও সুস্বাদু রেসিপি | ২৯০
তথ্যসূত্র | ৩৩৪

আপনিও পারবেন

হৃদরোগ বলতে সাধারণভাবে করোনারি হৃদরোগকেই বোঝানো হয়। বিশ্বে প্রতিবছর পৌনে দুই কোটিরও বেশি মানুষ এ রোগে মৃত্যুবরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি হচ্ছে হৃদরোগ। সেখানে বছরে ৩০ শতাংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করে এ রোগে। জীবনদৃষ্টি ও জীবনাচারে ভুলের কারণে বাংলাদেশসহ প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এ রোগের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। গবেষকেরা বলছেন, হৃদরোগ ইতোমধ্যে বাংলাদেশে নীরবে মহামারি আকার ধারণ করেছে।

করোনারি হৃদরোগের অত্যাধুনিক চিকিৎসা এখন বিশ্বজুড়ে প্রচলিত—এনজিওপ্লাস্টি, বাইপাস সার্জারি, রোবটিক সার্জারি ইত্যাদি। কিন্তু খোদ চিকিৎসকেরাই বলছেন, সমস্যা থেকে যাচ্ছে সমস্যার জায়গাতেই। আর এসব পদ্ধতির মাধ্যমে রোগীর পুনঃব্লকেজও প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীরা একটি রোগচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

গত শতকের শেষের দিকে ক্যালিফোর্নিয়ার চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. ডিন অরনিশ সর্বপ্রথম এর কার্যকর সমাধানটি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। প্রাচ্যের সাধকদের হাজার বছরের জ্ঞান-উপলব্ধির সাথে তিনি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক চমৎকার সমন্বয় ঘটান। হৃদরোগীদের লাইফস্টাইল বা জীবনযাপন পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে তিনি উদ্ভাবন করেন করোনারি হৃদরোগের ফলপ্রসূ চিকিৎসাপদ্ধতি। অরনিশের উদ্ভাবনকে স্বীকৃতি দিয়ে বিশেষ গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় *জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন*, *ল্যানসেট* ও *আমেরিকান জার্নাল অব কার্ডিওলজি*-র মতো বিশ্বের প্রথমসারির চিকিৎসা-সাময়িকীগুলোতে এবং এর অন্তর্ভুক্তি ঘটে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলধারায়।

আসলে সুস্থতা ও নিরাময়ের জন্যে সুস্থ জীবনাচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ক্রমাগত ভুল জীবনযাপনের ফলে যে রোগের সূত্রপাত, জীবনাচার পরিবর্তনই হতে পারে তার প্রকৃত সমাধান। পৃথিবীজুড়ে আধুনিক ধারার

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা তাই একবাক্যে বলছেন, সুস্থ জীবনের জন্যে সুস্থ জীবনাচারের কোনো বিকল্প নেই। আর এ-ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন গত তিন দশক ধরে এদেশে সচেতনতা সৃষ্টি করে আসছে। সে ধারাবাহিকতায় আরো সমন্বিতভাবে কাজ শুরু করেছে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব।

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে মূলত ছয়টি বিষয়ের সুসমন্বয়ে। সেগুলো হলো : সঠিক জীবনদৃষ্টি, মেডিটেশন, বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস, কোয়ান্টাম ইয়োগা, নিয়মিত হাঁটা এবং কাউন্সেলিং। আমরা দেখেছি, এ বিষয়গুলোর প্রতিটিতেই যারা সমান মনোযোগ দিয়েছেন এবং অনুসরণে আন্তরিক থেকেছেন, তারা ক্রমশ হয়ে উঠেছেন আগের চেয়ে সুস্থ প্রাণবন্ত ও কর্মোদ্যমী।

এমনও হৃদরোগী আছেন, যার হৃৎপিণ্ডে ৭০ থেকে ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত ছয়টি ব্লকেজ শনাক্ত হয়েছিল এবং হাঁটাচলা তো দূরে থাক; বরং প্রাত্যহিক ছোটখাটো কাজকর্ম করতে গিয়েও যিনি তীব্র বুকব্যথায় আক্রান্ত হতেন, তিনিই এখন সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ করে বেশ ভালো আছেন। একজন পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতোই প্রতিদিন এক থেকে দেড় ঘণ্টা পার্কে হেঁটে বেড়াচ্ছেন তারুণ্যদীপ্ত গতিতে।

সুস্থতার এ আনন্দ-অনুরণন সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতেই কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব প্রকাশ করেছে *এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ*। আমরা বিশ্বাস করি, এ বইটি আপনার ও আপনার হৃৎপিণ্ডের মাঝে একটি সেতুবন্ধন রচনা করবে। সেইসাথে আপনি লাভ করবেন সার্বিক মনোদৈহিক সুস্থতার এক অনবদ্য সুখানুভূতি।

প্রিয় সুহৃদ, জীবন আপনার। দেহ-মন আপনার। এই জীবনকে সুন্দর করার, দেহ-মনকে সুস্থ রাখার দায়িত্বও আপনারই।

তাই সুস্থতার ব্যাপারে বিশ্বাসী হোন। সচেতনভাবে উদ্যোগী হোন। আজ থেকেই প্রতিদিন একটু একটু করে সুস্থ জীবনাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠুন। আপনি সুস্থ থাকবেন।

আপনার সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা ও সাফল্য কামনা করি।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর ৭০ ও ৮০-র দশকে বাংলাদেশে অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ ছিল সংক্রামক রোগ; এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ডায়রিয়ায়। সচেতনতা বৃদ্ধি, চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ইত্যাদির ফলে সংক্রামক রোগে মৃত্যু ধীরে ধীরে কমতে থাকে। অন্যদিকে বাড়তে থাকে অসংক্রামক রোগে মৃত্যু। ১৯৮৬ সালে যেখানে অসংক্রামক রোগে মৃত্যু ছিল ৮%; ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৯% এবং ২০১৬ সালে ৬৭%; এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে হৃদরোগে, প্রায় ১৫%। মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ ছিল ক্যান্সার। অন্যান্য কারণের মধ্যে ধূমপান, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, ফুসফুসের ক্রনিক রোগ অন্যতম।

এর কারণ কী? গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এর প্রধান কারণ আমাদের জীবনদৃষ্টি ও জীবনাচারে পরিবর্তন। নেতিবাচক জীবনদৃষ্টি, সামাজিক অস্থিরতা, পারিবারিক অশান্তি, অর্থনৈতিক অতৃপ্তি ইত্যাদি কারণে যেমন হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ছে; অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান ও শারীরিক পরিশ্রমহীনতার কারণে হৃদরোগ এমনকি হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত ঘটে যাচ্ছে। এ-ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি পাঁচ জনে একজন উচ্চ রক্তচাপে এবং প্রতি ১০ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত।

হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, স্থূলতা—এই রোগগুলোকে একত্রে বলা হয় 'লাইফস্টাইল ডিজিজ'। লাইফস্টাইল অর্থাৎ জীবনযাত্রার ভুল থেকেই হয় এ রোগগুলো। প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হলেও এই রোগগুলো হওয়ার পেছনের কারণগুলো মোটামুটি একই রকম। তাই এগুলোর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পেছনের কারণগুলোকেও সামনে আনা প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, পেছনের কারণগুলো পেছনেই থেকে যাচ্ছে, সামনে থাকছে শুধু ওষুধ আর সার্জারি। অথচ আমরা সকলেই জানি, ওষুধ খেয়ে বা সার্জারি করে এসব রোগে পূর্ণ নিরাময় হয়েছে—এমন নজির নেই।

শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র একই চিত্র, এমনকি আমেরিকাতেও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ঘটনাই বলে দেয়—কী হচ্ছে

সেখানে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ও ব্যয়বহুল। হাই-টেক এই চিকিৎসাব্যবস্থার বলি হচ্ছেন অনেকেই, যেমন হয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।

২০০৪ সালে বিল ক্লিনটন করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে বিল ক্লিনটনের চিকিৎসকেরা তার বাইপাস অপারেশন করেন। বাইপাসের পর ক্লিনটন ভালোই ছিলেন। ওষুধপত্র নিয়মিত খাচ্ছেন আর জীবনযাপন করছেন আগের মতোই। ২০১০ সালে তার আবার বুকে ব্যথা হয়। সমস্যা বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার করোনারি ধমনীতে দুটি স্টেন্ট বা রিং পরানো হয়। আগের মতোই সবকিছু চলতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হৃদরোগ চিকিৎসার প্রধান দুটি পন্থা—এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি—দুটোই তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে গেছে। কিন্তু ক্রমশ অবস্থার অবনতি হচ্ছে। এখন কী করণীয়?

ঠিক এমন পরিস্থিতিতে ক্যালিফোর্নিয়ার কার্ডিওলজিস্ট ডা. ডিন অরনিশ এবং ওহাইও-র ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের সার্জন ডা. কাল্ডওয়েল এসেলস্টাইন মিলিতভাবে বিল ক্লিনটনকে ভিন্ন চিকিৎসা দেন। তারা তার খাদ্যাভ্যাসে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তাকে দেয়া হয় Whole Foods, Plant Based Diet. এতে সমস্ত প্রাণিজ আমিষ (মাছ মাংস ডিম দুধ) বন্ধ রাখা হয় এবং উদ্ভিজ্জ আমিষসহ পূর্ণ শস্যদানা (whole grain), ফলমূল শাকসবজি সালাদ বিন মাশরুম ইত্যাদি দেয়া হয় এবং একদম বিনা তেলে রান্না করা হয়—যা 'ভেগান ডায়েট' নামে পরিচিত। সাথে ব্যায়াম।

কিছুদিনের মধ্যেই তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। ছয় মাসের মধ্যেই তিনি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। জীবনধারা পরিবর্তনের এই অসাধারণ ফলাফল দেখে বিস্মিত বিল ক্লিনটন তার অনুভূতির কথা মিডিয়ার কাছে তুলে ধরেন। শুধু বিল ক্লিনটন নন, আমেরিকায় বহু হৃদরোগী ডা. ডিন অরনিশ এবং ডা. কাল্ডওয়েল এসেলস্টাইনের জীবনধারা পরিবর্তনের কর্মসূচি অনুসরণ করে তাদের ব্লকেজ রিভার্স অর্থাৎ হৃদরোগ নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছেন।

ডা. ডিন অরনিশের গবেষণা এবং কোয়ান্টাম মেথডের দীর্ঘ দেড় যুগের অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১০ সালের ২৩ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে

'কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব'-এর যাত্রা শুরু হয়। গত ১০ বছরে বহু হৃদরোগী হার্ট ক্লাবের সাথে যুক্ত থেকে তাদের জীবনদৃষ্টি ও জীবনধারা বদলে হৃদরোগমুক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজনের ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো।

মো. সফিউল্যা, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। ২০০৭ সালে বুকে ব্যথা হলে একপর্যায়ে তার এনজিওগ্রাম করা হলো। পাওয়া গেল ২টি ব্লকেজ (এলএডি-তে ৭০%, এলসিএক্স-এ ৯৯%)। চিকিৎসকেরা ২টি ধমনীতে ২টি রিং পরানোর কথা বলেন। কিন্তু তিনি সেদিকে না গিয়ে অংশ নেন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের দুই দিনের ওরিয়েন্টেশনে। জীবনাচার পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তিনি ভালো বোধ করতে থাকেন। ২০১৫ সালে তার চেক এনজিওগ্রাম করা হয়। রিপোর্টে দেখা গেল, তার দুটো ব্লকেজই অনেকাংশে রিভার্স হয়েছে (কমে গেছে)। এলএডি-র ব্লকেজটি ৭০% থেকে কমে হয়েছে ৫০% এবং এলসিএক্স-এর ব্লকেজটি ৯৯% থেকে কমে হয়েছে ৩০%।

মো. মফিজুর রহমান, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। ২০১১ সালে তার হার্ট অ্যাটাক হয়। এনজিওগ্রাম করে দেখা গেল—এলএডি, এলসিএক্স এবং আরসিএ-তে ব্লকেজ। এলসিএক্স-এর ৭৫% ব্লকেজটিতে একটি রিং পরানো হয়। কদিন পর সুস্থ হয়ে তিনি বাসায় ফিরে যান। এর পরেও তিনি স্বাভাবিক কর্মজীবনে যেতে পারছিলেন না। ইকোকার্ডিওগ্রাম রিপোর্টে তার ইজেকশন ফ্র্যাকশন (EF) আসে মাত্র ৩৫%। পাঁচ মিনিট হাঁটলেই হাঁপিয়ে উঠতেন। ওষুধ পরিবর্তন করেও অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল না।

এক শুভাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শে তিনি হার্ট ক্লাবের জীবনধারা পরিবর্তনের প্রোগ্রামে অংশ নেন। ৩ মাসের মধ্যেই তার অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। ৬ মাস পর তিনি ঘণ্টায় চার মাইল বেগে হাঁটতে থাকেন। ২০১৫ সালে তারও চেক এনজিওগ্রাম করে দেখা গেল, এলএডি ও এলসিএক্স-এ যে ব্লকেজ ছিল তা রিভার্স হয়ে গেছে। কিন্তু আরসিএ-র ব্লকেজটি অপরিবর্তিত। তবে ইজেকশন ফ্র্যাকশন (EF) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২%-এ। তিনি এখন বেশ কর্মব্যস্ত দিনযাপন করছেন।

আরো যারা কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব নির্দেশিত জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাদের কয়েকজনের অনুভূতি বর্ণিত হয়েছে এ বইয়ের 'আমরা ভালো আছি' অধ্যায়ে (পৃ. ২৬৩)।

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালিত হয় ২০১৫ সালে। ৩২ জন অংশগ্রহণকারীর ওপর পরিচালিত গবেষণায় জীবনাচার পরিবর্তনের আগের ও পরের এনজিওগ্রাম রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, যারা আন্তরিকভাবে হার্ট ক্লাবের ফলো-আপ প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের অধিকাংশেরই ধমনীর ব্লকেজ কমে গেছে (রিভার্স হয়েছে) বা কমতে শুরু করেছে। গবেষণা থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, সঠিক জীবনদৃষ্টি ও জীবনধারা এবং মেডিটেশন করোনারি ধমনীর ব্লকেজ কমাতে পারে। এই গবেষণার ফলাফল ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় Journal of Current and Advance Medical Research (JCAMR)-এ।

পৃথিবীজুড়ে শত শত গবেষণার উপসংহার হচ্ছে—এই রোগগুলো হওয়ার পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ ভুল বা অবৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত প্রাণিজ আমিষ খেলে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে। মানুষের পুষ্টি-সংক্রান্ত ৩৫ বছরের দীর্ঘ গবেষণা থেকে ড. টি. কলিন ক্যাম্পবেল প্রণীত বই *দ্য চায়না স্টাডি*-তে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে ক্যান্সার বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ অতিরিক্ত প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ। এ-ছাড়া হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ও ডায়াবেটিসের প্রধান কারণ অতিরিক্ত প্রাণিজ খাবার, চিনি ও রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট, প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ, স্থূলতা, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও টেনশন।

সুতরাং যারা এ সকল রোগ প্রতিরোধ বা নিরাময় করতে চান, তাদের জন্যে এ বইটি হতে পারে চমৎকার একটি গাইড বুক। আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের আলোকে লিখিত এই বইটি থেকে পুষ্টি-সংক্রান্ত বিষয়গুলোও জানতে পারবেন। এ-ছাড়াও পাবেন জীবনদৃষ্টি, প্রাণায়াম, ব্যায়াম ও মেডিটেশন বিষয়ক পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা।

এরপর রইল অনুসরণ। শুরু করুন, অবশ্যই আপনি পরিবর্তন লক্ষ করবেন। আর বইটি পড়ে জীবনধারা পরিবর্তনের কর্মসূচি শুরু করলেও ওষুধ-সংক্রান্ত যে-কোনো সিদ্ধান্ত আপনার চিকিৎসকের সাথে পরামর্শক্রমে গ্রহণ করবেন। আমরা আশা করি, আপনি সুস্থ ও কর্মব্যস্ত দীর্ঘজীবনের অধিকারী হবেন।

মেডিটেশন, ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস বদলের ফলে ব্লকেজ রিভার্সের উদাহরণ

পূর্বের এনজিওগ্রাম

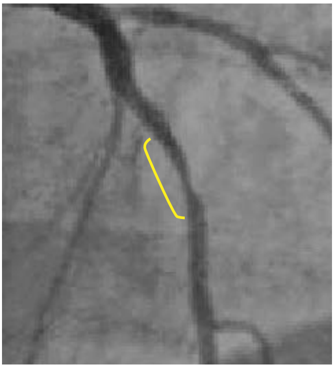

পরের এনজিওগ্রাম

মো. সফিউল্যার এলসিএক্স ধমনীর ৯৯% ব্লকেজটি তিন বছর পর ৩০%-এ পরিণত হয়েছে।

পূর্বের এনজিওগ্রাম

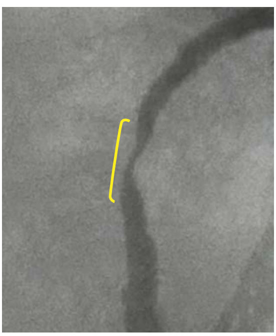

পরের এনজিওগ্রাম

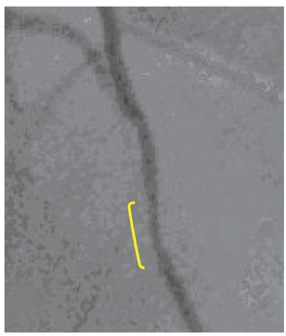

মো. মফিজুর রহমানের এলএডি ধমনীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্লকেজ ছিল। তিন বছর পর সেখানে আর কোনো ব্লকেজ নেই (free of disease)

পূর্বের এনজিওগ্রাম

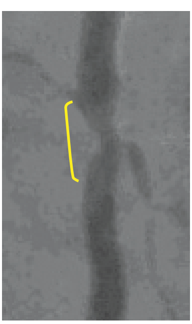

পরের এনজিওগ্রাম

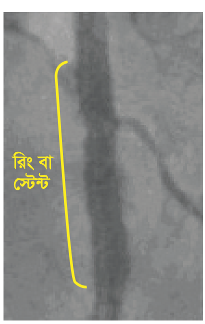

মো. মফিজুর রহমানের এলসিএক্স ধমনীতে ৭৫% ব্লকেজে রিং (স্টেন্ট) লাগানো হয়েছিল। তিন বছর পরও রিংটি ঠিকভাবে কাজ করছে এবং সেখানে নতুন কোনো ব্লকেজ তৈরি হয় নি (free of disease)

হৃৎপিণ্ড পরিচিতি ও করোনারি হৃদরোগ

হৃৎপিণ্ড পরিচিতি | ১৭
করোনারি হৃদরোগ : প্রাথমিক ধারণা | ১৯
করোনারি হৃদরোগ : প্রকার ও ধরন | ২২
করোনারি হৃদরোগের কারণ | ২৩

সুস্থ থাকার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের সহজাত।
সুস্থতা স্বাভাবিক আর অসুস্থতা হলো অস্বাভাবিক।

হৃৎপিণ্ড পরিচিতি ও করোনারি হৃদরোগ

মানবদেহ স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টি। মহাবিশ্বে এত চমৎকার, এত বুদ্ধিমান, এত সৃজনশীল, এত সংবেদনশীল আর কোনো সৃষ্টির অস্তিত্ব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এ মানবদেহেরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হচ্ছে হৃৎপিণ্ড। বুকের মাঝখানে দুই ফুসফুসের মাঝে এটি অবস্থিত।

হৃৎপিণ্ড পরিচিতি

হৃৎপিণ্ডের গঠনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এর রয়েছে চারটি প্রকোষ্ঠ। ওপরের দুটিকে বলা হয় অ্যাট্রিয়াম বা অলিন্দ এবং নিচের দুটিকে বলা হয় ভেন্ট্রিকল বা নিলয়। আর হৃৎপিণ্ড চারপাশে পেরিকার্ডিয়াম নামক একটি আবরণী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

হৃৎপিণ্ডকে আমরা বলতে পারি—এটি একটি পাম্প, যা একজন মানুষের জীবদ্দশায় প্রায় সাড়ে চার কোটি গ্যালনের চেয়ে বেশি রক্ত পাম্প করে থাকে। প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষবার হৃৎস্পন্দনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড দেহের প্রতিটি কোষে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও অক্সিজেন পৌঁছে দিচ্ছে। আর এটি সম্ভব হচ্ছে ধমনী শিরা উপশিরা ও ছোট ছোট রক্তনালী মিলিয়ে প্রায় ৬০ হাজার মাইল পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে।

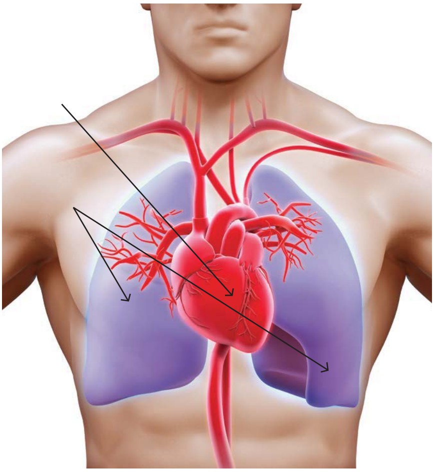

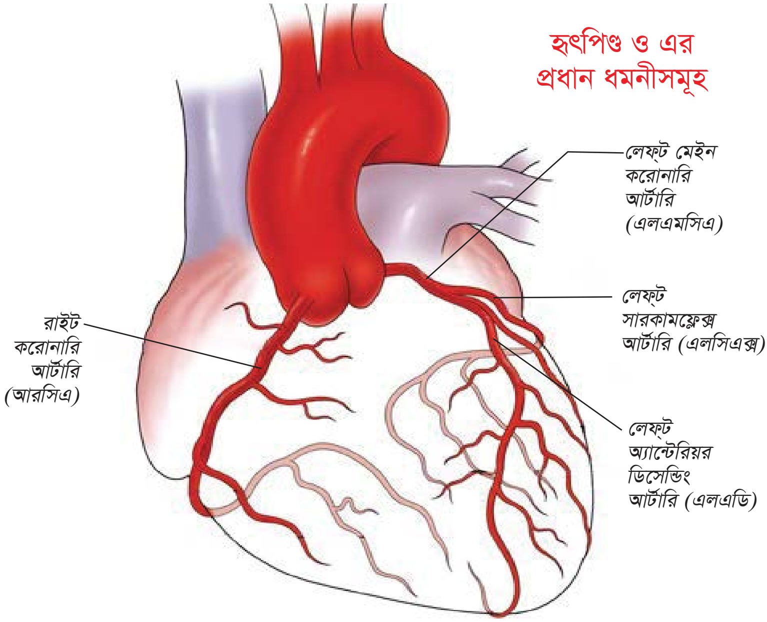

কেউ কেউ মনে করেন, হৃদয় আর হৃৎপিণ্ড অভিন্ন অস্তিত্ব। আসলে তা নয়। হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে বলা যায়, এটি একটি মাংসপিণ্ড। আর হৃদয় একটি চেতনাগত অস্তিত্ব—যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না; তবে এটি আমাদের অনুভূতিতে সাড়া দেয় ও প্রভাবিত হয়। হৃৎপিণ্ড আর হৃদয় পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং হৃদয় দ্বারা হৃৎপিণ্ড দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব।

আমরা জেনেছি, পাম্প করে সারা শরীরে রক্ত সরবরাহই হৃৎপিণ্ডের অন্যতম প্রধান কাজ। মজার ব্যাপার, হৃৎপিণ্ডের নিজের কোষ ও পেশিগুলোর সুস্থভাবে বেঁচে থাকা এবং কর্মক্ষম থাকার জন্যেও দরকার পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও পুষ্টি। এ পুষ্টি পৌঁছে দেয়ার কাজটি সাধিত হয় রক্তের মাধ্যমে।

হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে করোনারি ধমনী। হৃৎপিণ্ডের প্রধান দুটি করোনারি ধমনী হলো যথাক্রমে বাম ও ডান করোনারি ধমনী বা লেফ্‌ট মেইন করোনারি আর্টারি ও রাইট করোনারি আর্টারি। লেফ্‌ট মেইন করোনারি আর্টারি আবার একটু নিচের দিকে এসে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে—লেফ্‌ট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারি (এলএডি) ও লেফ্‌ট সারকামফ্লেক্স আর্টারি (এলসিএক্স)।

করোনারি হৃদরোগ : প্রাথমিক ধারণা

হৃৎপিণ্ডের অনেক ধরনের রোগ হয়ে থাকে। এর মধ্যে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে যে রোগটি সর্বাধিক দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটি করোনারি আর্টারি ডিজিজ (Coronary artery disease) বা করোনারি হৃদরোগ। আর এ রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করতে হলে এ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

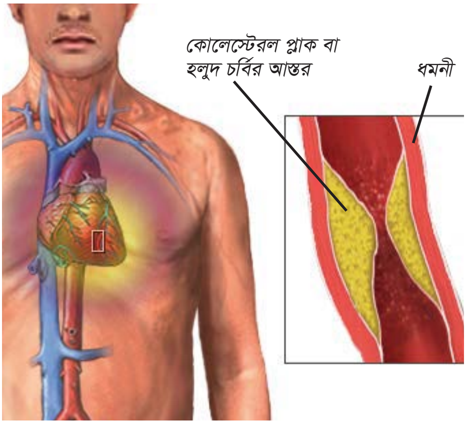

করোনারি ধমনীর দেয়ালে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজের সৃষ্টি হয়েছে

ক্রমাগত ভুল জীবনযাপনের ফলে করোনারি ধমনীর ভেতরের দেয়ালে কোলেস্টেরল প্লাক বা হলুদ চর্বির আস্তর জমে। এতে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। হৃৎপিণ্ডের কোষগুলোতে রক্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছাতে পারে না। ফলে রোগী একসময় বুকে ব্যথা অনুভব করেন। রক্ত চলাচল কমে গিয়ে এ সমস্যাটি দেখা দেয় বলে একে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজও (Ischaemic heart disease) বলা হয়।

করোনারি ধমনীর ব্লকেজ ক্রমান্বয়ে বেড়ে পুরো ধমনীই বন্ধ হয়ে যেতে পারে

- ☐ সাধারণত কিছুদূর হাঁটলে কিংবা ভারী কাজ বা সিঁড়িতে ওঠানামার মতো পরিশ্রম করলে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়।
- ☐ রাতের ভারী খাবারের পর কিংবা অতিরিক্ত ঠান্ডাতেও ব্যথা হতে পারে।
- ☐ রোগী কোনো কারণে তীব্র মানসিক চাপ বোধ করলেও এ ব্যথা শুরু হতে পারে।
- ☐ সাধারণত বিশ্রাম নিলে বা জিহ্বার নিচে নাইট্রেট জাতীয় ওষুধ নিলে ব্যথা কমে আসে।

সাধারণত শরীরের এসব অংশে করোনারি হৃদরোগজনিত ব্যথা হয়ে থাকে (লাল রঙ চিহ্নিত)

করোনারি হৃদরোগজনিত এ ব্যথাটি চিকিৎসাশাস্ত্রে এনজাইনা (Angina) নামে পরিচিত। অধিকাংশ রোগীই এসময় বুকের মধ্যে ব্যথা, ভার ভার বা এক ধরনের চাপ অনুভব করেন। মূলত বুকের বাম দিকে বা বুকের মধ্যখানে এই ব্যথা অনুভূত হয়। কখনো কখনো শ্বাসকষ্টও অনুভব হতে পারে। বুকের এই ব্যথা সাধারণত গলা, বাম চোয়াল, ঘাড়, কাঁধ, ওপরের পিঠ, বাম

শরীরের এসব অংশেও করোনারি হৃদরোগজনিত ব্যথা হতে পারে (লাল রঙ চিহ্নিত)

শোল্ডার জয়েন্ট, বাম বাহু ও হাত হয়ে অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙুল পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে।

এ-ছাড়াও হৃদরোগের ব্যথা ওপর পেট, থুতনি, বুকের ডান পাশ, পিঠ এমনকি ডান হাতেও যেতে পারে। করোনারি হৃদরোগের ব্যথা শুধু ওপরের পেটে হলে তা হতে পারে সবচেয়ে বিপজ্জনক। কেন?

আপনি হয়তো রাতে ভূরিভোজ করেছেন। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বুক জ্বলছে। সেইসাথে ওপরের পেটে একটা অস্বস্তি। স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে রাতে গুরুপাক খেয়েছি, তাই হয়তো এসিডিটি হয়েছে। বাড়িতে এন্টাসিড থাকলে খেয়ে নিলেন একটা। তারপরও অস্বস্তি কমছে না দেখে ওমিপ্রাজল জাতীয় ওষুধও হয়তো খেয়ে নিলেন। তবুও কমছে না; বরং কিছুটা যেন বাড়ছে। ফোন করলেন আপনার ডাক্তার বন্ধুকে।

আপনার বর্ণনা শুনে ডাক্তারেরও প্রথমেই মনে হতে পারে—রাতের গুরুপাক খাবারই এর কারণ। অতএব এটা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা। ফলে আপনার আর হাসপাতালে যাওয়া হলো না। সকাল হওয়ার আগেই দেখা গেল আপনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কখনো কখনো হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম চিত্র এটি। অর্থাৎ ওপরের পেটে ব্যথার লক্ষণ নিয়ে হার্ট অ্যাটাক হতে যাচ্ছে কিন্তু আপনি মনে করছেন এসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা।

আবার এমনও নয় যে, হৃদরোগ হলে সবসময় আপনার ব্যথা হবে। কারো করোনারি ধমনীতে হয়তো ৭০%, ৮০% বা ৯০% ব্লকেজ, কিন্তু কখনোই ব্যথা অনুভব করেন নি। তিনি হয়তো প্রথমবারের মতো ব্যথা অনুভব করেন, যেদিন তার হার্ট অ্যাটাক হয়। এ-ছাড়াও ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই ব্যথা অনুভূত হয় না। অতএব করোনারি হৃদরোগ হলেই যে ব্যথা হবে এমন কোনো কথা নেই। আবার ব্যথা নেই মানেই যে হৃদরোগ নেই—সবসময় জোর দিয়ে বলা যায় না।

আবার কেউ হয়তো রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছেন—এক কোটি টাকা যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেছিলেন সেটা মার খেয়েছে। কিংবা ব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের লোন করেছিলেন, শোধ করতে পারছেন না বলে ব্যাংক এখন মামলা করে দিয়েছে। পুলিশ ধরতে আসছে, তিনি পালাচ্ছেন। এমন

সব দুঃস্বপ্ন দেখার সময় ঘুমের মধ্যেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। কিংবা তীব্র ব্যথায় ঘুম ভেঙে যেতে পারে। রাতে ঘুমের মধ্যে হয় বলে এমন ব্যথার নাম নক্‌চারনাল এনজাইনা (Nocturnal angina)।

করোনারি হৃদরোগ : প্রকার ও ধরন

করোনারি হৃদরোগ মূলত দুধরনের : এনজাইনা পেকটোরিস (Angina Pectoris) ও মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (Myocardial Infarction)।

করোনারি ধমনীতে চর্বি জমে ব্লকেজ সৃষ্টি হতে শুরু করলে এর মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল কমে আসে। যার ফলে হৃৎপিণ্ডের সংশ্লিষ্ট অংশে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ হতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের কোষগুলো বঞ্চিত হয় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি থেকে। তখন বুকে ব্যথা হতে শুরু করে। এটাই এনজাইনা পেকটোরিস।

আর এই ব্লকেজের পরিমাণ যদি বাড়তে বাড়তে শতভাগ হয়ে যায় এবং ধমনী-পথে রক্ত চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে আসে, তখনই ঘটে হার্ট অ্যাটাক। আবার ৫০%, ৬০% বা ৭০% ব্লকেজও হঠাৎ ফেটে (Burst) রক্ত ও চর্বির দলা বেরিয়ে এসে পুরো ধমনীকে ব্লক করে ফেললে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক।

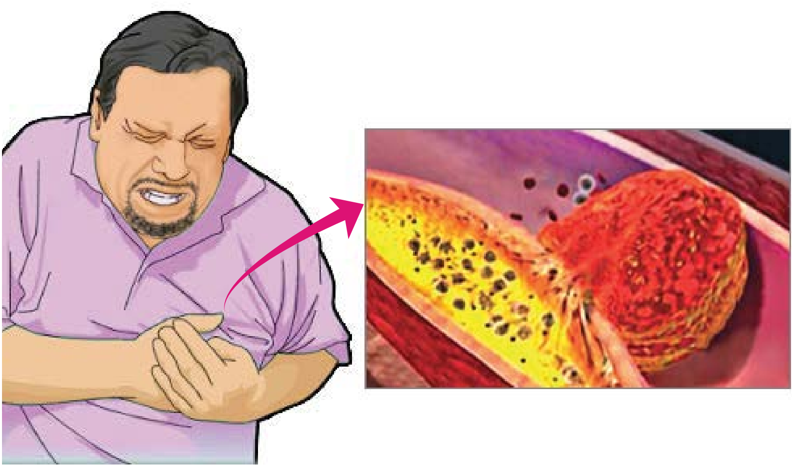

করোনারি ধমনীর ব্লকেজ ফেটে গিয়ে কোলেস্টেরল এবং রক্তের পিণ্ড (ব্লাড ক্লট) ধমনীর ভেতরে রক্ত চলাচলের পথ পুরোপুরি বন্ধ করে ফেলেছে। যার ফলাফল হার্ট অ্যাটাক।

চিকিৎসা পরিভাষায় যা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন নামে পরিচিত। রোগী এসময় বুকে তীব্র ও অসহনীয় ব্যথা অনুভব করেন। ব্যথা কখনো কখনো বুক, গলা, ঘাড়, ওপরের পেট, দুই হাত এবং পিঠেও চলে যেতে পারে। সাথে শ্বাসকষ্ট, বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে। রোগী ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং জরুরি চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হলে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

করোনারি হৃদরোগের কারণ

চিকিৎসাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা করোনারি হৃদরোগের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি কারণকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন।

বয়স

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বয়স যত বাড়তে থাকে হৃদরোগের আশঙ্কাও তত বাড়তে থাকে। আমরা যদি দেখি, হৃদরোগ সাধারণত কোন বয়সে হয়? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি হয় বয়স ৪০-এর কোঠায় এসে বা তার পরে। কেন?

সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা এর একটি কারণ খুঁজে বের করেছেন। ৪০ হচ্ছে এমন একটি বয়স, যে বয়সে এসে একজন মানুষ জীবনের অঙ্ক মেলাতে শুরু করে—কী চেয়েছিলাম, কী পেলাম আর কী হারালাম?

বিষয়টা আরেকটু স্পষ্ট করা যাক। শৈশব থেকে মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই তার কিছু স্বপ্ন থাকে। তারুণ্যে পৌঁছে সে দেখে একটি সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন—এমন একটি চাকরি বা ব্যবসা করব, এরকম একটি সামাজিক অবস্থান আমার হবে কিংবা এমন একজন জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী হবে। একসময় সে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুরু হয় স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার দ্বন্দ্ব। স্বপ্নের পরিধিও ছোট হতে থাকে ক্রমশ। বাড়তে থাকে না-পাওয়ার অতৃপ্তি আর কষ্ট।

একসময় বয়স ৪০ বছর পার হয়, সে তখন ফিরে তাকায় ফেলে আসা জীবনের দিকে। নিজেই বুঝতে পারে—যা চেয়েছিলাম তার অনেক কিছুই পাওয়া হয় নি। ভেতরে শুরু হয় এক ধরনের অতৃপ্তি আর অশান্তি। কেউ ভোগে না-পাওয়ার বেদনায়, কেউ ভুগতে থাকে বিষণ্নতায়। দিনের পর দিন এই যে কষ্ট, এটি শুধু মনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই বিষণ্ন-ব্যথাতুর

হৃদয়ের প্রভাব নিশ্চিতভাবেই পড়ে তার হৃদযন্ত্রেও।

অন্যান্য মনোদৈহিক রোগগুলোর মতো করোনারি হৃদরোগের অন্যতম কারণও মূলত এই হাহাকার। একবার যদি এ অতৃপ্তি ভেতরে জেঁকে বসে আর সর্বক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে যে, যা চেয়েছিলাম তা পেলাম না, কেন পেলাম না, না পেয়ে কী হারালাম—তবে আর রক্ষা নেই। আপনার সমস্ত অর্জন তখন আপনার কাছে ফিকে হয়ে যেতে পারে। ব্যর্থতার অনুভূতি আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াতে পারে প্রায় সারাক্ষণই, যা দীর্ঘমেয়াদে নানা শারীরিক-মানসিক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লিঙ্গভেদে

হৃদরোগের প্রবণতা পুরুষদের মধ্যে তুলনামূলক বেশি। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে মেনোপজের বা ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়তে থাকে। মহিলাদের মধ্যে যারা নিয়মিত জন্মবিরতিকরণ ওষুধ সেবন করেন, তাদের করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

জেনেটিক বা বংশগত

মা-বাবার হৃদরোগ থাকলে তাদের সন্তানদেরও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। গবেষকদের মতে, এর মূল কারণ পারিবারিক ভুল খাদ্যাভ্যাস, অতিরিক্ত ওজন, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও ধূমপানের ইতিহাস। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একজন মানুষ শৈশব থেকে প্রায় সব ব্যাপারেই পারিবারিক রীতি আচার ও ঐতিহ্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। যেমন : মা-বাবা বেলা করে ঘুম থেকে উঠলে সন্তানও সেভাবেই বেড়ে ওঠে। মা-বাবা ব্যায়াম বা হাঁটাহাঁটি না করলে সন্তানও ব্যায়ামের প্রতি আগ্রহী হয় না। বাবা ধূমপায়ী হলে সন্তানেরও ধূমপায়ী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

খাদ্যাভ্যাসও তেমনই একটি উল্লেখযোগ্য পারিবারিক অভ্যাস। পরিবারে যে ধরনের খ্যাদ্যাভ্যাস চালু থাকে, জীবনের শুরু থেকেই মানুষ সাধারণত সে খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাই পারিবারিক অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বংশগত হৃদরোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

ধূমপান

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা ইউনিভার্সিটির স্কুল অব পাবলিক হেলথ ও সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এক যৌথ গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, অল্প বয়সেই হার্টের রক্তনালী সংকুচিত হয়ে যাওয়া এবং হার্ট অ্যাটাকের জন্যে যে-সব কারণকে দায়ী করা হয়, তার মধ্যে ধূমপানের অবস্থান শীর্ষে।

এ-ছাড়াও হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৪০ বছরের কম বয়সী রোগীদের ওপর একটি জরিপে দেখা গেছে, তাদের শতকরা ৮৫ ভাগই ছিল ধূমপায়ী।

রিফাইন্ড ফুড (তেল, চিনি, সাদা চাল, সাদা ময়দা)

হৃদরোগ হওয়ার পেছনে রিফাইন্ড ফুড অর্থাৎ তেল, চিনি, সাদা চাল, সাদা ময়দার ভূমিকা এখন প্রমাণিত। এ সকল খাবার একদিকে যেমন ওজন বৃদ্ধি এবং কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়ার জন্যে দায়ী; অন্যদিকে এসব খাবারে নেই কোনো ভিটামিন, মিনারেল বা ফাইটোকেমিক্যাল। ফলে এসব খাবার হৃদরোগসহ বিভিন্ন জটিল রোগ সৃষ্টি করে।

প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাত খাবার

হৃদরোগ হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে পাশ্চাত্যের খাদ্যশিল্প (Food Industry)। পুষ্টিবর্জিত এসব খাবারে (চিপস, ক্র্যাকার্স, ফাস্ট ফুড, টিনজাত ও প্যাকেটজাত খাবার, কোমল পানীয়, জ্যাম, জেলি, জুস ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়ে থাকে পাঁচ ধরনের ১৫ হাজার কেমিক্যাল, যা মানবদেহের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। যেমন : ফুড কালার, ফুড টেস্টার, ফ্লেভার, ফ্যাটেনার ও অ্যাডিক্টার। কেমিক্যালযুক্ত এসব খাবার ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগের অন্যতম কারণ।

তৈলাক্ত, চর্বিযুক্ত, ভাজাপোড়া খাবার গ্রহণ

তৈলাক্ত চর্বিযুক্ত ভাজাপোড়া খাবার রক্তের টোটাল কোলেস্টেরল ও ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল বাড়ায়—যা হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি তৈরি করে।

প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেল ও ফাইটোকেমিক্যালের ঘাটতি

ভুল খাদ্যাভ্যাস এবং ভুল পদ্ধতিতে রান্নার কারণে খাবারের মধ্যে থাকা ভিটামিন, মিনারেল ও ফাইটোকেমিক্যাল নষ্ট হয়, যা সুস্থতার জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। তাজা ফল, কাঁচা সালাদ, কাঁচা সবুজ পাতা, বাদাম, বীজ, বিন এবং অর্ধসেদ্ধ শাকসবজিতে এই উপাদানগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

উচ্চ রক্তচাপ

করোনারি হৃদরোগের একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কারণ অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ। ধমনীর ভেতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় এটি ধমনীর গায়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় চাপ দেয়। আর এই চাপ যদি স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেড়ে যায়, সেটিই উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন। অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ থাকলে করোনারি ধমনীর অভ্যন্তরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। রক্তপ্রবাহে ভেসে বেড়ানো অতিরিক্ত কোলেস্টেরল সেই ক্ষতের জায়গাটিতে আটকে যায়। এভাবে রক্ত চলাচলের পথে পরবর্তীতে আরো কোলেস্টেরল একটু একটু করে সেই একই জায়গায় জমতে থাকে। যার ফলাফল করোনারি ব্লকেজ।

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস একটি নীরব ঘাতক। শরীরের প্রায় সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপরই এর রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব। হৃৎপিণ্ডও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক বেশি। ডায়াবেটিস একাই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় প্রায় ৩৩%। আর এর সাথে উচ্চ রক্তচাপ যোগ হলে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬%।

রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য

যখন রক্তে মোট কোলেস্টেরল (Total Cholesterol), এলডিএল কোলেস্টেরল (LDL Cholesterol) ও ট্রাইগ্লিসারাইডের (Triglyceride) পরিমাণ বেড়ে যায়, তখন হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। অন্যদিকে উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরলের (HDL Cholesterol) পরিমাণ কমে গেলেও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। আর এ সবকিছু ঘটে মূলত ভুল খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান, মেদস্থূলতা এবং ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের অভাবের কারণে।

অতিরিক্ত ওজন এবং স্থূলতা

অতিরিক্ত ওজন যাদের, তাদের শরীরে রক্ত সরবরাহ করতে হৃৎপিণ্ডকে তুলনামূলক বেশি কাজ করতে হয়। এটিও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। মূলত খাবার থেকে প্রাপ্ত ক্যালরির পরিমাণ ও সে ক্যালরি ব্যবহারে অসামঞ্জস্যতাই অতি-ওজনের কারণ। অত্যধিক ওজনের ফলে উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের আধিক্য ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বেড়ে যায় অনেক গুণ।

শারীরিক পরিশ্রমের অভাব

আধুনিক ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ জীবনে আমরা সবাই কমবেশি গা ভাসিয়ে দিয়েছি। অথচ শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় ও পরিশ্রমহীন অলস জীবনযাপনে অভ্যস্ত যারা, তাদের অকালমৃত্যু ও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার হার কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্তদের চেয়ে তুলনামূলক বেশি। তাই বলা হয়ে থাকে 'যত আরাম তত ব্যারাম'।

সবমিলিয়ে এগুলোই করোনারি হৃদরোগের অন্যতম প্রধান ঝুঁকি ও কারণ। যদি একজন মানুষের জীবনে একাধিক ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে, তবে তার হৃদরোগের আশঙ্কাও সেই অনুপাতে বাড়ে।

অবশ্য করোনারি হৃদরোগের কারণ আলোচনায় এটিই শেষ কথা নয়; চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোও তা-ই বলছে। কারণ কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায়, অতিরিক্ত ওজন, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস কিংবা মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল—এর কোনোটিই নেই, অথচ তিনি করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আবার দেখা গেল, ৮০ বছর বয়সেও বাবার হৃদযন্ত্র দিব্যি সুস্থ, কিন্তু ছেলের ৪০ না পেরোতেই হার্ট অ্যাটাক!

করোনারি হৃদরোগের পেছনে কি তাহলে এগুলো ছাড়াও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কারণ আছে? আছে বৈকি। সেটি হলো, জীবন সম্পর্কে আমাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ থেকে সৃষ্ট স্ট্রেস বা মানসিক চাপ, যাকে আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি টেনশন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়টি আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি, টেনশন ও স্ট্রেস ॥
করোনারি হৃদরোগের অন্যতম কারণ

হৃদযন্ত্রের আসল শত্রু : টেনশন ও স্ট্রেস	।	৩০
টেনশনের কারণ	।	৩১
টেনশন ও ক্রমাগত স্ট্রেস ॥ বেড়ে চলেছে হৃদরোগের ঝুঁকি	।	৩৪
শিথিলায়ন : টেনশনমুক্তির কার্যকর উপায়	।	৩৬
নিয়মিত শিথিলায়ন চর্চা করুন ॥ থাকুন টেনশন-স্ট্রেসমুক্ত	।	৩৭

নিরাময়ের জন্যে প্রয়োজন এক প্রশান্ত মন।
মন ভালো তো সব ভালো।

ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি, টেনশন ও স্ট্রেস ॥ করোনারি হৃদরোগের অন্যতম কারণ

করোনারি হৃদরোগের কারণগুলো সম্বন্ধে আমরা আগের অধ্যায়ে জেনেছি। এখন এর বাইরে হৃদরোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণকে আমরা জানতে চেষ্টা করব। গত কয়েক দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, হৃদরোগের অন্যতম কারণ মানসিক। আর এর নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা আছে যার, তা হলো ক্রমাগত টেনশন ও স্ট্রেস।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বের সাথে মনোযোগ দিচ্ছেন। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরলের আধিক্য কিংবা ধূমপানের অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও শুধু স্ট্রেসের কারণেই একজন মানুষ করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারেন।

গবেষকদের মতে, ধমনীতে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজ সৃষ্টি হলেই যে শুধু হার্ট অ্যাটাক হবে তা নয়। কোরিয়ার যুদ্ধের সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সে-সময় রণক্ষেত্রে নিহত সৈনিকদের নিয়মিত অটোপসি (Autopsy) করা হতো। চিকিৎসকেরা সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন, নিহত তরুণ সৈনিকদের শতকরা ৭০ জনেরই করোনারি ধমনী কোলেস্টেরল জমে বন্ধ হয়ে আসছিল (Advanced Stage of Atherosclerosis)। এদের মধ্যে ১৯ বছর বয়সী তরুণ সৈনিকও ছিল।

তখন প্রশ্ন উঠল, কোলেস্টেরল জমে ধমনীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়াই যদি হার্ট অ্যাটাকের কারণ হয়, তবে এসব তরুণ সৈনিকের মৃত্যু তো গুলির আঘাতে নয়; বরং যুদ্ধে আসার আগে বাড়িতে বসে হার্ট অ্যাটাকে হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ধমনীতে এই পরিমাণ ব্লকেজ নিয়েও তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে!

শুধু তা-ই নয়, দেখা গেছে, ধমনীতে ৮৫% ব্লকেজ নিয়ে একজন মানুষ

ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিয়েছেন। আবার এমনও হয়েছে, ধমনীতে কোনো ব্লকেজ নেই কিন্তু হঠাৎ করেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। কেন?

হৃদযন্ত্রের আসল শত্রু : টেনশন ও স্ট্রেস

অনেক রোগী বলেন, সারাজীবন নিয়ম মেনে চলেছি, স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়েছি, কোলেস্টেরলের পরিমাণও ছিল স্বাভাবিক, আমার কেন হার্ট অ্যাটাক হলো? কিন্তু তার কেস-হিস্ট্রি অর্থাৎ পারিবারিক সামাজিক পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যদি বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়, তবে হয়তো দেখা যাবে, বরাবরই তিনি টেনশন বা স্ট্রেসে ছিলেন। কিংবা দৈনন্দিন ছোটখাটো সব ব্যাপারে তিনি ভীষণ দুশ্চিন্তা করতেন। আসলে আধুনিক পুঁজিবাদী ভোগসর্বস্ব সভ্যতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই টেনশন।

আমরা মানুষ। সমাজে বাস করি। মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে আমাদের পরিবার। এ-ছাড়াও আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সহকর্মী, বন্ধুদের নিয়ে আমাদের বৃহত্তর পরিবার। জীবনে চলার পথে নানা ঘটনার আবেগীয় প্রতিক্রিয়ায় আমাদের ভেতরে জমা হয় বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি। কখনো-বা এর ফলে সৃষ্টি হতে পারে স্ট্রেস। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দেখা যায়, আমরা কেউ খুব সহজেই এসবের সাথে মানিয়ে নিতে পারি, অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু ভুলে যেতে পারি; কিন্তু অনেকে আবার এটা পারেন না। ক্রমাগত দুশ্চিন্তায় তিনি একসময় বিষণ্নতা ও হতাশায় আক্রান্ত হন। আসলে সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন ক্রমাগত স্ট্রেস জীবনের স্বাভাবিকতাকে ব্যাহত করে। হৃদয়ের পাশাপাশি তখন আক্রান্ত হয় হৃদযন্ত্রও, যার অন্যতম পরিণতি করোনারি হৃদরোগ এবং অন্যান্য মনোদৈহিক রোগ। মার্কিন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ক্রিচটন দীর্ঘ গবেষণার পর দেখিয়েছেন—হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ মানসিক।

অনেকে মনে করেন, এনজিওগ্রামে ব্লক ধরা পড়েছে, এখন স্টেন্ট বা রিং লাগিয়ে নিলে কিংবা বাইপাস অপারেশন করে নিলেই হবে। হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি আর নেই। কিন্তু সত্য হলো, স্ট্রেস বা টেনশনের বৃত্ত থেকে যদি একজন মানুষ বেরিয়ে আসতে না পারেন, তবে হৃদরোগের ঝুঁকিমুক্ত থাকা তার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। তার হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়, আর্টারিতে যে কয়টা স্টেন্টই লাগানো হোক।

যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসাবিজ্ঞানী মেয়ার ফ্রেডম্যান এবং রে রোজেনম্যান দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণ করেন, হৃদরোগের সাথে অস্থিরচিত্ততা, বিদ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভুল জীবনাচরণের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। আর এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে জীবন সম্পর্কে আমাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি। যার ফলাফল টেনশন।

টেনশনের কারণ

আগ্রাসী পণ্যদাসত্ব

টেনশনের প্রথম কারণ আগ্রাসী পণ্যদাসত্ব বা হাইপার-কনজ্যুমারিজম। বিশ্বজুড়ে যা এখন পরিণত হয়েছে রীতিমতো এক ব্যাধিতে। এর প্রভাবে আমরা প্রতিনিয়ত কিনেই চলেছি, প্রয়োজন থাকুক আর না-ই থাকুক। যত কিনছি তত বাড়ছে অভাববোধ, অতৃপ্তি। সেইসাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আমাদের অশান্তি। কারণ বস্তু কখনো শান্তি দিতে পারে না।

গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা শতকরা ৮০ ভাগ কেনাকাটাই করি আবেগে। যাকে বলে চোখের ক্ষুধা। যেমন : আপনার আইসক্রিম খাওয়ার কথা মনেও হয় নি, কিন্তু একজনকে খেতে দেখলেন, অমনি আপনারও মনে হলো—আহা! আমিও একটা আইসক্রিম খাই! এই ক্ষুধাটা হচ্ছে চোখের ক্ষুধা। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, আবেগের বশবর্তী হয়ে এই ৮০ শতাংশ কেনাকাটা না করলেও মানুষ খুব সুন্দরভাবে তার জীবনধারণ করতে পারে।

পণ্যদাসত্ব কেবল অশান্তির মাত্রাই বাড়ায়। আমেরিকানদের কথাই ধরুন, জনসংখ্যার দিক থেকে তারা পৃথিবীর মাত্র পাঁচ শতাংশ, আর পৃথিবীর মোট সম্পদের ৫৫ শতাংশের মালিক তারা। কিন্তু তারপরও তাদের জীবনে কি শান্তি আছে? ট্র্যাঙ্কুইলাইজার যে দেশে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়, সেটি হলো যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ অশান্তি ওখানেই সবচেয়ে বেশি।

আপনি ভাবলেন, একটা বাড়ি থাকলে ভালো হতো। অনেক কষ্টে বানালেন একটা বাড়ি। কিছুদিন পর ভাবলেন, একটা ফ্ল্যাট না থাকলে কেমন হয়? শুরু হলো ফ্ল্যাটের জন্যে ছোটাছুটি। যত কিনছেন, অভাব বাড়ছেই। কবিগুরুর সেই বিখ্যাত কবিতা—*এ জগতে, হায়, সে-ই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি—/ রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।*

এ যুগে কাঙালের ধন কীভাবে চুরি করা হয়? তাকে কিনতে অভ্যস্ত করে। যত সে কিনবে, তত বাড়তে থাকবে পুঁজিপতিদের সম্পদ। সেই টাকা থেকেই তারা আবার ঋণ দেয় সাধারণ মানুষকে, যাতে সে আরো কিনতে পারে। এভাবে কিনতে কিনতে সে একসময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আক্ষরিক অর্থেই সে তখন হয়ে ওঠে পণ্যদাস। যত সে কিনছে, পরিণামে বাড়ছে অশান্তি। সেইসাথে বাড়ছে টেনশন।

বিপদের কল্পনা (ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স)

ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স হচ্ছে আমাদের অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের একটি স্বয়ংক্রিয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন গুহা বা জঙ্গলে বাস করত, তখন হিংস্র বন্যপ্রাণীদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তাদের পথ ছিল একটাই—হয় সেই প্রাণীর সাথে লড়তে হবে অথবা এত জোরে দৌড়াতে হবে যেন প্রাণীটা ধরতে না পারে।

এখন আমরা নাগরিক মানুষ, লোকালয়ে থাকি। বন্যপ্রাণীর সাথে লড়াই করার প্রয়োজন অনেক আগেই ফুরিয়েছে। কিন্তু এই ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্সটা থেকে গেছে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমে। কীরকম?

ধরুন, সন্ধ্যাবেলা আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন, সামনে একটা সাপ ফনা তুলে আছে। আপনার চোখ সাপ দেখার সাথে সাথে স্নায়ুর মাধ্যমে ব্রেনে মেসেজ পাঠাল—সামনে সাপ! প্রস্তুত হও! ব্রেন এবার আপনার শরীরের পেশি এবং স্নায়ুতে খবর পাঠাচ্ছে—সামনে সাপ, প্রস্তুত হও!

পরবর্তী নির্দেশনা ও কাজের জন্যে সব স্নায়ু ও পেশি চূড়ান্ত প্রস্তুত হলো এবং ব্রেনে খবর পাঠাল—আমি প্রস্তুত। ব্রেন তখন ভাবছে, পেশি যখন প্রস্তুত তাহলে চোখ যে তথ্যটা দিয়েছে সেটা ঠিক। সে আবার তাগাদা দিতে থাকে—আরো প্রস্তুত হও! পেশি পুনরায় খবর পাঠাচ্ছে, আমি আরো প্রস্তুত। ব্রেন বলে, আরো প্রস্তুত হও!

এই 'আমি প্রস্তুত' এবং 'আরো প্রস্তুত হও' চক্রটি চলতেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি আপনার মনোযোগটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে পারছেন। মজার ব্যাপার হলো, সত্যিকার সাপ দেখলে আপনার ব্রেন ও স্নায়ুতে যে প্রতিক্রিয়া হতো, আপনি যদি চিন্তা করতে থাকেন—সামনে সাপ, ব্রেন তখনো ঠিক একই প্রতিক্রিয়া করবে। অর্থাৎ বিপদ যতই দূরে থাকুক,

আপনি যখনই কোনো কারণে বিপদের আশঙ্কা করছেন, বিপদ এলে কী হবে, আপনি কী করবেন—এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, আপনার মধ্যে তখন চলতে থাকে এই ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্সের এক অন্তহীন দুষ্টচক্র।

অতএব আমাদের টেনশনের দুই নম্বর কারণ হচ্ছে বিপদের কল্পনা বা দুশ্চিন্তা। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা যত বিপদের কল্পনা করি তার শতকরা ৯০ ভাগ আমাদের জীবনে কখনো ঘটে না।

বহন করে বেড়ানো

টেনশনের অন্যতম কারণ হলো বহন করে বেড়ানো। ধরা যাক, অফিসে বস আপনাকে তুচ্ছ কারণে বকাঝকা করেছেন। তিনি একতরফা বলেছেন, আপনাকে চুপচাপ শুনতে হয়েছে। কিছুই বলতে পারেন নি, তাই রাগও কমে নি। ভেতরে ভেতরে ফুঁসছেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে ঢুকেই অকারণে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি আর স্ত্রীর ওপর রাগ ঝাড়তে শুরু করলেন—তোমার জন্যে আজকে আমার এই অবস্থা! যদিও সে বেচারির কোনোরকম ভূমিকাই এখানে নেই। কিন্তু আপনি দিলেন বাসার শান্তিটা নষ্ট করে।

আবার এমনও হতে পারে—স্ত্রী হয়তো আপনার চেয়ে এক ডিগ্রি চড়া। বাসায় স্ত্রীর কাছে ঝাড়ি খেলেন, কিছুই বলতে পারলেন না। অফিসে গিয়ে নিতান্ত তুচ্ছ কারণে পিয়নকে বকাবকি শুরু করে দিলেন।

অর্থাৎ অফিসের সমস্যা বাসায় এনে বাসার পরিবেশটা তিক্ত করে তুললেন আর বাসার সমস্যা অফিসে নিয়ে গিয়ে অফিসে অশান্তি সৃষ্টি করলেন। আমরা অধিকাংশ মানুষ এভাবেই বহন করে বেড়াই। যেটা যেখানে রেখে আসা উচিত, সেটা সেখানে রেখে আসতে পারি না। এমন ছোটখাটো অসংখ্য ঘটনা আমাদের জীবনকে ভরিয়ে তোলে স্ট্রেসে।

অসুস্থ বিনোদন

মানুষ যখন কোনো কারণে একঘেয়েমিতে ভোগে, তখন এ থেকে মুক্তির জন্যে সে বিনোদন খোঁজে। একটা সময় এই বিনোদন মানে ছিল বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা—ফুটবল ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন টেবিল-টেনিস ক্যারম দাবা লুডু ইত্যাদি। সেইসাথে একটু গল্পগুজব, বেড়ানো ও কদাচিৎ নাটক-সিনেমা দেখা। সময়ের হাত ধরে আজ বিনোদনের ধরন বদলে গেছে। খেলাধুলা, গল্পগুজব, বেড়ানোর জায়গা দখল করে নিয়েছে টিভি ইন্টারনেট ফেসবুক

টুইটার স্মার্টফোন। দিনরাতের বড় একটা অংশই দখল করে নিয়েছে ভার্চুয়াল জগৎ। আর এই অসুস্থ বিনোদনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে আমাদের বাস্তব জীবনে। টিভি সিরিয়ালের মূল বিষয় কূটনামি গীবত পরচর্চা ভায়োলেন্স ষড়যন্ত্র ও পরকীয়া। এসবের কুপ্রভাবও বিষিয়ে তুলছে আমাদের জীবন। এ-ছাড়া ফেসবুকের মরণ ছোবল পড়ছে আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কে, আমাদের নৈতিকতায়। ফলে হু হু করে বাড়ছে দাম্পত্য কলহ, পরকীয়া, বিবাহবিচ্ছেদ, খুন, শিশু ও নারী নির্যাতন। বাড়ছে স্ট্রেস।

টেনশন ও ক্রমাগত স্ট্রেস ॥ বেড়ে চলেছে হৃদরোগের ঝুঁকি

আমরা দেখলাম, ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি, পণ্যদাসত্ব, বিপদের কল্পনা, নেতিচিন্তা ও অসুস্থ বিনোদন আমাদের মধ্যে তৈরি করে চলেছে এক দুঃসহ স্ট্রেস। সবমিলিয়ে ভেতরে চলছে অবিশ্রান্ত ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স। ফলে প্রায় সারাক্ষণই সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম উত্তেজিত থাকছে এবং নিঃসৃত হচ্ছে বিভিন্ন স্ট্রেস-হরমোন : এড্রিনালিন, নর-এড্রিনালিন এবং কর্টিসল।

এ অবস্থা চলতে থাকলে শরীরের স্নায়ু ও পেশিগুলো যে পরিমাণে সংকুচিত হয়, সে অনুপাতে শিথিল হতে পারে না। ফলাফল নানা মনোদৈহিক রোগ। এ অযাচিত সংকোচন হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে (Coronary spasm) স্বাভাবিক রক্ত চলাচল ব্যাহত করে।

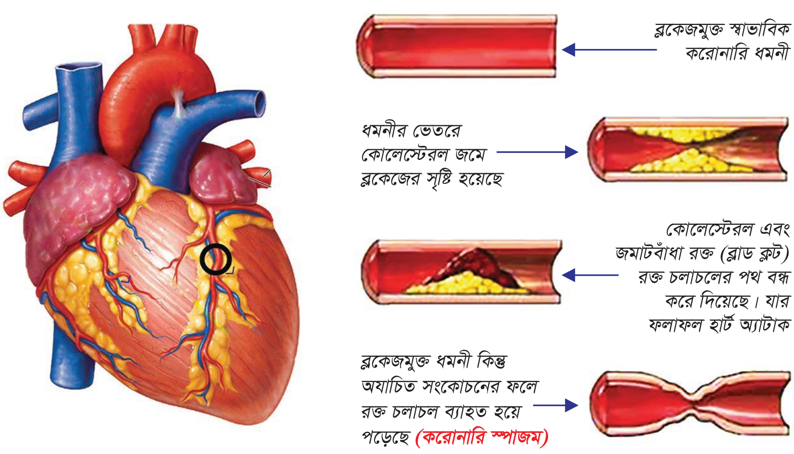

শুধু তা-ই নয়, সারাক্ষণই মাত্রাতিরিক্ত স্ট্রেস-হরমোনের প্রভাবে শরীরে সৃষ্টি হয় অস্থিরতা, অনিদ্রা এবং রক্ত জমাটবাঁধার প্রবণতা। ফলে বেড়ে যায় করোনারি ধমনীতে ব্লকেজ সৃষ্টির সম্ভাবনা।

গবেষকেরা বলছেন, স্ট্রেসে থাকলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, খাদ্যাভ্যাস যেমনই হোক। যুক্তরাষ্ট্রে একটি কার রেসিংয়ের পূর্বে পাঁচশ প্রতিযোগীর রক্ত পরীক্ষা করা হয় ও প্রতিযোগিতা শেষে পুনরায় রক্ত পরীক্ষা করা হয়। দেখা যায়, রেসের পূর্বে তাদের প্রত্যেকের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি ছিল! এ-ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে ট্যাক্স-একাউন্টেন্টদের লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়ার আগের সময়টাতে তাদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকে।

হৃদরোগসহ অন্যান্য মনোদৈহিক রোগের সাথে টেনশন ও স্ট্রেসের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের দেশে অনেক দেরিতে কাজ শুরু হলেও, পাশ্চাত্যে এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে। কারণ ইউরোপ-আমেরিকায় টেনশনের প্রকোপ শুরু হয়েছে সেই ৫০-এর দশক থেকে। এ গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. হার্বার্ট বেনসন। বোস্টনের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে তিনি 'মাইন্ড বডি ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন।

টেনশনের মনোদৈহিক প্রভাব নিয়ে দীর্ঘ ৩০ বছর গবেষণা করে প্রফেসর হার্বার্ট বেনসন দেখিয়েছেন, সাধারণভাবে যে রোগগুলোর সাথে

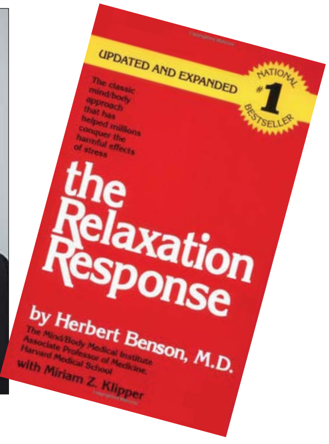

টেনশনের মনোদৈহিক প্রভাব নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ডা. হার্বার্ট বেনসন। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় তার বেস্ট সেলার বই 'দ্য রিল্যাক্সেশন রেসপন্স'।

আমরা বেশি পরিচিত, তার একটা বড় অংশের সাথেই রয়েছে টেনশনের নিবিড় যোগাযোগ। যেমন : উচ্চ রক্তচাপ, করোনারি হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, বিভিন্ন রকম পেটের পীড়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস্ট্রিক আলসার, আইবিএস, ঘাড় ও মাথাব্যথা, অবসাদ, অনিদ্রা, হাত-পায়ের তালু ঘামা ইত্যাদি। শারীরিক উপসর্গ হিসেবে প্রকাশ পেলেও এসব রোগের আসল উৎস কিন্তু মন। মনে দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে জমতে থাকা কষ্ট, টেনশন, স্ট্রেস বা মানসিক চাপ। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় তাই এ রোগগুলোকে বলা হয় সাইকোসোমাটিক ডিজিজ বা মনোদৈহিক রোগ।

টেনশন সৃষ্টি হলে শরীরে কী হয়? টেনশনের ফলে স্নায়ু এবং পেশি সংকুচিত হয়। পেশির এই সংকোচন বিশ্রাম বা ঘুমের সাহায্যে দূর হতে পারে, কিন্তু স্নায়ুর টেনশন বিশ্রাম বা ঘুমে দূর হয় না। এটি ভেতরে থেকেই যায় এবং ক্রমাগত এ অবস্থা চলতে থাকলে একসময় উল্লিখিত মনোদৈহিক রোগগুলোর সূত্রপাত ঘটে।

তাই স্নায়ুর টেনশন দূর করা অত্যন্ত জরুরি। আর সেজন্যে প্রয়োজন শিথিলায়ন। একমাত্র গভীর শিথিলায়নই পারে দেহের সব স্নায়ু-পেশিকে শিথিল করে তুলতে।

শিথিলায়ন : টেনশনমুক্তির কার্যকর উপায়

চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই অভাবনীয় অগ্রগতির যুগেও টেনশনমুক্তির জন্যে কার্যকরী কোনো ওষুধ উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন নি বিজ্ঞানীরা। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো সম্বন্ধে যারা সচেতন তারা জানেন—কার্যকরভাবে টেনশন দূর করার বিজ্ঞানসম্মত উপায় হচ্ছে শিথিলায়ন বা রিল্যাক্সেশন। একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এ বিষয়টি আজ প্রমাণিত সত্য।

আমরা জেনেছি, টেনশন বা স্ট্রেসের ফলে শরীরের সব স্নায়ু, পেশি, কোষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং পুরো শরীরে সৃষ্টি হয় ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স। অন্যদিকে শিথিলায়নে দেহের প্রতিটি কোষকে শিথিল করা হয়, বলা যেতে পারে শুইয়ে দেয়া হয়। শিথিলায়নকালে দেহের প্রতিটি কোষ পায় ব্যক্তির মমতাপূর্ণ নিবিড় মনোযোগ।

শিথিলায়নকালে একজন মানুষ তার মনের গভীরে প্রবেশ করে। মন প্রশান্ত হয়। তখন ব্রেন থাকে সবচেয়ে কার্যকর অবস্থায় অর্থাৎ আলফা লেভেলে। শিথিলায়নে ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি হয়। নিয়মিত শিথিলায়নে মনে প্রশান্তি আসে, ফলে বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো তখন মনকে খুব সামান্যই প্রভাবিত করে। আর দুশ্চিন্তা ও শিথিলায়ন একসাথে সম্ভব নয়। কারণ শরীর শিথিল হলে দেহ-মনে কখনো টেনশন বা দুশ্চিন্তা থাকে না।

নিয়মিত শিথিলায়ন চর্চা করুন ॥ থাকুন টেনশন-স্ট্রেসমুক্ত

নিয়মিত শিথিলায়ন চর্চায় মনের নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক আবেগ ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে থাকে। প্রফেসর ডা. হার্বার্ট বেনসন দীর্ঘ গবেষণার পর প্রমাণ করেছেন, গভীর শিথিলায়নে হার্টবিট কমে। দেহে ব্যথা বা আঘাতের অনুভূতি হ্রাস পায়, উচ্চ রক্তচাপ কমে। দমের গতি ধীর হয়ে আসে। রক্তে ল্যাকটেট ও এড্রিনালিনের পরিমাণ হ্রাস পায়। প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের তৎপরতা বাড়ে। দেহকোষে অক্সিজেন গ্রহণের চাহিদা কমে। সেইসাথে বাড়ে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং শরীর আপনা থেকেই রোগমুক্তির প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে।

বলা যায়, শিথিলায়নের আনন্দই আলাদা। শরীর-মনে এটি অনাবিল সুখ ও আনন্দ-অনুভূতি সৃষ্টি করে। তাই শিথিলায়নের প্রাথমিক প্রাপ্তি হচ্ছে প্রশান্তি। আপনি যত শিথিলায়নের গভীরে প্রবেশ করতে পারবেন তত প্রশান্তিতে অবগাহন করবেন। শিথিলায়ন হলো মন নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত মেডিটেশনের প্রথম স্তর।

শিথিলায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন—সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড। লেখক : মহাজাতক। প্রকাশক : সেবা প্রকাশনী।

শিথিলায়নের অডিও
ডাউনলোডের জন্যে ভিজিট করুন
quantummethod.org.bd

করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা ॥ সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকি

করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের উপায় | ৩৯
কোন পরীক্ষাটি কখন করবেন, কেন? | ৪০

করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা ॥
হৃদরোগে ব্যবহৃত ওষুধ | ৪১
এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস : কোনটি কখন? | ৪২
ঝুঁকিমুক্ত নয় কোনোটিই | ৪৪

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস ॥
ব্যয়বহুল কিন্তু স্থায়ী সমাধান নেই কোনোটিতেই | ৪৬
আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কী বলে? | ৪৭
জানতে হবে আপনার হৃদরোগের কারণ | ৪৮
আসুন নিজের হৃদয়ের দিকে তাকাই | ৪৮
মেডিটেশন ॥ হৃদয়ের কথা বলি হৃদয়ে | ৪৯

শরীরের রোগগ্রস্ত প্রতিটি কোষ, টিস্যু ও অঙ্গ আপনার
মনোযোগ পেতে চায়। আপনি মনোযোগ দিলেই
সেখানে নিরাময় প্রক্রিয়ার সূচনা হয়।

করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা ॥
সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকি

পুঁজিবাদের বিশ্বায়নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পাল্টে গেছে। অধিকাংশ মানুষের চিন্তা এখন একটাই—টাকার পেছনে ছোটো। শুধু ছোটো আর ছোটো। কিন্তু সম্পদ আর ভোগের পেছনে এভাবে দৌড়াতে গিয়ে মানুষ সবচেয়ে বেশি অবিচার করে তার স্বাস্থ্যের ওপর। জীবনের একটা পর্যায়ে পৌঁছে শরীর যখন বেঁকে বসে, তখন আর কিছুই করার থাকে না। একদিন যে সম্পদের পেছনে লাগামহীন ছুটতে গিয়ে সে নিজের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়েছিল, তা পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে ব্যয় হয়ে যায় তার বহু কষ্টে অর্জিত অর্থসম্পদ। আর পরিণত জীবনে স্বাস্থ্যহানির অন্যতম প্রধান কারণ হৃদরোগ।

এ অধ্যায়ে আমরা করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের উপায়, এ রোগের প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতি এবং এর সীমাবদ্ধতাগুলো সম্বন্ধে জানব।

করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের উপায়

কিছু শারীরিক উপসর্গ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ সহজেই নির্ণয় করা যায়। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কিছু সহজলভ্য ও স্বল্প ব্যয়ে করা যায়। আবার কিছু বেশ ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ।

সহজলভ্য এবং তুলনামূলক স্বল্প ব্যয়ে করা যায় এমন পরীক্ষা :

- ☐ ইসিজি (ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম)
- ☐ কার্ডিয়াক এনজাইম্‌স (যেমন : ট্রপোনিন)
- ☐ ইটিটি (এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট)
- ☐ ইকোকার্ডিওগ্রাম

ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে :

- ☐ করোনারি এনজিওগ্রাম (সিএজি)
  - ◆ প্রচলিত পদ্ধতিতে এনজিওগ্রাম
  - ◆ সিটি এনজিওগ্রাম
- ☐ থেলিয়াম আপটেক টেস্ট বা মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন স্ক্যান।

কোন পরীক্ষাটি কখন করবেন, কেন?

কেউ যখন বুকে ব্যথা অনুভব করেন তখন চিকিৎসক যদি মনে করেন যে, এটি হৃদরোগজনিত ব্যথা হতে পারে তবে সর্বপ্রথম তিনি রোগীকে একটি ইসিজি করার পরামর্শ দেন। ইসিজি হলো করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের একটি প্রাথমিক পরীক্ষা।

৫০% ক্ষেত্রে ইসিজিতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা দেখে শনাক্ত করা যায়—রোগী করোনারি হৃদরোগে ভুগছেন কিংবা তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আবার প্রায় ৫০% ক্ষেত্রে হৃদরোগ থাকার পরও ইসিজিতে কোনো পরিবর্তন পাওয়া যায় না। তখন রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে কার্ডিয়াক এনজাইম্স যেমন : ট্রপোনিন-এর মাত্রা দেখা হয়। রক্তে এর মাত্রাধিক্য দেখে বোঝা যায় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা।

কিছু রোগী আছেন যারা বিশ্রামের সময় বুকে কোনো ব্যথা অনুভব করেন না; কিন্তু যখন সিঁড়ি ভাঙেন কিংবা পরিশ্রমের কাজ করেন বা জোরে হাঁটেন তখন বুকে ব্যথা অনুভব করেন। তাদের ক্ষেত্রে করা হয় ইটিটি। আর হার্টের কর্মক্ষমতা বোঝার জন্যে যে পরীক্ষা, সেটি হলো ইকোকার্ডিওগ্রাম। এর মাধ্যমে হার্ট অ্যাটাকের পরে কিংবা স্বাভাবিক অবস্থায়ও হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা বোঝা যায়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো সহজলভ্য এবং তুলনামূলক স্বল্প ব্যয়ে করা সম্ভব।

অন্যদিকে করোনারি এনজিওগ্রাম ও মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন স্ক্যান হলো অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল পরীক্ষা। করোনারি এনজিওগ্রামে রোগীর হাত কিংবা উরুর শিরাপথে ইনজেকশনের মাধ্যমে এক ধরনের তরল রঞ্জক পদার্থ (Dye) প্রবেশ করানো হয়, তারপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গামা ক্যামেরার মাধ্যমে দেখা হয় তার করোনারি ধমনীতে ব্লকেজের পরিমাণ কতটুকু। এ পুরো প্রক্রিয়াটির ভিডিওচিত্র দেখে কার্ডিওলজিস্টরা অনুমানের ভিত্তিতে

ব্লকেজের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। প্রচলিতভাবে এনজিওগ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি তা মূলত এটাই।

প্রচলিত এই পদ্ধতিতে এনজিওগ্রাম করার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। রক্তনালীকে ছিদ্র করে তার ভেতরে রঞ্জক পদার্থ প্রবেশ করানো হয় বলে এখান থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে, রক্তচাপ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ-ছাড়াও যাদের বয়স বেশি, যারা কিডনি-জটিলতায় ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ঝুঁকিপূর্ণ।

তাই এসব ক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়ানোর জন্যে সিটি এনজিওগ্রামের পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু কিডনি রোগী এবং যাদের হার্ট রেট তুলনামূলক বেশি কিংবা অনিয়মিত—এসব বিচারে সিটি এনজিওগ্রামও পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত নয়।

এ-ছাড়াও আছে থেলিয়াম আপটেক টেস্ট বা মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন স্ক্যান। হার্ট অ্যাটাকের পর হৃৎপিণ্ডের যে মাংসপেশিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার কর্মক্ষমতা কতটুকু অটুট আছে সেটি বোঝার জন্যে এই পরীক্ষাটি করা হয়। এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ।

করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা

গত কয়েক দশকের তুলনায় করোনারি হৃদরোগের অত্যাধুনিক বিভিন্ন চিকিৎসা এখন সত্যিই অনেক সহজলভ্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোনো ওষুধ বা স্বীকৃত চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি, যা দিয়ে ধমনীর ব্লকেজ পুরোপুরি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে ফেলা সম্ভব।

হৃদরোগে ব্যবহৃত ওষুধ

প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় হৃদরোগীদের যে-সব ওষুধ সেবন করার পরামর্শ দেয়া হয়, তার মধ্যে তিন ধরনের ওষুধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ব্যথা কমানোর ওষুধ। হৃদরোগীদের পকেটে বা ব্যাগে সবসময় একটি স্প্রে জাতীয় ওষুধ (নাইট্রোগ্লিসারিন) রাখার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। প্রয়োজন হলে অর্থাৎ বুকে ব্যথা বা চাপ অনুভূত হলে তারা এটি ব্যবহার করে থাকেন। এ-ছাড়া ট্যাবলেট আকারেও এ ওষুধটি হৃদরোগীরা প্রতিদিন সেবন করেন। এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। যেমন : এটি রক্তচাপ কমিয়ে দিতে পারে, কারো কারো মাথাব্যথা হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, রক্ত জমাটবদ্ধতা রোধের জন্যে এন্টি-প্লেটলেট জাতীয় ওষুধ। যেমন : এসপিরিন, ক্লোপিডগ্রেল। তবে এগুলোরও কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এই ওষুধগুলো পরিপাকতন্ত্রে ক্ষত তৈরি করতে পারে এবং সেখান থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

তৃতীয়ত, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর ওষুধ। যেমন : স্ট্যাটিন ও ফাইব্রেট। দীর্ঘমেয়াদি সেবনে এ ওষুধগুলো মাংসপেশির ব্যথা ও দুর্বলতা এবং লিভারের সমস্যার কারণ হতে পারে।

ব্যয়বহুল এসব ওষুধ খাওয়ার পরও কি ব্লকেজের বৃদ্ধি থেমে থাকছে? তা তো থাকছেই না, বরং বেশিরভাগ সময়ই তা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তখন প্রয়োজন হয় ইন্টারভেনশন ও সার্জিক্যাল চিকিৎসার। ইন্টারভেনশন হলো এনজিওপ্লাস্টি বা স্টেন্টিং (রিং পরানো) আর সার্জিক্যাল চিকিৎসা হচ্ছে বাইপাস অপারেশন।

একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তা হলো, আপনি যদি ইতোমধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করতে থাকেন, তবে নিজেই ওষুধ বন্ধ করবেন না। এ বইয়ে বর্ণিত জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি আপনি আপনার চিকিৎসকের পরামর্শমতো ওষুধ সেবন অব্যাহত রাখুন। আপনার শারীরিক অবস্থার উন্নতি দেখে চিকিৎসকই সিদ্ধান্ত নেবেন—কখন কোন ওষুধটি কমানো বা বন্ধ করা প্রয়োজন।

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস : কোনটি কখন?

এনজিওগ্রাম করে ধমনীতে ব্লকেজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। তারপর রোগীর শারীরিক অবস্থা ও ব্লকেজের পরিমাণ অনুসারে এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ধমনীর যে অংশে কোলেস্টেরল জমে ব্লকেজ ও রক্ত চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, সে জায়গাটিকে প্রসারিত করার একটি পদ্ধতি হচ্ছে এনজিওপ্লাস্টি।

এনজিওপ্লাস্টি মূলত দু-ধরনের। একটি হচ্ছে বেলুনিং অর্থাৎ ধমনীর যে জায়গায় ব্লকেজ রয়েছে, সেখানটায় ক্যাথেটারের (লম্বা সরু তার) সাহায্যে একটি বেলুন প্রবেশ করানো হয়, তারপর সে বেলুনটিকে ফুলিয়ে সেই জায়গাটিকে প্রসারিত করা হয়। ইদানীং এটি খুব কমই করা হয়ে থাকে।

এনজিওপ্লাস্টি (স্টেন্টিং)

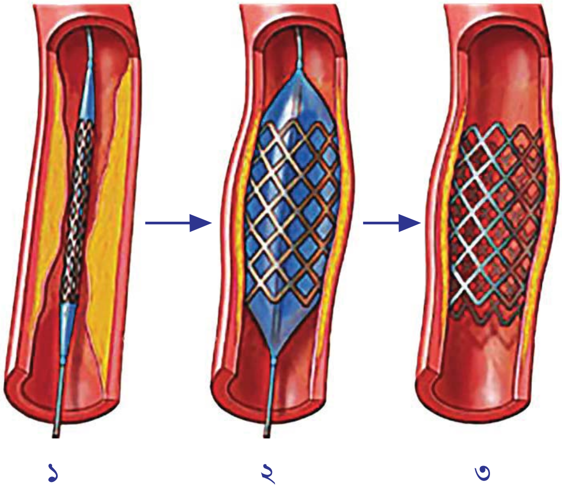

করোনারি ধমনীর অভ্যন্তরে ব্লকেজের স্থানে ধাপে ধাপে স্টেন্ট বা রিং লাগানো হচ্ছে :
১. সরু ক্যাথেটারের মাধ্যমে ধমনীর ভেতরে স্টেন্ট প্রবেশ করানো হয়েছে
২. স্টেন্ট প্রসারিত করা হলো
৩. স্টেন্টটি জায়গামতো স্থাপন করে ক্যাথেটার বের করে নিয়ে আসা হলো

বাইপাস সার্জারি বা করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং (CABG)

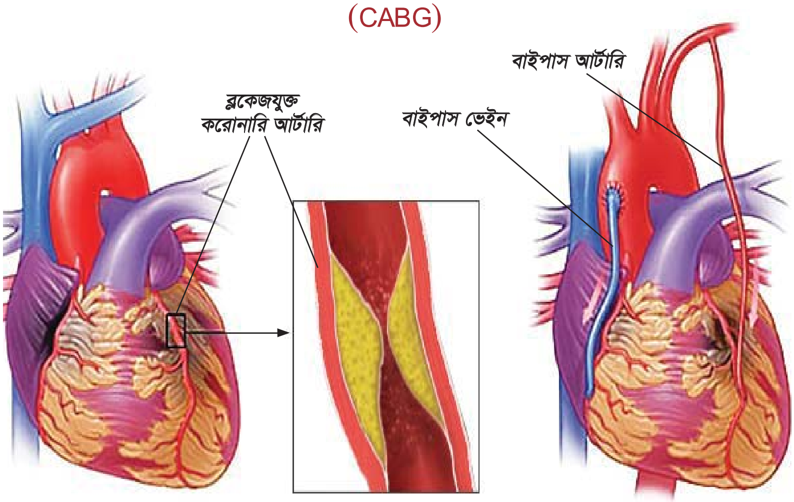

বাইপাস সার্জারির পূর্বে

বাইপাস সার্জারির পরে

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতিটি হচ্ছে স্টেন্টিং বা রিং পরানো। এ পদ্ধতিতে আগের মতোই ক্যাথেটারের সাহায্যে বেলুন ঢুকিয়ে ধমনীর সংকুচিত অংশটিকে প্রসারিত করা হয়। তারপর একটি স্টেন্ট বা ধাতব রিং প্রবেশ করিয়ে সেটি ওখানে স্থাপন করা হয়, যাতে তা ধমনীকে প্রসারিত করে রাখে এবং রক্তপ্রবাহ থাকে স্বাভাবিক।

কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, ধমনীর যে জায়গায় রিং পরানো হয়, পরবর্তীতে কখনো কখনো একই জায়গায় পুনরায় ব্লকেজ তৈরি হতে পারে (Re-stenosis)। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, যদি রিং-এর গায়ে কিছু ওষুধ লাগিয়ে দেয়া যায় তবে এই পুনঃব্লকেজ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এটাই মেডিকেটেড স্টেন্ট। অর্থাৎ রিং দু-ধরনের : মেডিকেটেড এবং নন-মেডিকেটেড। স্বাভাবিকভাবেই দামও ভিন্ন।

এখন প্রশ্ন, স্টেন্টিং করা হয় কাদের? এটি করা হয় সাধারণত যাদের একটি করোনারি ধমনীতে ব্লকেজের পরিমাণ ৭০-৮০% কিংবা যাদের দুটি করোনারি ধমনীতে ৫০-৬০% ব্লকেজ এবং একটিতে ৮০% ব্লকেজ, তাদের শুধু ৮০% ব্লক্ড ধমনীতেই স্টেন্টিং করা হয়। এ-ছাড়া যাদের বাইপাস সার্জারি করা হয়েছে কিন্তু সেই বাইপাস-রক্তনালীর ভেতরেই আবার ব্লকেজ তৈরি হয়েছে, সেটিকে প্রসারিত করার জন্যেও স্টেন্টিং করা হয়ে থাকে।

স্টেন্টিং করার পরও যাদের পুনরায় ব্লকেজ হচ্ছে কিংবা যে-সব রোগীর স্টেন্টিং করা সম্ভব নয়, তাদের পরামর্শ দেয়া হয় বাইপাস অপারেশনের। অর্থাৎ যাদের ব্লকেজের পরিমাণ বেশি—দুটো করোনারি ধমনীতেই একাধিক ব্লকেজ বা যে-কোনো একটি ধমনী থাকে পুরোপুরি বন্ধ। বাইপাস অপারেশনে ব্লকেজের স্থানটিতে কিছুই করা হয় না; বরং শরীরের অন্যত্র থেকে একটি রক্তনালী নিয়ে হৃৎপিণ্ডের দুই প্রান্তে লাগিয়ে দেয়া হয়। যার মাধ্যমে বিকল্প পথে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন স্থানে রক্ত পৌঁছে যায়।

ঝুঁকিমুক্ত নয় কোনোটিই

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস এখন বেশ প্রচলিত হয়ে উঠলেও, এগুলোর সার্বিক প্রক্রিয়াটি আদতে তত সহজ নয়; বরং ঝুঁকিপূর্ণ। এদের কিছু তাৎক্ষণিক ঝুঁকি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সুদূরপ্রসারী ঝুঁকিও।

তাৎক্ষণিক ঝুঁকিগুলো কী কী?

প্রথমত, স্টেন্টিং করার সময় রোগীর হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, যে রক্তনালীর মধ্য দিয়ে ক্যাথেটার ঢোকানো হয় সেখান থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে। ফলে আকস্মিকভাবে রক্তচাপ বেশ কমে যেতে পারে। সবচেয়ে বিপজ্জনক ঘটনা ঘটতে পারে—যদি বেলুন ছিঁড়ে যায় কিংবা স্টেন্ট হঠাৎ চুপসে যায় (Sudden Stent Closure)। এ-ক্ষেত্রে রক্ত চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়ে রোগী হার্ট অ্যাটাকের শিকার হতে পারেন। এমন ঘটনা একেবারে দুর্লভ নয়।

এনজিওপ্লাস্টির কিছু দূরপ্রসারী ঝুঁকিও রয়েছে। যেমন : রক্ত চলাচলের সময় রক্তকণিকাগুলো স্টেন্ট লাগানো অংশটিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ধীরে ধীরে সেখানে রক্ত জমাট বাঁধতে থাকে। সেই জমাটবদ্ধ রক্ত (Blood Clot) কখনো ছুটে গিয়ে অন্য রক্তনালীকে ব্লক করে দিতে পারে। এভাবে মস্তিষ্কের রক্তনালী আক্রান্ত হয়ে ঘটে যেতে পারে স্ট্রোকের মতো দুর্ঘটনা।

এ-ছাড়াও এনজিওপ্লাস্টি করার তিন মাসের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ রোগীর ধমনীতে পুনরায় ব্লকেজ তৈরি হয়। গবেষণা মতে, দুই বছরের মধ্যে ২০% রোগীর আবার স্টেন্টিং কিংবা বাইপাসের প্রয়োজন পড়ে। আর বাইপাস অপারেশনের ঝুঁকি তো স্বাভাবিকভাবেই এনজিওপ্লাস্টির চেয়ে বেশি। বুকের পাঁজর কেটে, কৃত্রিম মেশিনের সাহায্যে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস কয়েক ঘণ্টা সচল রেখে অপারেশন করা হচ্ছে—এটুকু চিন্তা করতেই কোনো কোনো রোগী অপারেশন টেবিলেই হার্ট অ্যাটাক করে বসেন!

এ-ছাড়াও অপারেশনের ক্ষতস্থানে দীর্ঘমেয়াদি ইনফেকশন হতে পারে। আর এসব রোগীর একটি বড় অংশই একবছরের মধ্যে আবার বুকে ব্যথা অনুভব করে থাকেন। পাঁচ থেকে ১০ বছরের মধ্যে তাদের বিকল্প ধমনীতেও ব্লকেজ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা যা ঘটে তা হলো, যাদের বাইপাস অপারেশন হয়েছে তারা প্রতি পদক্ষেপে চিন্তা করতে থাকেন—এই বুঝি আমার হার্টের কোনো ক্ষতি হয়ে গেল। এভাবে তিনি প্রায় সারাক্ষণই এক অজানা আতঙ্কে তটস্থ থাকেন।

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস ॥ ব্যয়বহুল কিন্তু স্থায়ী সমাধান নেই কোনোটিতেই

সার্বিক বিবেচনায় এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি—কোনোটিই করোনারি হৃদরোগের স্থায়ী চিকিৎসা নয়। রোগীকে এসব চিকিৎসার পরামর্শ দেয়া হয় বটে, কিন্তু এগুলো আদতে হৃদরোগের উপসর্গ দূর করার তাৎক্ষণিক উপায় মাত্র (Symptomatic Treatment)। উপরন্তু এসব চিকিৎসাপদ্ধতি যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনই ব্যয়বহুল।

এখন প্রশ্ন হলো, এমন ব্যয়বহুল আর ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসাব্যবস্থা কি আসলেই একজন হৃদরোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ কিংবা কমবেশি আগের মতোই পূর্ণ কর্মক্ষম করে তুলতে পারছে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর উত্তর হলো 'না'। কারণ মূল সমস্যার সমাধান না করে সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে গেলে যা হয়, এখানেও তা-ই ঘটে।

খোদ পাশ্চাত্যেই গবেষণায় দেখা গেছে, চিকিৎসার পর রোগীকে করোনারি ব্লকেজের কারণ ও পুনঃব্লকেজ প্রতিরোধের ব্যাপারে খুব ভালোভাবে সচেতন করা হয় না। ফলে বেশিরভাগ রোগীই স্টেন্টিং কিংবা অপারেশনের পর তার পুরনো জীবন-অভ্যাসে ফিরে যান এবং আবারও আক্রান্ত হন ব্লকেজসহ হৃদযন্ত্রের নানা জটিলতায়। ফলে যে ধমনীতে স্টেন্টিং করা হয়েছে সেটিতে বা বাইপাস করা ধমনীতেই আবার ব্লকেজ দেখা দেয় এবং বছর কয়েকের মধ্যেই রোগী আবার বুকের ব্যথা নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

এ-ছাড়াও করোনারি হৃদরোগের ক্ষেত্রে রোগীর মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা অন্যতম প্রধান অনুঘটক, যার কোনো সমাধান হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় নেই। আর ওষুধ, এনজিওপ্লাস্টি কিংবা বাইপাস সার্জারি—এর কোনোটি দিয়েই পুনঃব্লকেজ প্রতিরোধ করা যায় না।

এর কারণ কী? এমন ব্যয়বহুল স্টেন্টিং, বাইপাস অপারেশন আর রক্তের কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধও কেন এই ব্লকেজ তৈরির প্রক্রিয়া বন্ধ করতে পারছে না? উত্তর একটাই—হৃদরোগের সূত্রপাত যে-সব কারণে সেদিকে প্রয়োজনীয় মনোযোগ কেউ দিচ্ছেন না। না চিকিৎসক, না রোগী, না রোগীর আত্মীয়—কেউই না।

বাইপাস অপারেশনের মতো এখানেও মূল সমস্যাটিকেই বার বার বাইপাস করা হচ্ছে। যেমন, টাইফয়েড ম্যালেরিয়া বা যে-কোনো সংক্রমণের কারণে জ্বর হতে পারে। এ-ক্ষেত্রে জ্বরটা কিন্তু রোগ নয়, রোগের একটি উপসর্গ মাত্র। প্যারাসিটামল খাইয়ে রোগীর জ্বর কমানো হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু জ্বর কী কারণে হয়েছে, সেটি নির্ণয় না করে জ্বরের যত রকম চিকিৎসাই করা হোক, রোগী কখনোই পুরোপুরি সেরে উঠবে না। হৃদরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও মূলত এ ব্যাপারটিই ঘটছে। ফলে যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে। হৃদরোগীরা ঘুরেফিরে একই রোগচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কী বলে?

করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসা (এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি) যে দীর্ঘমেয়াদি কোনো সমাধান নয়; বরং নেহায়েতই একটি তাৎক্ষণিক উপশম প্রক্রিয়া, সেটি নিয়ে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, খোদ মেডিকেল সায়েন্সের বইতেই এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

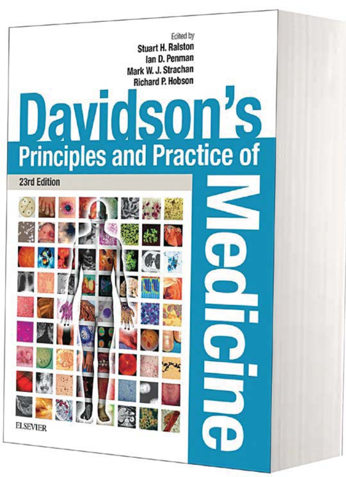

মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিসিন টেক্সটবুক Davidson's Principles & Practice of Medicine-এর সর্বশেষ সংস্করণে (২৩ তম) Cardiovascular disease অধ্যায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে—Treatment with PCI often provides excellent symptom control but it does not improve survival in patients with chronic stable angina. (Page-491)

অর্থাৎ পিসিআই (করোনারি এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি) রোগীকে যদিও বেশ উপশম দেয়, তার মানে এই নয় যে, যারা সবসময় বুকের ব্যথায় ভুগছেন (ক্রনিক স্টেবল এনজাইনা) এটি তাদের মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

জানতে হবে আপনার হৃদরোগের কারণ

আমরা জেনেছি—ধূমপান, ভুল খাদ্যাভ্যাস, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস, শারীরিক পরিশ্রমহীন জীবনযাপন, মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল, সর্বোপরি স্ট্রেস ইত্যাদি কারণে করোনারি হৃদরোগ হতে পারে। এককেজনের ক্ষেত্রে হৃদরোগের কারণ হতে পারে এককেটি।

পূর্ণ নিরাময় তখনই সম্ভব, যখন একজন হৃদরোগী জানবেন—কী তার হৃদরোগের কারণ, কোন ঝুঁকিপূর্ণ অভ্যাস বা জীবনাচার তার হৃদযন্ত্রকে অসুস্থ করে তুলছে। যে-কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে কারণটি শনাক্ত করতে পারলে সমাধান হয়ে ওঠে সময়ের ব্যাপার। আপনার করোনারি হৃদরোগের কারণ শনাক্ত করতে পারলে আপনিও ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবেন সুস্থতার পথে।

আসুন নিজের হৃদয়ের দিকে তাকাই

চারপাশের সবার দিকে আমরা তাকাই। অন্যের দোষ গুণ ভুল ত্রুটি ভালো মন্দ ইত্যাদি সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। আমাদের চোখ সবাইকেই দেখে, দেখে না কেবল নিজেকে। আমাদের মনের চোখও অনেকটা তা-ই। কিন্তু নিজের সমস্যা বুঝতে হলে, সমস্যার ধরন জানতে হলে, সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপ দিতে চাইলে, সর্বোপরি ভেতরের অফুরন্ত আত্মশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে নিরাময় ও সুস্থতার পথে এগিয়ে যেতে চাইলে প্রয়োজন নিজের দিকে ফিরে দেখা, নিজের গভীরে তাকানো।

এই আত্মসচেতনতা খুব সহজেই আমাদের সমস্যা এবং সম্ভাবনার পথ নির্দেশ করে। আমাদের ভুল আর করণীয়-বর্জনীয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি আমরা। আর এটি সম্ভব মেডিটেশনে।

‘হৃদয়ের কথা বলি হৃদয়ে’ মেডিটেশনে আপনি জীবনে প্রথমবারের মতো আপনার হৃৎপিণ্ডের সাথে কথা বলবেন। তার প্রতি মনোযোগ দেবেন। শুনবেন কী বলতে চায় সে। আপনার হৃৎপিণ্ডের কাছে জানতে চাইবেন—তার কষ্টের কারণ, কী কারণে সে কাঁদছে, আপনার কোন কোন ভুল জীবনাচার দিনের পর দিন তাকে অসুস্থ করে তুলেছে? গভীর আত্মনিমগ্নতায় আপনি শুনবেন তার উত্তর, তার কষ্টের কারণগুলোকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবেন। এই মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে আপনি জীবনে প্রথমবার আপনার হৃদযন্ত্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করবেন।

আসুন আমরা মেডিটেশনে প্রবেশ করি।

মেডিটেশন ॥
হৃদয়ের কথা বলি হৃদয়ে

১. নিয়মমাফিক মনের বাড়ির দরবার কক্ষে গিয়ে বসুন।

২. ৩ থেকে ০ গণনা করে দরবার কক্ষের ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করুন নিরাময় কক্ষে। ৩-২-১-০। আপনি পৌঁছে গেছেন নিরাময় কক্ষে।

আপনার চেয়ারে আরাম করে বসুন। অবলোকন করুন হালকা নীল আলোয় প্লাবিত হচ্ছে আপনার পুরো অস্তিত্ব ....

প্রিয় সুহৃদ, আপনি জানেন, হৃদরোগ শুধু হৃৎপিণ্ডের রোগ নয়। হৃদরোগের আসল উৎস হলো হৃদয়। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মমতার অভাব, প্রিয়জনের সাথে সম্পর্কের জটিলতা, পেশাগত স্ট্রেস বা মানসিক চাপের প্রভাব পড়ে আমাদের মনের ওপর। পরবর্তী সময়ে যা আমাদের হার্টের স্বাভাবিক কর্মছন্দকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। তাই সুস্থ স্বাভাবিক হার্টের জন্যে মন থেকে এসব নেতিবাচক আবেগ ঝেড়ে ফেলতে হবে।

৩. এবার আপনার হার্টকে অবলোকন করুন। হার্টে কান লাগান। হার্টের কথা শুনুন। হার্টের সাথে কথা বলুন ....

অনুভব করুন, হৃদযন্ত্র বা হার্ট আপনার দেহের কত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। সারা শরীর থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডযুক্ত দূষিত রক্ত হার্টে এসে জমা হচ্ছে, হার্ট সেই রক্ত ফুসফুসে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আবার ফুসফুস থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত হার্টে আসার পর হার্ট পাম্প করে সেই রক্ত শরীরের প্রতিটি কোষে পাঠিয়ে দিচ্ছে ....

অনুভব করুন জন্মগ্রহণ করার পর থেকে একমুহূর্তের জন্যেও না থেমে প্রতিনিয়ত এ-কাজ করছে আপনার হার্ট ....

৪. হার্টকে আপনার পরম বন্ধু হিসেবে অনুভব করুন। আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে হার্টের নিরলস পরিশ্রমকে অনুভব করুন। জীবনব্যাপী এ অক্লান্ত কাজের জন্যে গভীর কৃতজ্ঞতা জানান তাকে। আপনার হার্টের জন্যে অনুভব করুন গভীর মমতা ....

অবলোকন করুন হার্ট আপনার শরীরের একটি অঙ্গ শুধু নয়; আপনার সেবায় নিয়োজিত এক জীবন্ত অস্তিত্ব, আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু। এ বন্ধুর সাথে এখন সরাসরি কথা বলবেন আপনি ....

প্রিয় বন্ধুর সাথে দীর্ঘদিন পর যোগাযোগ হওয়ায় আনন্দানুভূতি নিয়ে হার্টকে ডাকুন। সম্বোধন করুন কোনো মিষ্টি, শ্রুতিমধুর নামে।

দেখুন, সে আপনার সম্বোধনের কী উত্তর দিচ্ছে। উত্তর শুনতে কান পাতুন আপনার হার্টে। বুঝতে চেষ্টা করুন তার উত্তর।

তার কণ্ঠের উষ্ণতাকে অনুভব করুন।

আপনার শরীরের একটি মাংসপিণ্ড হিসেবে নয়, হৃদযন্ত্রকে অনুভব করুন অনুভূতিময় একটি অস্তিত্ব হিসেবে যা আপনার আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ সব অনুভূতিতেই সাড়া দেয় ও প্রভাবিত হয়।

হার্টকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার জীবনে তার ভূমিকা কী?

উত্তরে সে কী বলছে? ....

বুঝতে চেষ্টা করুন হার্টের উত্তর। সে বলছে, আপনাকে বাঁচিয়ে রাখাই তার কাজ। আপনি যাতে জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন, সেজন্যেই সে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

অনুভব করুন হার্ট আপনাকে বলছে, আমি তোমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু।

৫. হার্টকে জিজ্ঞেস করুন, আপনাকে সে কীভাবে সাহায্য করছে?

শুনুন তার উত্তর—'তুমি কখনো প্রচণ্ড হতাশায়, দুঃখে, যন্ত্রণায় মুষড়ে পড়েছিলে। কখনো রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলে। কখনো নিঃসঙ্গতায়, কখনো না পাওয়ার বেদনায়, কখনো-বা লজ্জা-সংকোচ-হীনম্মন্যতায় অসহায় হয়ে পড়েছিলে। এসব পরিস্থিতি আমার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। তবুও আমি কখনো থেমে থাকি নি। প্রতিটি মুহূর্তে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে কাজ করে গেছি ....

আপনার হার্ট তার জমানো কষ্টগুলো, আকুলতাগুলো ধীরে ধীরে আপনাকে বলে যাচ্ছে। আপনি অনুভব করছেন, দৈনন্দিন জীবনের ও দীর্ঘদিনের জমে থাকা আবেগ অনুভূতির সরাসরি প্রভাব পড়েছে আপনার হার্টের ওপর। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটাই হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ।

৬. আপনি দেখুন, বিশ্লেষণ করুন, আপনার হার্টের ওপর এ ধরনের আবেগ, অনুভূতির প্রভাব কতটুকু। হার্টকে রোগগ্রস্ত করে তুলতে পারে এমন কিছু কি আপনার জীবনে ঘটে চলেছে? ....

জীবনের প্রতি কি আপনি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল? নিজের ও পরিবার-পরিজনের প্রতি পরিপূর্ণ মমতা অনুভব করেন কি? ....

আপনি জানেন, স্নেহ-মমতাহীন জীবন এক দুঃসহ বোঝা। আর এর প্রভাবেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন আপনি।

জীবনের প্রতি কি কোনো অনীহা বোধ আছে আপনার? আপনি কি নিজেকে ভালবাসেন? নিজের প্রতি কতটুকু মমতা আছে আপনার?

হতাশা, অনুশোচনা, আশঙ্কার মতো নেতিবাচক আবেগ, হীনম্মন্যতা, ধূমপান, মাদকাসক্তি, পেশাগত চাপ, মানসিক অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা, ঋণগ্রস্ততা আপনার জীবনকে আনন্দহীন বোঝায় রূপান্তরিত করতে পারে। আবার টিভি ও মিডিয়া আসক্তি বা পরিবারের কারো সাথে ভুল বোঝাবুঝি, ক্ষোভ কিংবা দাম্পত্য কলহ জীবনের প্রতি আপনাকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে পারে।

অবলোকন করুন, এমন কোনোকিছু কি ঘটেছে আপনার জীবনে? সময় নিয়ে অনুসন্ধান করুন ....

বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে আপনার হার্টকে জিজ্ঞেস করুন। তাকে জিজ্ঞেস করুন, এসবের কোনটার ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে তার ওপর? আপনার ক্ষেত্রে হৃদরোগের এক বা একাধিক কারণ থাকতে পারে। অবলোকন করুন, হৃদরোগের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ কী আছে আপনার জীবনযাপনে? আপনি কি ধূমপায়ী? আপনি কি অতিভোজনে অভ্যস্ত? অতিরিক্ত তেল, চর্বি, মসলাযুক্ত খাবার দেখলেই কি আপনি ঝাঁপিয়ে পড়েন? আপনি কি খুব বেশি টেনশন করেন বা সবসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন? কিংবা আপনার কি শারীরিক পরিশ্রমে অনীহা রয়েছে? প্রতিদিন নানা অজুহাতে আপনি কি হাঁটা, ব্যায়াম করা থেকে বিরত থাকেন? অবলোকন করুন, কোন বিষয়টি বা বিষয়গুলো আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে? সময় নিয়ে ভাবুন ....।

আপনি শনাক্ত করেছেন শারীরিক অনিয়মগুলো, অনাচারগুলো।

আপনি বুঝতে পারছেন সুষম খাবার, ব্যায়াম, মেডিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার গুরুত্ব।

৭. এবার প্রতিজ্ঞা করুন, আপনি হার্টের যথাযথ যত্ন নেবেন।

গভীর ভালবাসায় প্লাবিত করুন হার্টকে। অনুভব করুন আপনার এই একাগ্র মনোযোগে হৃদযন্ত্র উল্লসিত হয়ে উঠেছে। হৃদয় ও হৃৎপিণ্ড একাকার হয়ে গেছে।

৮. অবলোকন করুন আপনার মমতা পেয়ে আপনার হার্ট আনন্দে নাচছে .... নাচছে আপনার মন ....।

সারা দেহ-মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের শিহরণ অনুভব করুন ......।

অনুভব করুন এক সুস্থ হৃদযন্ত্র আপনার জীবনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু।

দিনে যখনই সময় পান, নীরবে চোখ বন্ধ করে হার্টের প্রতি মনোযোগ দিন। তার কাজকে অবলোকন করুন। হার্টের প্রতি আপনার মনোযোগ হার্টকে প্রতিদিন করে তুলবে আগের চেয়ে সুস্থ, আগের চেয়ে সবল, আগের চেয়ে প্রাণবন্ত। আপনার জীবনে আসবে নতুন ছন্দ, নতুন আনন্দ, নতুন বিশ্বাস, নতুন প্রত্যয়।

৯. এবার মনে মনে প্রত্যয়ন করুন, সুস্থ থাকার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের সহজাত। সুস্থতা স্বাভাবিক আর অসুস্থতা অস্বাভাবিক। আমি প্রাকৃতিক নিয়মেই সুস্থ হচ্ছি, প্রাণবন্ত হচ্ছি, সফল হচ্ছি, সুখী হচ্ছি।

১০. এবার ০ থেকে ৩ গণনা করে আপনি দরবার কক্ষে ফিরে আসুন। তারপর নিয়মমতো ০ থেকে ৭ গণনা করে স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস হৃদরোগ নিরাময় করে

হৃদরোগ গবেষণায় নতুন দিগন্ত ॥ ডা. ডিন অরনিশের প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ ।	৫৫
মেডিটেশন ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস ॥ বদলে দিল হৃদরোগীদের জীবন ।	৫৮
জীবন-অভ্যাস পরিবর্তনই প্রকৃত সমাধান ।	৬০
নতুন আশা নতুন বিশ্বাস ।	৬২
অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলধারায় ।	৬৩
নিজের দায়িত্ব নিতে হবে নিজেকেই ।	৬৬

রোগব্যাধির অনুপস্থিতিই সুস্বাস্থ্য নয়।
সুস্বাস্থ্য হচ্ছে ভালো থাকার এক অন্তর্গত অনুভূতি
যা আপনাকে সবসময় আনন্দোচ্ছল করে রাখে।

সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস হৃদরোগ নিরাময় করে

আমরা জেনেছি, হৃদরোগের সাথে ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি ও ভুল জীবন-অভ্যাসের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টির কারণে আমরা একদিকে যেমন জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে সরে গেছি, তেমনি সংজ্ঞায়িত করতে পারছি না আমাদের চাওয়াকে। কী চাই, কতটুকু চাই—আমরা নিজেরাই জানি না। যত পাচ্ছি তত বাড়ছে আরো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। চাওয়াপাওয়ার এই দুর্বিষহ চক্র অভিশপ্ত করে তুলছে আমাদের জীবনকে। ভেতরে সৃষ্টি হচ্ছে অশান্তি অস্থিরতা টেনশন। এ-ছাড়াও আছে একাকিত্ববোধ ও বিষণ্নতা, যা আমাদেরকে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে আরো স্ট্রেসের দিকে।

আর এই টেনশন ও স্ট্রেস আমাদের মধ্যে ক্রমাগত জন্ম দিচ্ছে 'ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স'। সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম সবসময় উদ্দীপ্ত থাকছে, স্ট্রেস হরমোনের অতিরিক্ত নিঃসরণ ঘটছে। ফলে হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনী সংকুচিত হচ্ছে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে।

আবার সঠিক জীবনদৃষ্টির অভাবে আমরা শারীরিক পরিশ্রমহীনতা ও আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দিচ্ছি। সেইসাথে ফাস্ট ফুডসহ অতিরিক্ত চিনি ও চর্বিযুক্ত তৈলাক্ত খাবারের কারণে শরীরে মেদ জমছে, বাড়ছে কোলেস্টেরলের মাত্রা। এই বাড়তি চর্বি একসময় করোনারি ধমনীতে ব্লকেজ তৈরি করছে। দেখা দিচ্ছে হৃদরোগ। শুরু থেকেই চিকিৎসকদের বিশ্বাস ছিল, ধমনী একবার ব্লক হতে শুরু করলে কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ, এনজিওপ্লাস্টি কিংবা বাইপাস সার্জারি ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই।

চিকিৎসকদের এ রক্ষণশীল চিন্তার বাইরে এসে ১৯৪০-৫০ দশকে এ বিষয়ে প্রথম গবেষণা শুরু করেন যুক্তরাষ্ট্রের দুজন কার্ডিওলজিস্ট ডা. লেস্টার মরিসন এবং ডা. জন ডব্লিউ গফম্যান। খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনে এবং

ব্যায়াম ও ওজন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা অসাধারণ ফল পান। এরপর ১৯৬০-৭০ দশকে আরেকজন মার্কিন পুষ্টিবিদ ও দীর্ঘায়ু-গবেষক নাথান প্রিটিকিন হৃদরোগীদের নিয়ে একই ধরনের গবেষণা করেন। তিনি তার পরামর্শপ্রার্থীদের তেল ছাড়া নিরামিষ খাবার, পর্যাপ্ত ফল, সালাদ, শাকসবজি, ডাল, মটরশুঁটি, পূর্ণ শস্যদানা জাতীয় খাবার খেতে উদ্বুদ্ধ করেন। সেইসাথে গুরুত্ব দেন ব্যায়াম ও ওজন নিয়ন্ত্রণে। তিনিও অসাধারণ ফল পান।

গত শতাব্দীর ৮০ ও ৯০-এর দশকে হৃদরোগ চিকিৎসা-গবেষণায় এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি ছাড়াই শুধু জীবনদৃষ্টি ও জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্লকেজ কমাতে এমনকি ধমনীকে পূর্বাবস্থায় (ব্লকেজমুক্ত) ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন যুক্তরাষ্ট্রের দুজন প্রখ্যাত চিকিৎসক—ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. ডিন অরনিশ এবং ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের সার্জন ডা. কাল্ডওয়েল বি এসেলস্টাইন। তবে ডা. ডিন অরনিশের গবেষণাটি ছিল বিশদ, বহুমুখী এবং পূর্ণাঙ্গ।

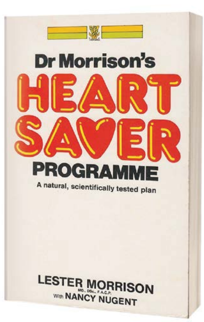

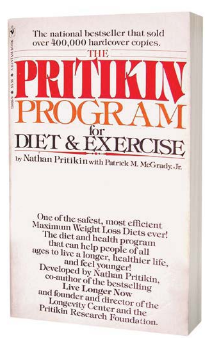

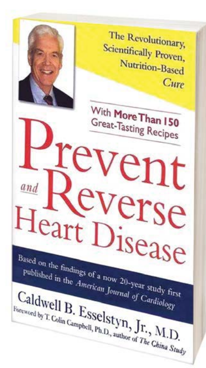

হৃদরোগ গবেষণায় নতুন দিগন্ত ॥
ডা. ডিন অরনিশের প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ

নিজের জীবন বদলের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা আর প্রাচ্যের সাধকদের চিরায়ত জ্ঞানের আলোকে হৃদরোগীদের নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন ডা. ডিন অরনিশ। উদ্ভাবন করেন হৃদরোগ নিরাময়ের এক কার্যকর ও সমন্বিত চিকিৎসাপদ্ধতি। করোনারি হৃদরোগ নিরাময়ে নিজের সফল

গবেষণার আদ্যোপান্ত নিয়ে ডা. অরনিশ পরবর্তীকালে লেখেন তার বেস্টসেলার বই *প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ*। বইটিতে তিনি এ যুগান্তকারী গবেষণার সূত্রপাত ও এর নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।

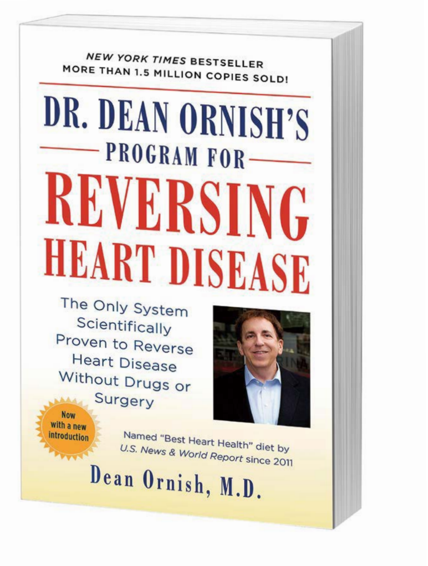

পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং প্রচলিত ধারার একজন চিকিৎসক ডা. ডিন অরনিশ, যিনি পড়াশোনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথমসারির একটি মেডিকেল কলেজে। কেন তিনি হঠাৎ উৎসাহী হলেন চেনা পথের বাইরে হাঁটতে? হৃদরোগ নিরাময়ের আধুনিক চিকিৎসার বদলে তার রোগীদের কেন তিনি উদ্বুদ্ধ করলেন প্রাকৃতিক ও সমন্বিত চিকিৎসাপদ্ধতি গ্রহণে? সে বিষয়টির পূর্বাপর এখানে আলোকপাত করা যেতে পারে।

ডিন অরনিশ তখন ছাত্র। প্রি-মেডিকেল কোর্সে পড়াশোনা করছিলেন। এ কোর্সটি ভালোভাবে শেষ করতে পারলে তবেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। সব ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু বাধ সাধল অর্গানিক কেমিস্ট্রি। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ভালো করাকেই মেডিকেল কলেজে ভর্তির একমাত্র যোগ্যতা বলে মনে করতেন। এদিকে অর্গানিক কেমিস্ট্রির প্রথম ক্লাসেই জাঁদরেল শিক্ষক এসে ঘোষণা দিলেন—'এটি হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্সের আগাছা পরিষ্কার করার ক্লাস এবং তোমাদের আমি আগাছা হিসেবে দূর করে দেবো।'

সেই শিক্ষক পড়াতেন টেক্সটবুক ছাড়াই, অল্প কিছু শ্রুতিধর ছাত্রছাত্রী ছাড়া অধিকাংশই তার পড়া ধরতে পারত না। ফলে অরনিশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করলেন এবং একসময় তার মধ্যে হতাশা দেখা দিল। অরনিশ ভাবলেন, তার পক্ষে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে পাশ করা সম্ভব নয়। নিদারুণ বিষণ্ণতায় ভুগতে শুরু করলেন তিনি। একপর্যায়ে তার মধ্যে আত্মহত্যার

প্রবণতা দেখা দিল। একদিন তিনি আত্মহননের পরিকল্পনাও করে ফেললেন বাড়ির কাছেই! বড় রাস্তার ওপর ওভারব্রিজ, সেই ওভারব্রিজে উঠবেন, লাফ দিয়ে নিচের রাস্তায় পড়বেন, কোনো গাড়ি এসে তাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে। পরিকল্পনা মোটামুটি চূড়ান্ত।

কিন্তু ক্রমাগত হতাশা আর বিষণ্নতায় তিনি মানসিকভাবে এতই দুর্বল হয়ে পড়লেন যে, নির্ধারিত দিনে তার পক্ষে বাড়ির বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, বিছানা ছেড়ে ওঠাই সম্ভব হলো না। পরবর্তী সময়ে অরনিশ লিখেছেন, এই ঘটনাটিও তাকে বুঝতে সাহায্য করে—মন কীভাবে শরীরকে প্রভাবিত করে। যা-ই হোক, আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাতেও ব্যর্থ হওয়ায় অরনিশ একসময় কলেজে যাওয়াই ছেড়ে দিলেন। পড়াশোনায় একরকম ইস্তফা দিয়ে দিলেন। চলে গেলেন টেক্সাসে নিজ বাড়িতে।

এদিকে তাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আধ্যাত্মিক সাধক স্বামী সচ্চিদানন্দ। অরনিশের বাবা ছিলেন স্বামীজীর অনুসারী। অরনিশকে তিনি নিয়ে গেলেন স্বামীজীর কাছে।

যোগগুরু স্বামী সচ্চিদানন্দ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন সাধক। তৎকালীন সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ এবং জাতিসংঘে বক্তৃতা করেন। স্বামীজী অরনিশকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নতুন ধারণা দিলেন। শিথিলায়ন, মেডিটেশন, নিরামিষ খাবার, ইয়োগা, প্রাণায়াম ও মনছবির প্রক্রিয়া শেখালেন। স্বামীজীর কাছে অরনিশ নিয়মিত যাতায়াত এবং চর্চা অব্যাহত রাখলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তার বিষণ্নতা কেটে গেল। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন অরনিশ। আবার কলেজে ফিরে গেলেন এবং সফলভাবে প্রি-মেডিকেল কোর্স সম্পন্ন করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। ছাত্রজীবনের এই ঘটনা অরনিশের জীবনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। তার জীবনদৃষ্টি ও জীবনধারায় আসে স্থায়ী ও গভীর পরিবর্তন।

পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে তিনি যখন হাসপাতালের কার্ডিওলজি ইউনিটে কাজ করতে শুরু করেন, তখন হৃদরোগীদের কষ্ট তাকে নানাভাবে স্পর্শ করে। তিনি দেখেন, যে-সব হৃদরোগী ব্লকেজ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন, তাদের এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস করা হচ্ছে। বিস্ময়ের সাথে তিনি লক্ষ করেন, এনজিওপ্লাস্টি করা হয়েছে এমন রোগীদের ৩০% থেকে ৫০% পরবর্তী চার থেকে ছয় মাসের মধ্যেই পুনঃব্লকেজ নিয়ে

হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। যাদের বাইপাস সার্জারি করা হচ্ছে তাদের প্রায় অর্ধেকই পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে আবার ব্লকেজ নিয়ে আসছেন।

অরনিশ লক্ষ করলেন, হাসপাতালের কার্ডিওলজি ইউনিটে স্ন্যাকস হিসেবে রোগীদের দেয়া হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, সাথে মেয়োনেজ। শুধু তা-ই নয়, হাসপাতালের লবিতে শোভা পাচ্ছে সিগারেট মেশিন। হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়ায় যে খাবারগুলো পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে চিজবার্গারসহ নানারকম চর্বিজাত খাবার ও ফাস্ট ফুড।

অরনিশ বুঝলেন গলদটা কোথায়। তিনি জানতেন, এর বছর কয়েক আগে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্যাথলজিস্ট ড. রবার্ট উইসলার একটি গবেষণা পরিচালনা করেন, যেখানে একদল বেবুনকে নিয়মিত হসপিটাল ডায়েট (হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের যে-সব খাবার দেয়া হয়) খাওয়ানো হয়। কিছুদিন পর দেখা যায়, বেবুনগুলোর করোনারি ধমনীতে ব্লকেজ তৈরি হয়েছে।

পুরো বিষয়টি অরনিশের মনে গভীর রেখাপাত করল। হৃদরোগীদের নিয়ে তিনি গবেষণার সিদ্ধান্ত নিলেন। ছাত্রজীবনে নিজের হতাশা-ব্যর্থতা এবং তা থেকে উত্তরণের ঘটনাটি তার এ গবেষণায় ব্যাপক প্রভাব রাখে। প্রাচ্যের বুজুর্গ-ঋষি-সাধকদের হাজার বছরের চিরায়ত শিক্ষার এক চমৎকার প্রয়োগ তিনি ঘটালেন হৃদরোগীদের জীবনে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে ডা. অরনিশ এ বিষয়টির উপযোগিতা নতুনভাবে উপস্থাপন করলেন সবার সামনে। সুস্থ জীবনের আশাবাদ ফিরে পেলেন হৃদরোগীরা।

মেডিটেশন ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস ॥ বদলে দিল হৃদরোগীদের জীবন

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ডা. ডিন অরনিশ এ ব্যাপারে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করলেন। অবশেষে ১৯৮৬ সালে ৪৮ জন হৃদরোগীকে নিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিক গবেষণা শুরু করেন। এই রোগীদের কেউই এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি করাতে রাজি ছিলেন না। এদিকে কোলেস্টেরল জমে জমে তাদের করোনারি ধমনীতে রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। কেউ কেউ ততদিনে হার্ট অ্যাটাকেরও শিকার হয়েছেন। তাদেরকে দুটি দলে ভাগ করলেন অরনিশ। প্রথম দলে ২৮ জন আর কন্ট্রোল গ্রুপে ২০ জন।

প্রথম ২৮ জনকে নিয়ে ডিন অরনিশ নতুন কার্যক্রম হাতে নিলেন। স্বামী সচ্চিদানন্দের কাছ থেকে শেখা জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজের জীবন-অভিজ্ঞতার আলোকে অরনিশ তাদের জীবনদৃষ্টি পরিবর্তন করার শিক্ষা দিলেন। জীবন সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শুধরে ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করলেন। খোলামেলা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে অরনিশ তাদের একাকিত্ব, বিষণ্নতা, দুঃখ, মানসিক চাপ ও অশান্তির কারণ খুঁজে বের করলেন এবং তা থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিলেন।

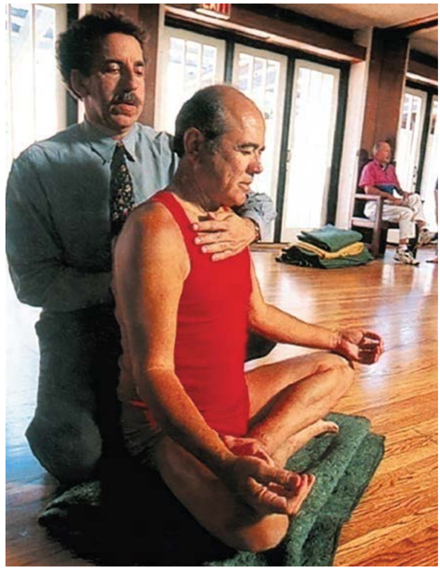

একজন হৃদরোগীর মেডিটেশনের ভঙ্গি ঠিক করে দিচ্ছেন ডা. ডিন অরনিশ

অরনিশ তাদেরকে প্রতিদিন দুবেলা নিরাময়ের মেডিটেশন করতে শেখালেন। পাশাপাশি তিনি ইয়োগার কিছু আসন শেখালেন তাদের এবং ৩০ মিনিট ইয়োগা করতে বললেন। প্রাণায়াম চর্চা শেখালেন। ঘণ্টায় চার মাইল বেগে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটার পরামর্শ দিলেন।

অরনিশ তাদের জন্যে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করলেন। ডিমের সাদা অংশ ও চর্বিমুক্ত টক দই ছাড়া সকল প্রাণিজ আমিষ পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেন। আর বিকল্প উদ্ভিজ্জ আমিষ হিসেবে লাল চালের ভাত/ লাল আটার রুটি ডাল মটরশুঁটি সয়াদুধ এবং সেইসাথে পর্যাপ্ত ফল সালাদ শাকসবজি ও সবুজ পাতা খেতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তেল ছাড়া খাবার গ্রহণে তিনি বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করলেন রোগীদের। এ-ছাড়া সব ধরনের ভাজাপোড়া, প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফাস্ট ফুড, কোমল পানীয় ইত্যাদি ক্ষতিকর খাবার নিষিদ্ধ করলেন। এর সাথে অবশ্যই ধূমপান বর্জন।

এ কার্যক্রমের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ছিল সপ্তাহে দুবার গ্রুপ সাপোর্ট ও কাউন্সেলিং সেশন, যেখানে রোগীরা তাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক পারিপার্শ্বিক যে-কোনো সমস্যা-সংকট নিয়ে আলাপ-পরামর্শ করতেন। নিজের এমন কোনো দুঃখ হতাশা কষ্ট, যা হয়তো তিনি এতদিন কাউকে বলতে পারছিলেন না, তারা সে-সব বিষয়ে অবলীলায় অরনিশ ও অন্যান্য কাউন্সিলরদের সাথে ভাব-বিনিময় করতে লাগলেন। প্রয়োজনে অঝোরে কেঁদে বুকটাকে হালকা করতেন হৃদরোগীরা।

অন্যদিকে, কন্ট্রোল গ্রুপের ২০ জনকে আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশন নির্দেশিত পথ্যবিধি ও হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসার অধীনে রাখা হলো।

জীবন-অভ্যাস পরিবর্তনই প্রকৃত সমাধান

একবছর ধরে চলল গবেষণা। এ পুরো সময় ধরে দুই গ্রুপের রোগীদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হলো। একবছর পর দুদলের সব রোগীকে পরীক্ষা করা হলো—কোন গ্রুপে কেমন অগ্রগতি হয়েছে। পাওয়া গেল অভূতপূর্ব ফলাফল। দেখা গেল, ডা. অরনিশের কর্মসূচি অনুসরণ করেছিলেন যারা, তাদের ধমনীতে ব্লকেজের পরিমাণ তো বাড়েই নি; বরং কমেছে। এবং হৃৎপিণ্ডের চারপাশে ছোট ছোট পরিপূরক রক্তনালিগুলো সচল হয়ে উঠেছে, যা 'ন্যাচারাল বাইপাস' নামে পরিচিত। ধমনীতে রক্ত চলাচল সন্তোষজনকভাবে বেড়েছে। সেইসাথে রোগীরা মুক্তি পেয়েছেন কষ্টকর বুকব্যথা থেকে। ফলে তাদের হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কাও কমে এসেছে।

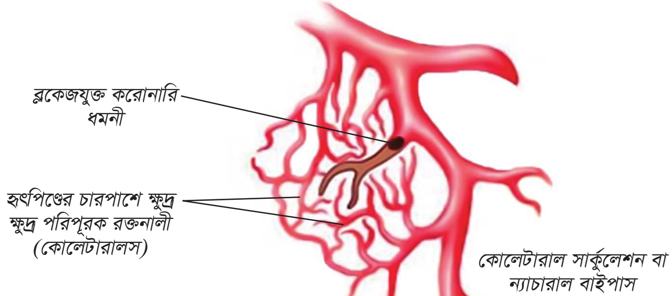

অপরদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের ২০ জনের প্রায় সবারই ধমনীতে ব্লকেজের পরিমাণ বেড়েছে। তাদের শারীরিক অবস্থার কোনো উন্নতি তো হলোই না; বরং কারো কারো অবস্থার বেশ অবনতি ঘটল।

জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ থেকে মুক্তির এ যুগান্তকারী সাফল্যের কথা বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারে ১৯৮৮ সালে। সে বছরই *জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন* গবেষণাটি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করে।

অবশ্য এ ধরনের গবেষণা তখন একেবারে নতুনও নয়। এর আগে একেকজন চিকিৎসক আলাদা আলাদাভাবে একেকটি বিষয় নিয়ে এ-সংক্রান্ত গবেষণা-কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন, যেমন : ডা. হার্বার্ট বেনসন গবেষণা চালিয়েছিলেন মেডিটেশনের প্রভাব নিয়ে, ডা. র‍্যাল্ফ পাফেনবার্গার কাজ করেছিলেন ব্যায়াম নিয়ে, ডা. ফ্র্যাঙ্ক সাক্স দেখতে চেয়েছিলেন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রভাব। প্রথমত, এসব গবেষণার কোনোটিই সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ ছিল না। দ্বিতীয়ত, সেগুলো ছিল উচ্চ রক্তচাপ ও অতিরিক্ত কোলেস্টেরলের রোগীদের নিয়ে। হৃদরোগীদের নিয়ে কোনোটিই নয়।

ডা. অরনিশই হৃদরোগ নিরাময়ে এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ গবেষণার সূত্রপাত করেন। তিনি হৃদরোগীদের সমন্বিত জীবনাচার পরিবর্তনে উৎসাহী করে তোলেন। যেমন : নিয়মিত মেডিটেশন, সুস্থ খাদ্যাভ্যাস, ইয়োগা, হাঁটা, গ্রুপ-সাপোর্ট ও কাউন্সেলিং। ফলে উচ্চ রক্তচাপ, রক্তের গ্লুকোজ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা তো নিয়ন্ত্রণে এলোই, সাথে করোনারি ব্লকেজের পরিমাণও কমতে শুরু করল।

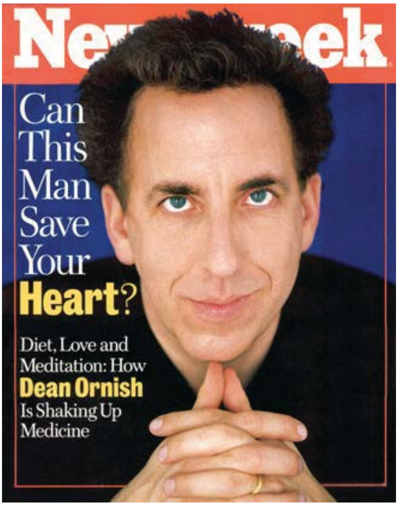

ডা. ডিন অরনিশ ও তার উদ্ভাবিত চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে নিউজউইক সাময়িকীর একটি প্রচ্ছদ

নতুন আশা নতুন বিশ্বাস

ডা. ডিন অরনিশ উদ্ভাবিত এ চিকিৎসাপদ্ধতির সাফল্যের খবর সর্বমহলেই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। এ নিয়ে বিশ্বখ্যাত সাময়িকী *নিউজউইক* (২৪ জুলাই ১৯৯৫) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করে 'গোয়িং মেইনস্ট্রিম' নিবন্ধটি। এ গবেষণা থেকে সবার কাছে একটি বার্তা পৌঁছে যায় যে, সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবনাচার অনুসরণের মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ এমনকি নিরাময়ও করা যায়।

পরিসংখ্যানভিত্তিক এ গবেষণার সমস্ত তথ্য-উপাত্ত ও সাফল্যের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ওমাহার মিউচ্যুয়াল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি স্বাস্থ্যবীমার পলিসিধারী শত শত হৃদরোগীকে অরনিশের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এদের মধ্যে ২০০ জন রোগী ১৫ হাজার ডলারের এনজিওপ্লাস্টি বা ৪০ হাজার ডলারের বাইপাস সার্জারির জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার বদলে অংশ নেন অরনিশের পাঁচ হাজার ডলারের ঝুঁকিমুক্ত এ জীবনধারা পরিবর্তন পদ্ধতিতে। বছরব্যাপী এ কর্মসূচিতে ছিল নিয়মিত মেডিটেশন, ইয়োগা, হাঁটা, চর্বিমুক্ত খাবার গ্রহণ এবং কাউন্সেলিং।

২০০ জন রোগীর মধ্যে ১৯০ জন একবছরের এই কর্মসূচি অনুসরণ করেন। এর মধ্যে ১৮৯ জনই সুস্থ হয়ে ওঠেন, মাত্র একজনের অপারেশনের প্রয়োজন পড়ে। অভাবনীয় এ সাফল্য দেখে আরো ১৫টি বীমা কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের অরনিশের কর্মসূচিতে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পাঠানো হয় ক্যালিফোর্নিয়ার সাওসালিটোতে ডা. অরনিশের কাছে। সবাই এ কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ও শিখতে চান।

নেবেরেস্কার ৫০ বছর বয়সী একজন পুলিশ অফিসার ফ্রাঙ্ক সেবরন। তিনি অরনিশের কর্মসূচিতে যোগ দেন। এর আগে তার এনজিওপ্লাস্টি করা হয়েছে এবং তাকে প্রতিমাসে ২০০ ডলার ব্যয় করে বেশ কয়েকটি ওষুধ খেতে হতো। শারীরিকভাবে তিনি এতটাই দুর্বল ছিলেন যে, অল্প পরিশ্রমের কোনো ছোটখাটো কাজও করতে পারতেন না। ডা. ডিন অরনিশের একবছর মেয়াদি কার্যক্রম অনুসরণ করে তার করোনারি ধমনীতে রক্তপ্রবাহ আগের চেয়ে বাড়ল। কোলেস্টেরলের মাত্রাও কমল আগের তুলনায়। দুর্বলতা

কাটিয়ে উঠে তিনি এমনই উদ্যম অনুভব করছিলেন যে, বাইসাইকেলে দূরপাল্লার ভ্রমণ পর্যন্ত করতে পারছিলেন।

ডা. ডিন অরনিশের গবেষণার পাশাপাশি একই সময়ে আরেকজন গবেষক হৃদরোগীদের নিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করছিলেন। আমেরিকার ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের সার্জন ডা. কাল্ডওয়েল এসেলস্টাইন। ডা. ডিন অরনিশ এবং ডা. কাল্ডওয়েল এসেলস্টাইনের দেয়া খাদ্যাভ্যাসে কিছুটা পার্থক্য ছিল। ডা. অরনিশ তার রোগীদের যে খাবার খেতে দিতেন তা ছিল 'ভেজিটেরিয়ান ডায়েট' (প্রাণিজ আমিষের মধ্যে শুধু ডিমের সাদা অংশ ও টক দই দেয়া হয়)। সাথে বিকল্প উদ্ভিজ্জ আমিষ এবং ফল, সালাদ, সবুজ পাতা। ডা. কাল্ডওয়েল এসেলস্টাইন যে খাবার দিয়েছিলেন তা ছিল 'ভেগান ডায়েট' (সব ধরনের প্রাণিজ আমিষ বন্ধ, সাথে বিকল্প উদ্ভিজ্জ আমিষ এবং ফল, সালাদ, সবুজ পাতা)। উভয় ক্ষেত্রেই সব খাবার ছিল তেল ছাড়া। অবশ্য তিনিও ডা. ডিন অরনিশের মতো করোনারি হৃদরোগীদের ব্লকেজ কমাতে বা রিভার্স করতে সক্ষম হন।

অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলধারায়

করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে ডা. ডিন অরনিশের এ কর্মসূচি এত ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে যে, এটি এখন আর বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতি নয়; বলা যায়, চিকিৎসার মূলধারায় এর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।

এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি ছাড়া হৃদরোগ নিরাময়ের এ চিকিৎসাপদ্ধতি এখন সবচেয়ে আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। গত দুদশকে যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বেই এটি পেয়েছে বিপুল জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন হৃদরোগে আক্রান্ত হলে প্রচলিত চিকিৎসাবিধি অনুসারে ২০০৪ সালে তার বাইপাস সার্জারি করা হয়। খাদ্যাভ্যাস ও জীবনাচারে পরিবর্তন না আনায় পুনরায় জটিলতা সৃষ্টি হলে ২০১০ সালে তার করোনারি ধমনীতে দুটি রিং পরানো হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তার শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে থাকে।

এ পরিস্থিতিতে শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে ডা. ডিন অরনিশ এবং ডা. কাল্ডওয়েল এসেলস্টাইনের তত্ত্বাবধানে তিনি তার খাদ্যাভ্যাস ও জীবনাচারে

আমূল পরিবর্তন আনেন। সব ধরনের প্রাণিজ আমিষ (মাছ মাংস ডিম দুধ) বন্ধ রাখেন এবং উদ্ভিজ্জ আমিষ গ্রহণ করতে থাকেন। এ-ছাড়া পুরোপুরি তেল ছাড়া রান্না খেতে শুরু করেন। সাথে পর্যাপ্ত ফল, সালাদ, শাকসবজি, সবুজ পাতা, বিন ও পূর্ণ শস্যদানা (লাল আটা) খেতে শুরু করেন। ছয় মাসেই তিনি পূর্ণ সুস্থ হয়ে কর্মব্যস্ত জীবনে ফিরে যেতে সক্ষম হন।

হৃদরোগ গবেষণায় ডা. অরনিশের সাফল্যের খবর বিশ্বজুড়ে মূলধারার পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন খ্যাতনামা জার্নালগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ডা. অরনিশের গবেষণার ফলাফল এবং এ-সংক্রান্ত কিছু মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

Newsweek

Revolutionary Results

"Dr. Dean Ornish's work could change the lives of millions... At the end of the year, most patients reported that their chest pains had virtually disappeared for eighty two percent of the patients, arterial clogging had reversed. They started to feel better almost immediately, and today they feel great. Dr. Dean Ornish's patients are thrilled with their new lives. By the standards of conventional medicine, the impossible has happened."

U.S. News & World Report

"... Now a growing body of research shows that people can actually clean out their coronary arteries. The first hard evidence that lifestyle changes alone-no drugs, no surgery can set heart disease patients on the road to improved health appeared in a study directed by Dr. Dean Ornish."

শুধু মেডিকেল সায়েন্সের জার্নালেই নয়, কার্ডিওলজির পাঠ্যবইগুলোর সাম্প্রতিক সংস্করণেও করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে মেডিটেশন ও জীবনধারা পরিবর্তন কর্মসূচির কথা গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে।

Hurst's : The Heart

(12th edition, page-2468)

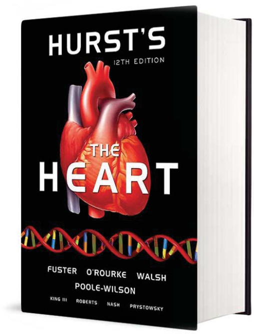

... মেডিটেশন জীবনে শৃঙ্খলা নিয়ে আসে। শরীর স্থির হয়, মন হয়ে ওঠে প্রশান্ত। এর ফলে নিরাময়ের একটি অনুরণন সৃষ্টি হয়, যা হৃদরোগের ভীতিকর বুকব্যথা থেকে মুক্তি দেয় এবং জীবনমানের উন্নতি ঘটায়। হৃদরোগীর জীবনধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাই এর ভূমিকা রয়েছে এবং এটি এথেরোরিগ্রেশন করে (করোনারি ধমনীতে জমে থাকা কোলেস্টেরলের নিঃসরণ ঘটায়)।

Braundwald's Heart Disease

(8th edition, page-1157)

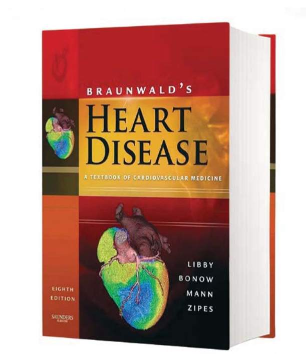

... মেডিটেশন, যোগব্যায়াম, গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস (প্রাণায়াম) ব্যথা ও দুশ্চিন্তা দূর করে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ পদ্ধতিতে মানসিক চাপ কমে ও রোগ নিরাময় সম্পন্ন হয়। মেডিটেশন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ায়।

দ্য চায়না স্টাডি

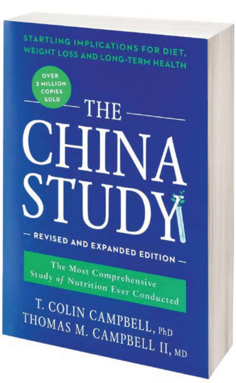

যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটির গবেষক ড. টি কলিন ক্যাম্পবেল, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং চাইনিজ একাডেমি অব প্রিভেনটিভ মেডিসিনের সাথে যৌথভাবে দীর্ঘ তিন দশক ধরে আমেরিকা ও চীনের মানুষের পুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা করেন। মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে এ যাবৎকালের দীর্ঘ গবেষণায় উঠে এসেছে যে, বিশ্বব্যাপী এত উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, স্থূলতা ও

ক্যান্সারের প্রধান কারণ মাত্রাতিরিক্ত প্রাণিজ আমিষ, চিনি, অন্যান্য রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট, প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাত খাবার গ্রহণ এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব।

এই দীর্ঘ গবেষণার আলোকে তারা 'চায়না স্টাডি ডায়েট প্ল্যান' তৈরি করেন, যা অনুসরণে এ রোগগুলো প্রতিরোধ এমনকি নিরাময় করাও সম্ভব।

নিজের দায়িত্ব নিতে হবে নিজেকেই

প্রবাদ আছে, Patient cure themselves, doctors show the way. নব্য চিকিৎসাধারার প্রবর্তক ও খ্যাতনামা চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. ডিন অরনিশ, ডা. দীপক চোপড়া, ডা. এন্ড্রু ওয়েল, ডা. কার্ল সিমনটন, ডা. বার্নি সিজেল, ডা. জন রবিন্স প্রমুখ 'বডি, মাইন্ড, স্পিরিট' সাময়িকীর ১৯৯৭ সালের একটি বিশেষ সংখ্যায় 'একবিংশ শতকের স্বাস্থ্য' শীর্ষক প্রচ্ছদ-নিবন্ধে বলেন, সুস্থ থাকতে হলে নিজের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিজেকেই গ্রহণ করতে হবে। নিজেকে নিরাময় করার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের সহজাত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

আমেরিকার হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ও প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. হার্বার্ট বেনসন বলেন, একজন মানুষ রিল্যাক্সেশন, মেডিটেশন, ব্যায়াম ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন। বর্তমানে রোগীরা যেখানে ওষুধ বা সার্জারির ওপর নির্ভর করছে, সেখানে তাদেরকে নিজেদের ওপর নির্ভর করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ আপনার স্বাস্থ্য ও নিরাময়ের দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই। ডাক্তার, ওষুধ, সার্জারি সবই হবে আপনার সহযোগী শক্তি।

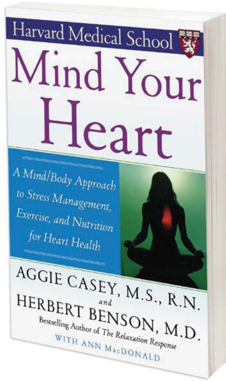

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের কার্ডিওলজিস্ট প্রফেসর হার্বার্ট বেনসন গবেষণায় দেখান, হৃদযন্ত্রের পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যে প্রয়োজন রিল্যাক্সেশন, মেডিটেশন, প্রাণায়াম ও ইয়োগা এবং বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর জ্যেষ্ঠ গবেষক ডা. জন রবিন্স বলেন, রোগীরা মনে করে যে, সুস্বাস্থ্য ও নিরাময় রয়েছে ডাক্তার, ড্রাগ স্টোর আর হাসপাতালে। রোগীদের ধারণা, ডাক্তার তাদের কোনো একটি ধন্বন্তরী ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা ইনজেকশন দিয়ে ভালো করে দেবেন। এ আশায় রোগীরা ডাক্তারের পর ডাক্তার আর ওষুধের পর ওষুধ বদলান, কিন্তু পূর্ণ নিরাময় লাভ করতে ব্যর্থ হন। তিনি বলেন, আসলে নিরাময় ও রোগমুক্তির ক্ষমতা আমাদের মনোদৈহিক সিস্টেমের মধ্যেই রয়েছে। চিকিৎসক শুধু সহায়ক শক্তিমাত্র।

বিশ্বখ্যাত টাইম সাময়িকীর প্রচ্ছদ
নিবন্ধে ডা. এন্ড্রু ওয়েল

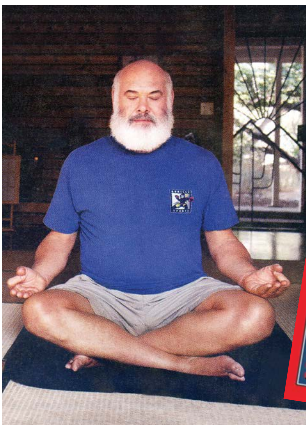

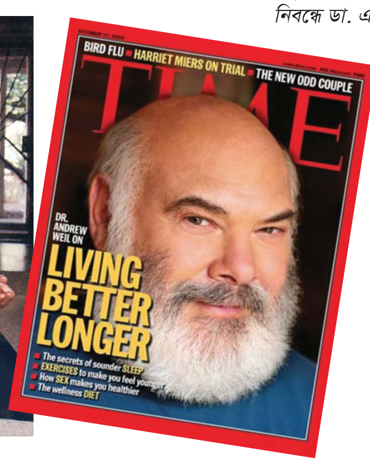

মেডিটেশন করছেন এরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যাপক ডা. এন্ড্রু ওয়েল। তিনি হৃদরোগ নিরাময়ে মেডিটেশন, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ও ব্যায়ামের গুরুত্বকে নতুনভাবে বর্ণনা করেছেন তার সাম্প্রতিক বইয়ে।

মেডিটেশন
হৃদরোগ নিরাময়ে কার্যকর

বদলে যান ভেতর থেকেই	৭০
নিয়মিত মনছবি রোগ নিরাময় করে	৭১
মনছবি কেন?	৭৩
হৃদরোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কীভাবে মনছবি দেখবেন?	৭৫
মেডিটেশন ॥ হৃদরোগ নিরাময়	৭৬

শরীরের চেয়ে মন অনেক বেশি শক্তিশালী।
মনের শক্তি রাসায়নিক বিক্রিয়া করে রোগ প্রতিরোধ
ক্ষমতা বাড়ায়, এমনকি রোগ নির্মূল করে।

মেডিটেশন
হৃদরোগ নিরাময়ে কার্যকর

অসুস্থ মানুষের প্রধান চাওয়া থাকে একটাই—সুস্থতা। নিরাময়ের জন্যে আসলে প্রথম প্রয়োজন সুস্থতার এই আকুতি। দেখা গেছে, এই আকুতি যার মধ্যে যত তীব্র ও প্রবল, তার নিরাময়ও ঘটে তত দ্রুত।

খ্যাতনামা মেডিকেল জার্নাল *ল্যানসেট*-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, ক্যান্সারে ভুগছিলেন এমন রোগীদের মধ্যে যারা তাদের ক্যান্সার নিয়ে তেমন আতঙ্কিত ছিলেন না কিংবা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে যাদের ভেতর এক ধরনের লড়াকু মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, তাদের সেরে ওঠার হার অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক বেশি।

এমনই একজন হলেন জিম। কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে জিমের অপারেশন করলেন ডা. বার্নি সিজেল। কেমোথেরাপি দেয়া হলো। তারপরও চিকিৎসকদের মতে তার বাঁচার সম্ভাবনা আর বড়জোর ছয় মাস। কিন্তু জিম ছিলেন ভীষণ লড়াকু মনের এক মানুষ। তিনি ব্যাপারটাতে তেমন ভয়ই পেলেন না এবং সমস্ত পরিসংখ্যানকে মিথ্যা প্রমাণ করে তিনি বেঁচে ছিলেন পরবর্তী কয়েক দশক।

ডা. বার্নি সিজেলের আরেকজন রোগী আর্ভিং। পেশায় তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠানের ফিন্যান্সিয়াল এডভাইজার। পেশাগত কারণে পরিসংখ্যান নিয়েই ছিল তার কাজ-কারবার। লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে একসময় অনকোলজিস্টের কাছে গেলেন তিনি। অনকোলজিস্ট সব শুনে পরিসংখ্যান দেখে বললেন, এ রোগে খুব বেশিদিন বাঁচার সম্ভাবনা নেই।

এমনিতেই এ ধরনের কথা শুনে রোগীরা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। আর্ভিংয়ের ক্ষেত্রে সেটা হলো আরো প্রকট। বেঁচে থাকার জন্যে ন্যূনতম চেষ্টা বা নিরাময়ের সম্ভাবনা—এ দুটোই অযৌক্তিক মনে হলো তার কাছে।

পরিসংখ্যানটাই তার কাছে হয়ে উঠল একমাত্র সত্য এবং সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। তিনি ভাবলেন, আমার পুরো জীবনটাই কেটেছে পরিসংখ্যান নিয়ে আর সেই পরিসংখ্যানই বলছে যে, আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তবে আর বাঁচার উপায় কী? হাল ছেড়ে দিয়ে একসময় তিনি বাড়ি ফিরে যান এবং এর অল্প কদিন পরই মারা যান।

এই যে বেঁচে থাকার ইচ্ছা, বেঁচে থাকার স্বপ্ন এবং আকুতি—সুস্থতার জন্যে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কারণেই নিরাময়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী প্রক্রিয়া হচ্ছে ইমেজ থেরাপি বা নিরাময়ের মনছবি।

বদলে যান ভেতর থেকেই

আপনার দেহের প্রতিটি কোষের ডিএনএ-র মধ্যে নিরাময়ের যে তথ্যমালা সঞ্চিত আছে, আপনার প্রয়োজনীয় মনোযোগের অভাবে তা এতদিন সুপ্ত ছিল। এখন আপনি আপনার এই শক্তি সম্বন্ধে জেনেছেন। সচেতন হয়ে উঠেছেন। এবার বিশ্বাসী হয়ে উঠুন। আপনার এ বিশ্বাসই একটু একটু করে আপনাকে নিরাময়ের পথে নিয়ে যাবে। আপনাকে সুস্থ করে তুলবে।

এতদিন মনে করা হতো যে, ডিএনএ-ই হচ্ছে আপনার নিয়তি। যা কোনোভাবেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। ডিএনএ-র জেনেটিক কোডে ভালো বা মন্দ যে তথ্যমালা রয়েছে, শেষ পর্যন্ত তা-ই হবে। আপনার শরীরের সুখ-অসুখের যাবতীয় ব্যাপারগুলোও সে অনুযায়ীই ঘটবে। অর্থাৎ জেনেটিক বা বংশগত রোগের কোনো ঝুঁকি বা সম্ভাবনা আপনার জিন-এ থাকলে তা থেকে আর রক্ষা নেই। কিন্তু জিনবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা এতদিনকার এ ধারণা পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। দীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, আপনারও কিছু করার আছে। আপনার মধ্যে যদি আকুতি সৃষ্টি হয়, আপনি যদি প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন পদ্ধতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেন, তবে আপনি অবশ্যই আপনার ডিএনএ-কে প্রভাবিত করতে পারবেন। এমনকি বদলে যেতে পারে আপনার ডিএনএ-র জেনেটিক কোডে সঞ্চিত তথ্যমালাও।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ডিএনএ-র মধ্যে জিনের (Gene) পাশাপাশি এপিজেনোম (Epigenome) নামক রাসায়নিক যৌগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হন। তারা বলছেন, জিন হচ্ছে হার্ডওয়্যার আর এপিজেনোম হচ্ছে

সফটওয়্যার। অর্থাৎ জিন প্রভাবিত হয় এপিজেনোম দ্বারা।

Why your DNA is not your destiny শিরোনামে *টাইম* সাময়িকীর ৬ জুন ২০১০ সংখ্যায় বিষয়টি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচ্ছদ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। জিনবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে, একজন মানুষ নিজের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং নিয়মিত ব্যায়াম, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থ জীবনাচার অনুসরণের মাধ্যমে তার এপিজেনোমের প্রোগ্রামিং বদলে দিতে পারে। সে অনুসারে বদলে যেতে পারে জিনের তথ্যমালা এবং শেষ পর্যন্ত তার দেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমও সেভাবেই পরিচালিত হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, অভূতপূর্ব এই উদ্ভাবন জিনবিজ্ঞানের জগতে নতুন সম্ভাবনা ও নতুন দিগন্তের সূচনা করতে যাচ্ছে।

শুধু তা-ই নয়, আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের একদল বিজ্ঞানী দীর্ঘ গবেষণার পর দেখেছেন, মেডিটেশন জিনের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে। তাদের মতে, গভীর শিথিলায়ন, মনছবি এবং জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে উচ্চ রক্তচাপ থেকে পুরোপুরি নিরাময় লাভ করা সম্ভব। Relaxation changes genes শিরোনামে এটি প্রকাশিত হয়েছে *রিডার্স ডাইজেস্ট* সাময়িকীর জানুয়ারি ২০১০ সংখ্যায়।

নিয়মিত মনছবি রোগ নিরাময় করে

চিকিৎসা ও সুস্থতার ক্ষেত্রে মনছবি প্রয়োগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. কার্ল সিমনটন। আধুনিক চিকিৎসাজগতে তার উদ্ভাবিত 'ইমেজ থেরাপি' প্রয়োগ করে বহু মানুষ রোগমুক্ত হয়েছেন। এমনকি চিকিৎসকেরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন—এমন অন্তিম অবস্থা থেকেও বহু রোগী ইমেজ থেরাপির মাধ্যমে নিরাময় লাভ করেছেন, সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

ইমেজ থেরাপি বা মনের চিত্রকল্পের শক্তি যে কতটা কার্যকরী হতে পারে,

Relaxation Changes Genes

Study shows meditating turns off stress-related genes

Relaxation Changes Genes

Study shows meditating turns off stress-related genes

Deep relaxation from meditation and yoga – known as the relaxation response – can change our bodies. A recent study from Massachusetts General Hospital shows mind states can change gene activity that affects how the body responds to stress. "This is the first comprehensive study of how the mind can affect gene expression, linking what has been looked on as a 'soft' science with the 'hard' science of genomics," says study co-author Towia Libermann.

Previously the team had found that people who received relaxation training and counselling on lifestyle-risk factors were more than twice as likely to eliminate one blood pressure medication than those people receiving counselling alone. Research suggests people who are able to free their body of tension can switch on the protective effect of genes and fight free radicals and inflammation. Scientists are now looking at whether the mind state helps protect against cancer.

Deep relaxation from meditation and yoga— known as the relaxation response— can change our bodies. A recent study from Massachusetts General Hospital shows mind states can change gene activity that affects how the body responds to stress. "This is the first comprehensive study of how the mind can affect gene expression, linking what has been looked on as a 'soft' science with the 'hard' science of genomics," says study co-author Towia Libermann.

Previously the team had found that people who received relaxation training and counselling on lifestyle-risk factors were more than twice as likely to eliminate one blood pressure medication than those people receiving counselling alone. Research suggests people who are able to free their body of tension can switch on the protective effects of genes and fight free radicals and inflammation. Scientists are now looking at whether the mind state helps protect against cancer.

রিডার্স ডাইজেস্টে (জানুয়ারি ২০১০) প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদন Relaxation Changes Genes

তা একটি উদাহরণ থেকে বোঝা যেতে পারে। ডা. কার্ল সিমনটনের তত্ত্বাবধানে এক ক্যান্সার রোগী রেডিয়েশন দেয়ার সময় মনছবি দেখত যে, কোটি কোটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বুলেট ক্যান্সারের কোষগুলোকে আঘাত করে মেরে ফেলছে। ওগুলো মারা যাওয়ার সাথে সাথে রক্তের শ্বেত কণিকারা এসে ধরে ধরে মৃত কোষগুলোকে কিডনিতে ঠেলে দিচ্ছে। আর কিডনি তা মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দিচ্ছে এবং প্রতিদিন ক্যান্সারের আয়তন ছোট হচ্ছে। রেডিয়েশন ও এই মনছবির প্রতিক্রিয়ায় সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

মনছবি কেন?

রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মনছবি কীভাবে কাজ করে সে-সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের দুটি পরিপূরক মত রয়েছে।

প্রথম দলের অভিমত হচ্ছে, মনছবি মস্তিষ্কের বাম ও ডান বলয়ের তৎপরতার মধ্যে একটি ভারসাম্য ও সুষম সমন্বয় সাধন করে। মনছবি দেখতে শুরু করার সাথে সাথে ডান বলয় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং দুই বলয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যহীনতা থাকে তা-ও দূর হয়ে যায়।

আরেক দলের অভিমত হলো—আবেগ, চিত্রকল্প ও অনুভূতির মধ্যে রয়েছে এক গভীর সংযোগ। যে-কোনো আবেগের দৈহিক প্রকাশ ঘটতে পারে। আমরা জানি, ব্রেনের ভাষা হচ্ছে ছবি। তাই ছবি বা চিত্রকল্প দিয়ে ব্রেন যত সহজে প্রভাবিত হয়, অন্য কোনোকিছু দিয়ে ততটা হয় না, কারণ আমাদের নার্ভাস সিস্টেম বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। যেমন : আমরা ঠিক জানি, সিনেমায় যা দেখানো হচ্ছে তা নিছক অভিনয়, এর আনন্দ সুখ দুঃখ বেদনা—কিছুই সত্যি নয়। তবুও সিনেমা দেখার সময় নায়ক-নায়িকার দুঃখে আমরা বিমর্ষ ও ভারাক্রান্ত হই, কাঁদি। কিংবা ভয়ের কোনো দৃশ্য দেখলে আমরা বেশ শিহরিত হই।

অর্থাৎ আমরা যা দেখছি তা তো বটেই, যা কল্পনা করছি বা ভাবছি, এমনকি আশঙ্কা করছি তার সবই ব্রেন বাস্তব বলে ধরে নেয়। এ কারণেই অসচেতনভাবে অমূলক ভয়ভীতি আর নেতিবাচক কিছু কল্পনা বা আশঙ্কা না করে সবসময় আমাদের উচিত সচেতনভাবে আনন্দময়, আশাপ্রদ ও সুস্থ জীবনের কথা চিন্তা করা। এই আশাবাদী মনোভাব আর বিশ্বাসই নিরাময়ের ক্ষেত্রে সবসময় মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের মেনিঙ্গার ফাউন্ডেশনের চিকিৎসক ডা. এলমার এবং এলিস গ্রিন ক্যান্সারজয়ী ৪০০ মানুষের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখেছেন—অসুস্থ হওয়ার পর এদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে সুস্থতার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। অতএব যখন ক্যান্সার-আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তখন আপনিও রোগমুক্তির ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী হোন। মনে রাখবেন, ওষুধের চেয়ে আপনার চেতনা অনেক বেশি শক্তিশালী ও সর্বত্রগামী।

আশাবাদী মনোভাব আর বিশ্বাসই নিরাময়ের ক্ষেত্রে সবসময় মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

আমরা যখন শরীরের কোনো একটি অঙ্গের সুস্থতার মনছবি দেখি, তখন মূলত কী হয়? দিনের পর দিন আমাদের উদাসীনতা আর অমনোযোগিতার ফলে দেহের যে অঙ্গটি অসুস্থ হয়েছিল, মনছবি দেখার মাধ্যমে আমরা তার প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগটুকু দেই। সে অঙ্গের প্রতি গভীর মমতা পোষণ করি। আসলে এই মমতা বা ভালবাসার শক্তিকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিমাপ করা কঠিন। তবুও বিজ্ঞানীরা শরীর ও শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মমতার প্রভাবকে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন।

মেনিঙ্গার ফাউন্ডেশনের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের মন মমতায় পরিপূর্ণ, তাদের রক্তে ক্ষতিকর ল্যাকটেটের পরিমাণ অনেক কম এবং তারা ক্লান্তি অনুভব করেন কম। তাদের রক্তে এন্ডোরফিনের (আনন্দের বার্তাবাহক রাসায়নিক অণু) পরিমাণ থাকে তুলনামূলক বেশি। ফলে তারা সবসময় আনন্দ ও সুখানুভূতির মধ্যে থাকেন। দুঃখ অনুভব করেন কম। তাদের শ্বেতকণিকা জীবাণুর বিরুদ্ধে দ্রুত সাড়া দেয়। খুব কমই তারা ফ্লু-জাতীয় অসুস্থতায় ভোগেন। অর্থাৎ যারা নিজের ভেতর সুস্থতার তীব্র আকুতি পোষণ করেন, সুস্থ হতে চান, নিরাময়ের মনছবি দেখেন এবং কল্পনা করেন যে, তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন—দেখা যায় তারা সত্যিই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

করোনারি হৃদরোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কীভাবে মনছবি দেখবেন?

অবলোকন করুন, মনের বাড়ির নিরাময় কক্ষে প্রবেশ করেছেন আপনি। আপনার প্রিয় ডাক্তার সেখানে বসে আছেন। আপনি যাওয়ার পর কুশল জানতে চেয়ে ডাক্তার আপনাকে বিছানায় শুয়ে পড়তে বললেন। এরপর তিনি আপনার ঊরুর রক্তনালীতে বিশেষ একটি ইনজেকশন দিলেন।

ইনজেকশন থেকে নিঃসৃত আলোর কণা ফোটন অসংখ্য ছোট-বড় রক্তনালী বেয়ে পৌঁছে গেল আপনার হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীতে। তারপর সেখানে জমে থাকা চর্বির স্তরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে পাঠিয়ে দিচ্ছে কিডনিতে, আর কিডনি তা বর্জ্য হিসেবে মূত্রের সাথে বের করে দিচ্ছে।

এবার অবলোকন করুন, আপনার করোনারি ধমনীতে চমৎকারভাবে রক্ত চলাচল করছে এবং এখন তাতে আর কোনো ব্লকেজ নেই। আপনার হৃৎপিণ্ড আগের মতোই সুস্থ সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আপনি ফিরে পেয়েছেন আপনার স্বাভাবিক জীবন আর তারুণ্যদীপ্ত কর্মচাঞ্চল্য।

করোনারি হৃদরোগে ভুগছেন যারা, তারা দিনে দুবার এ পদ্ধতিতে নিরাময়ের মনছবি দেখুন। মেডিটেটিভ লেভেলে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সবগুলো অনুভূতিকেই কাজে লাগিয়ে সুস্থতার আনন্দ অনুভব করুন। দেহ-মনে এ আনন্দ-অনুরণন ছড়িয়ে দিন। স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায়ও যখনই সময় পাচ্ছেন, সচেতনভাবে বার বার সুস্থ ধমনী ও সুস্থ হৃৎপিণ্ডের দৃশ্যকল্প অবলোকন করুন। নিরাময়ের জন্যে এটি অত্যন্ত কার্যকরী।

ডা. ডিন অরনিশ তার *প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ* বইয়ে মনের এ শক্তি সম্বন্ধে লিখেছেন—'হৃদরোগীরা কল্পনায় সবসময় দেখেন ব্লকেজযুক্ত করোনারি ধমনী। কিন্তু তারা যদি নিয়মিত সচেতনভাবে সুস্থ ও কোলেস্টেরল-প্লাকমুক্ত ধমনী অবলোকন করেন, তখন সত্যিই একসময় ধমনীর জমাটবদ্ধ কোলেস্টেরল ধীরে ধীরে নিঃসৃত হতে শুরু করে।'

তাই ক্রমাগত দুশ্চিন্তায় রোগ সৃষ্টি না করে সচেতনভাবে ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠুন। মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায়, Where mind goes, energy flows.

মেডিটেশন ॥ হৃদরোগ নিরাময়

১. নিয়মমাফিক মনের বাড়ির দরবার কক্ষে যান। তারপর ৩ থেকে ০ গণনা করে পৌঁছে যান নিরাময় কক্ষে।

আপনি পৌঁছে গেছেন নিরাময় কক্ষে। অবলোকন করুন নিরাময় কক্ষে ঢুকতেই আপনার প্রিয় ডাক্তার হাসিমুখে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। আপনিও হেসে তার সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করুন।

২. এবার আপনি তার সামনে চেয়ারে আরাম করে বসুন। আপনার সব সমস্যা, হৃদরোগের বিস্তারিত ইতিহাস খুলে বলুন তাকে। এক এক করে সবকিছু বলুন। সময় নিয়ে বলুন ....। আপনার ডাক্তার গভীর মনোযোগ দিয়ে আপনার সমস্যা ও অসুবিধার কথা শুনছেন ....

৩. ডাক্তার আপনাকে শুয়ে পড়তে বলছেন। আপনি শুয়ে পড়েছেন। অবলোকন করুন, আপনার সামনে মনিটর। ডাক্তার আপনার চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখুন, তার মুখে পরমাত্মীয়ের স্মিত হাসি। হাসি দিয়ে তিনি আপনাকে অভয় দিচ্ছেন।

৪. অবলোকন করুন, গভীর মমতায় তিনি আপনার ডান ঊরুসন্ধির রক্তনালীতে একটি বিশেষ ইনজেকশন পুশ করছেন। সামনের মনিটরে দেখছেন আপনার হৃৎপিণ্ডের ধমনীর কার্যকারিতা ও ব্লকেজের পরিমাণ ....। আপনার ডাক্তার খুব খুশি। আপনার হার্টের অবস্থা যা ভাবা হয়েছিল, হার্ট তার চেয়েও অনেক ভালো অবস্থায় আছে। তিনি অনুভব করছেন, পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আপনি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।

৫. তিনি এবার অপ্রয়োজনীয় চর্বিনাশক ফোটন ইনজেকশন দিচ্ছেন আপনার ঊরুসন্ধির ধমনীতে ...... অবলোকন করুন, ইনজেকশনের সাথে উজ্জ্বল সোনালি আলোর কণা স্রোতের মতো এগিয়ে যাচ্ছে রক্তনালী বেয়ে ..... হৃৎপিণ্ডের যে রক্তনালীর দেয়ালে ব্লকেজ বা চর্বি আছে, সোনালি আলোর কণা আস্তে আস্তে তাতে আঘাত করছে ......। ধীরে ধীরে জমাটবাঁধা চর্বি ছোট ছোট টুকরো হয়ে রক্তের প্রবাহে পড়ছে, চর্বির টুকরোগুলোকে ধরে ফেলছে শ্বেতকণিকা, কিডনিতে নিয়ে পেশাবের সাথে বের করে দিচ্ছে .....।

৬. অবলোকন করুন, আপনার হার্টে যে কয়টি ব্লকেজ আছে সবগুলোই এভাবে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ....। অনুভব করুন ব্লকেজ খুলে

যাচ্ছে .... আর হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে রক্ত চলাচল বেড়ে যাওয়ায় আপনার হার্ট ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে .... । অবলোকন করুন, হার্টের ধমনীর দেয়ালে জমে থাকা সব অপ্রয়োজনীয় পদার্থ পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে। হার্টের প্রত্যেকটি ধমনীতে এখন স্বচ্ছন্দ গতিতে রক্ত চলাচল করছে .... সবকিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনি।

৭. নিজের সুস্থ স্বাভাবিক হার্ট দেখে আনন্দিত হয়ে উঠছেন আপনি। অনুভব করুন, আপনার সাথে সাথে আপনার হার্টও যেন একইভাবে আনন্দিত হয়ে উঠেছে। মনিটরে আপনার হার্টকে দেখে মনে হচ্ছে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা হাস্যোজ্জ্বল একটি শিশুর মুখ।

৮. আপনি উঠে বসেছেন। আগের চেয়ে সতেজ, প্রফুল্ল ও ঝরঝরে অনুভব করছেন। গভীরভাবে অনুভব করছেন সুস্থতার আনন্দ ও তৃপ্তি। পরম করুণাময়ের কাছে বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। শুকরিয়ায় নিজের অন্তরকে প্লাবিত করুন। ডাক্তার আপনার সুস্থতার জন্যে প্রার্থনা করছেন।

৯. এবার নিরাময় কক্ষের ডান কোনায় রাখা বাথটাবের সামনে এসে দাঁড়ান। স্নানের পোশাক পরে বাথটাবে গা এলিয়ে দিন। পানিতে অনুভব করুন আপনার প্রিয় সুগন্ধি মিশ্রিত রয়েছে। গন্ধকে পুরোপুরি উপলব্ধি করুন। অনুভব করুন পানির পরশে চমৎকার এক আমেজ সৃষ্টি হয়েছে আপনার শরীরে। অনুভব করুন আপনার ভেতরে জমে থাকা অসুস্থতার সকল অনুভূতি পানির স্রোতের সাথে ধুয়ে মুছে চলে যাচ্ছে ....। অনুভব করুন আপনার সারা শরীরে নিরাময়ের একটা স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে।

১০. এবার মনে মনে ৩ বার কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ করুন। অনুভব করুন আপনার নিরাময় সম্পন্ন হয়েছে। অবলোকন করুন, আপনি যেমন চান, তেমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছেন। এবার মনে মনে প্রত্যয়ন করুন, সুস্থ থাকার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের সহজাত। সুস্থতা স্বাভাবিক আর অসুস্থতা অস্বাভাবিক। আমি প্রাকৃতিক নিয়মেই সুস্থ হচ্ছি, প্রাণবন্ত হচ্ছি, সফল হচ্ছি, সুখী হচ্ছি।

১১. এবার ০ থেকে ৩ গণনা করে প্রথমে দরবার কক্ষে ও পরে ০ থেকে ৭ গণনা করে স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস ॥ হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে অপরিহার্য

মানুষ : মাংসাশী না তৃণভোজী প্রাণী? । ৭৯
মানুষের সঠিক খাদ্যাভ্যাস । ৮৪
খাদ্যের উপাদানসমূহ । ৮৫
রান্নার পদ্ধতিসমূহ । ৮৫
জীবন্ত খাবার বনাম মৃত খাবার । ৮৮
শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট । ৯০
আমিষ বা প্রোটিন । ৯৫
ফ্যাট বা চর্বি । ৯৭
তেল ॥ সত্যটা জানা জরুরি । ১০০
কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড । ১০৩
মেটাবলিক সিনড্রোম । ১০৭
ভিটামিন । ১০৯
ফাইটোকেমিক্যাল । ১১৪
মিনারেল । ১১৫
আঁশ বা ফাইবার । ১১৭
পানি । ১১৮
প্রাকৃতিক খাবারই শ্রেষ্ঠ খাবার । ১২০
(ঘন সবুজ পত্রযুক্ত শাকসবজি, পালং শাক, ব্রকোলি, বিটরুট, মটরশুঁটি, ক্যাপসিকাম, বীজ, তিসি, বাদাম, সয়াবিন, স্পিরুলিনা, মাশরুম, ডিম, কলা, টক দই, আদা, রসুন, মধু, কালোজিরা, লেবু পানি, মিষ্টি আলু, ডাব, খেজুর, গ্রিন টি, অ্যাপল সাইডার ভিনেগার)
ফাস্ট ফুড ও কোমল পানীয় । ১৪৪
সুস্বাস্থ্যের জন্যে দেহে বজায় রাখুন ক্ষারীয় অবস্থা । ১৪৯
ভালোভাবে চিবিয়ে খান । ১৫০
ভূঁড়ি থেকে মুড়ি, সর্বরোগের গুড়ি । ১৫২
মেডিটারেনিয়ান ডায়েট । ১৫৫
মাছে-ভাতে বাঙালি । ১৫৬
হৃদরোগ নিরাময়ে বিশেষ খাদ্যাভ্যাস (রিভার্সাল ডায়েট) । ১৫৮
হৃদরোগ প্রতিরোধে কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস (প্রিভেনশন ডায়েট) । ১৬৪

বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস
হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে অপরিহার্য

আশ্চর্য শোনালেও সত্যি, বর্তমানে সারা বিশ্বে মোট মৃত্যুর ৬৩ শতাংশ ঘটছে অসংক্রামক রোগে। আর বাংলাদেশেও ২০১৬ সালে ৬৭ শতাংশ মৃত্যুর কারণ ছিল অসংক্রামক রোগ। যেমন : হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার ইত্যাদি। এসব রোগের অন্যতম প্রধান কারণ অবৈজ্ঞানিক ও ভুল খাদ্যাভ্যাস।

মানুষ : মাংসাশী না তৃণভোজী প্রাণী?

এনথ্রোপলজিস্ট বা নৃ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন প্রধানত তৃণভোজী। প্রাণিজ আমিষ অর্থাৎ মাছ মাংস ডিম দুধ খেতে পেলেও তা ছিল অনেক কম। এর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে তারা বলেছেন, মানুষের দাঁতের গঠন মূলত শাকসবজি, ফলমূল ও শস্যদানা খাওয়ার উপযোগী। এ-ছাড়াও মানুষের পরিপাকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র এতটাই দীর্ঘ যে, সেটি আঁশযুক্ত ও উদ্ভিজ্জ খাবারের ধীরে ধীরে হজমপ্রক্রিয়াকে সমর্থন করে।

গত শতাব্দীর শুরুতেও আমেরিকানরা ছিল অনেকটাই ভেজিটেরিয়ান বা তৃণভোজী। তাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার দুই-তৃতীয়াংশ আমিষই ছিল উদ্ভিদজাত। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, পোলট্রি শিল্পের বিকাশ এবং রেফ্রিজারেটরের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে ধীরে ধীরে তাদের প্রাণিজ আমিষ খাবারের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে আমেরিকানদের খাদ্যতালিকার দুই-তৃতীয়াংশ আমিষ আসে প্রাণিজ আমিষ অর্থাৎ মাছ মাংস ডিম দুধ থেকে। ফলাফল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ১৯০০ সালের দিকেও যে-সব রোগে আক্রান্তের হার ছিল খুবই কম, সেই রোগগুলোই এখন আমেরিকানদের ঘরে ঘরে। যেমন : হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, স্থূলতা, ক্যান্সার ইত্যাদি।

মাংসাশী প্রাণীর দাঁত

সিংহ

বাঘ

কুকুর

হায়েনা

তৃণভোজী প্রাণীর দাঁত

গরু

ছাগল

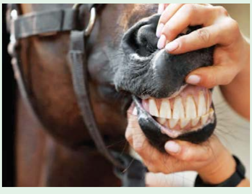

ঘোড়া

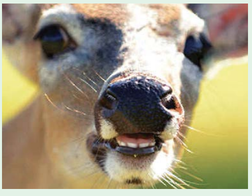

হরিণ

মানুষের দাঁত

মানুষের অধিকাংশ দাঁত তৃণভোজী প্রাণীর দাঁতের মতো বলে তা মূলত শাকসবজি, ফলমূল ও শস্যদানা খাওয়ার উপযোগী। আর কয়েকটি দাঁত মাংসাশী প্রাণীর দাঁতের মতো বলে মাছ-মাংস খেতে হবে পরিমিত।

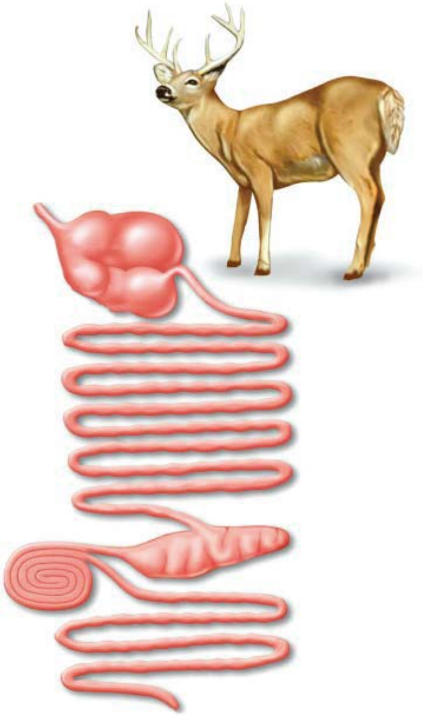

তৃণভোজী প্রাণীর দীর্ঘ পরিপাকনালী
বিশিষ্ট পরিপাকতন্ত্র

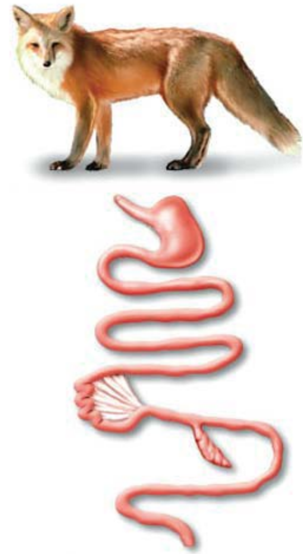

তুলনামূলক স্বল্প দৈর্ঘ্যের পরিপাকনালী
বিশিষ্ট মাংসাশী প্রাণীর পরিপাকতন্ত্র

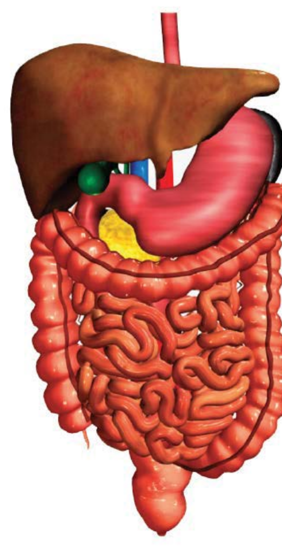

মানুষের পরিপাকতন্ত্র
এতটাই দীর্ঘ যে,
সেটি আঁশযুক্ত ও
উদ্ভিজ্জ খাবারের ধীরে
ধীরে হজমপ্রক্রিয়াকে
সমর্থন করে।

বর্তমান বিশ্বের একজন প্রভাবশালী ডায়েট বিশেষজ্ঞ, যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটির নিউট্রিশনাল বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস ও *দ্য চায়না স্টাডি* গ্রন্থের লেখক ড. টি. কলিন ক্যাম্পবেল। দীর্ঘ তিন দশক ধরে নিবিড় গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা ও ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী এত উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, স্থূলতা ও ক্যান্সারের মূল কারণ মাত্রাতিরিক্ত প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব। বিশ্বের বিভিন্ন জনপদের কিছু ঘটনা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ড. ক্যাম্পবেলের এই অভিমতকেই সমর্থন করে।

১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সারায়েভো যুদ্ধ চলাকালীন সেখানে তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দেয়। ফলে ব্যাহত হয় মাছ মাংস ডিম দুধের স্বাভাবিক সরবরাহ এবং সেখানকার অধিবাসীরা দীর্ঘসময় এসব প্রাণিজ আমিষ খাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এ-ছাড়া যুদ্ধের কারণে রান্না করা খাবারও তেমন খেতে পায় নি। শুধু ফলফলাদি, সবজি-সালাদ, রুটি ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে ছিল তারা। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, যাদের উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস ছিল, তারা এই রোগগুলো থেকে নিরাময় লাভ করেছে।

পাকিস্তানের উত্তর সীমান্তে হিমালয়ের কোল ঘেঁষে রয়েছে একটি পাহাড়ি জনপদ, যা 'হুনজা ভ্যালি' নামে পরিচিত। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এই পাহাড়ি অঞ্চলটি আধুনিক সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি উপত্যকা। এখানকার অধিবাসীরা হুনজা নামে পরিচিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা দীর্ঘজীবনের অধিকারী।

সাধারণ পাকিস্তানিদের গড় আয়ু যেখানে ৬৭ বছর, সেখানে আধুনিক যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও উন্নত চিকিৎসাসেবা বঞ্চিত হুনজা জনগোষ্ঠীর গড় আয়ু ১০০ বছর। কেউ কেউ এমনকি ১২০ বছর পর্যন্ত বাঁচে! তারা নিজেদের উৎপাদিত খাবার খায় আর বরফগলা পানিতে গোসল করে এবং সেই পানিই পান করে। কোনো ধরনের প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার খায় না। সেই সুযোগই তাদের নেই।

হুনজাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য এপ্রিকট। মনে করা হচ্ছে, এপ্রিকটে রয়েছে ভিটামিন বি$_{১৭}$ (এমিগডালিন), যা তাদের ক্যান্সারমুক্ত রেখেছে। তাদের খাদ্যতালিকায় থাকে প্রচুর তাজা ফল, কাঁচা সালাদ, কাঁচা সবুজ পাতা এবং পূর্ণ শস্যদানা, বাদাম, বীজ ও বিন। আর মাংস থাকে খুবই কম।

তাদের দীর্ঘজীবনের নেপথ্যে আরো রয়েছে প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম আর বিশুদ্ধ বাতাসে দম নেয়ার সুযোগ। উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস তাদের কাছে অচেনা।

এ-ছাড়াও পৃথিবীতে পাঁচটি জনপদ আছে, যেখানকার অধিবাসীরা শতবর্ষ বাঁচে এবং তাদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস প্রায় অনুপস্থিত। এসব জনপদ একত্রে 'ব্লু জোন্স' (Blue Zones) নামে পরিচিত—জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপ, ইতালির সার্ডিনিয়া দ্বীপ, গ্রিসের ইকারিয়া দ্বীপ, কোস্টারিকার নিকোয়া পেনিনসুলা এবং ক্যালিফোর্নিয়ার লোমা লিন্ডা।

ক্যালিফোর্নিয়ার লোমা লিন্ডা ছাড়া বাকি চারটি জনপদের মানুষেরা প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত। তাদের খাদ্যতালিকায় চর্বির মাত্রা কম এবং আঁশের পরিমাণ থাকে বেশি। মাছ, ভাত বা রুটি, ডাল অল্প, শাকসবজি, সালাদ, ফল, মটরশুঁটি থাকে পর্যাপ্ত। ঘাম ঝরানো পরিশ্রমে ব্যস্ত থাকে তারা। জীবনযাত্রার এই ধরনই তাদের এসব রোগ থেকে দূরে রেখেছে এবং দীর্ঘায়ু করেছে। আর ক্যালিফোর্নিয়ার লোমা লিন্ডার অধিবাসীরা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী একটি বিশেষ গোষ্ঠী। ধর্মীয় কারণেই তারা প্রধানত ভেজিটেরিয়ান বা নিরামিষাশী। প্রাণিজ আমিষ তারা এমনিতেই খায় না।

ওপরের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বর্তমানে এত উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, ক্যান্সারের পেছনে প্রধান কারণ অতিরিক্ত প্রাণিজ আমিষ ও মানুষের তৈরি খাবার (Man made food)। খাদ্যশিল্পের ব্যাপক প্রসারের ফলে বিশ্বব্যাপী প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের প্রচলন বাড়ছে।

খাদ্য যখন প্রক্রিয়াজাত করা হয়, তখন খাবারের প্রাকৃতিক অবস্থা (ন্যাচারাল স্টেট) বদলে যায়। আবার ওভার কুকিং ও রিফাইনিংয়ের ফলেও খাবারের প্রাকৃতিক অবস্থা বদলে যায়। দীর্ঘদিন এই জাতীয় খাবার গ্রহণের ফলে শরীরে বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে একগুচ্ছ রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়, যা DLS (Dioxin Like Substance) নামে পরিচিত।

দীর্ঘদিন ধরে এই DLS জমা হতে হতে একপর্যায়ে তা Advance Glycosylation End Product (AGE) নামের এক ধরনের ছাই বা বর্জ্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এই AGE নামের বর্জ্য শরীরে নাইট্রিক অক্সাইড

(NO) তৈরির ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে। উল্লেখ্য, নাইট্রিক অক্সাইড আমাদের শরীরের জন্যে অত্যন্ত দরকারি। এটি 'মিরাকল মলিক্যুল' নামে পরিচিত। এই নাইট্রিক অক্সাইড ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, কিডনি রোগ ও ক্যান্সার প্রতিরোধে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

অন্যদিকে প্রক্রিয়াজাত খাবারের সাথে থাকা চিনি ও সাদা ময়দা খাওয়ার ফলে বাড়ছে স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিস। আবার কোলেস্টেরল ও স্যাচুরেটেড ফ্যাটসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের ফলে দেখা দিচ্ছে করোনারি হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ও ডায়াবেটিস।

মানুষের সঠিক খাদ্যাভ্যাস

মানুষ সৃষ্টির সেরা—আশরাফুল মাখলুকাত। তার রয়েছে স্বাধীনতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা। চিন্তার স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতাসহ পছন্দমতো খাদ্য গ্রহণেরও স্বাধীনতা।

মানুষ ছাড়া প্রতিটি স্থলচর, জলচর, উভচর ও বায়ুচর প্রাণীর জন্যে রয়েছে নির্দিষ্ট খাদ্যসম্ভার। তারা সেই সীমারেখা কখনোই লঙ্ঘন করে না। বলা যায়, প্রতিটি প্রাণীই তার জন্যে নির্ধারিত খাবারেই সন্তুষ্ট এবং তা থেকেই সে লাভ করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং শক্তি। বছরের ৩৬৫ দিনই চতুষ্পদ প্রাণীর মাংস খেয়েও বাঘ বা সিংহের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। আবার প্রতিদিন সামান্য ঘাস, খড় বা ভুসি থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাচ্ছে বিশালকায় গরু।

এখন প্রশ্ন হলো, মানুষের খাবারের সীমারেখা কী? যেহেতু স্রষ্টা মানুষকে সহজাত বুদ্ধি-বিবেক দিয়েছেন, দিয়েছেন হারাম-হালালের জ্ঞান, দিয়েছেন কল্যাণ-অকল্যাণের জ্ঞান; সেজন্যেই মানুষকে জানতে হবে—কোন খাবার তার জন্যে উপকারী, কোনটি ক্ষতিকর, কোনটি পুষ্টিকর আর কোন খাবার দেহকে রোগগ্রস্ত করে তুলবে?

আরো জানতে হবে—সে কী খাবে, কী খাবে না; কতটুকু খাবে, কখন খাবে এবং কেন খাবে। খাবার স্রষ্টার দেয়া অমূল্য নেয়ামত। কিন্তু এই নেয়ামতের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই খাদ্য সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রাথমিক জ্ঞানটুকু থাকতে হবে।

খাদ্যের উপাদানসমূহ

সব ধরনের খাবারকে বিশ্লেষণ করলে ৮টি উপাদান পাওয়া যায় :

১.	শর্করা (কার্বোহাইড্রেট)	৫.	মিনারেল
২.	আমিষ (প্রোটিন)	৬.	ফাইটোকেমিক্যাল
৩.	চর্বি (ফ্যাট)	৭.	আঁশ (ফাইবার)
৪.	ভিটামিন	৮.	পানি

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্যে একজন মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এই ৮টি উপাদান থাকা অত্যাবশ্যক। আর এজন্যে প্রয়োজন সুষম খাবার এবং তা হতে হবে সঠিক পরিমাণে। অধিকাংশ মানুষ পারিবারিক খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে সেটাই শ্রেষ্ঠ খাবার মনে করে খেতে থাকে। কিন্তু পুষ্টিবিজ্ঞানসম্মত সুষম খাবারই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ খাবার।

উপরোক্ত ৮টি উপাদান যথাযথভাবে পেতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম জানতে হবে রান্নার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে। প্রতিটি প্রাণী তার খাবার গ্রহণ করে থাকে প্রাকৃতিক অবস্থায়। অর্থাৎ যে খাবার প্রকৃতিতে যে রূপে উৎপাদিত হয় বা পাওয়া যায়, সেভাবেই। মানুষ এ-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

মানুষই একমাত্র সৃষ্টি, যে তার খাবার গ্রহণের পূর্বে কোনো কোনো খাবারের প্রাকৃতিক অবস্থা বদলে ফেলে। এই বদল কখনো আংশিক, কখনো পুরোপুরি। ফলে সেই খাবারের সবগুলো উপাদান থেকে আমরা আংশিক বা কখনো কখনো সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হই। ফলশ্রুতিতে আমাদের মধ্যে সে-সব উপাদানের স্বল্পতা বা অভাব দেখা দেয়। দিনের পর দিন এটা ঘটতে থাকলে অনিবার্যভাবেই শরীরে সৃষ্টি হয় নানা জটিলতা ও রোগব্যাধি।

খাবারের প্রাকৃতিক অবস্থা বদলের ঘটনাটি ঘটে মূলত খাবার রান্না করার সময়। তাই রান্নার পদ্ধতিসমূহ জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রান্নার পদ্ধতিসমূহ (Cooking Methods)

সেদ্ধ (Boiling)

সাধারণত ভাত মাছ মাংস ডিম ডাল সবজি ইত্যাদি সেদ্ধ করে রান্না করা হয়। এ-ক্ষেত্রে পানির তাপমাত্রা থাকে ১০০° সেন্টিগ্রেড। সেদ্ধ করার ফলে

এসব খাবার সহজে খাওয়া যায় এবং সহজে হজমও হয়। তবে সবজি রান্নার ক্ষেত্রে অধিক সময় সেদ্ধ করলে অনেক ভিটামিন, মিনারেল, এনজাইম, ফাইটোকেমিক্যাল ও আঁশ তাদের গুণাগুণ ও কার্যকারিতা হারায়। তাই সবজি অর্ধসেদ্ধ করে খাওয়া সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর।

ভাপে সেদ্ধ (Steaming)

এ-ক্ষেত্রে ফুটন্ত পানির বাষ্প দিয়ে বা ভাপে রান্না করা হয়। কোনো কোনো সবজি এ পদ্ধতিতে রান্না করা যায়। যেমন : ব্রকোলি। এই পদ্ধতিতে রান্না করলে খাবারের ভিটামিন মিনারেল ফাইটোকেমিক্যাল ও আঁশ নষ্ট হয় না। এ-ছাড়া খাবারের স্বাদ, রং ও গন্ধ অক্ষুণ্ন থাকে।

প্রেসার কুকারে রান্না (Pressure Cooking)

সাধারণত ভাত ডাল আলু মাংস এই পদ্ধতিতে রান্না হয়ে থাকে। এ-ক্ষেত্রে তাপমাত্রা থাকে ১০০°-১২১° সেন্টিগ্রেড। এতে অল্প সময়ে রান্না করা সম্ভব হয়। কোনো জীবাণু থাকলে তা ধ্বংস হয়ে যায়। তবে এই পদ্ধতিতে রান্নার ফলে কিছু ভিটামিন, মিনারেল, ফাইটোকেমিক্যাল ও আঁশ নষ্ট হয়ে যায়।

গ্রিল করে রান্না (Grilling)

এই পদ্ধতিতে সাধারণত মুরগি, ভুট্টা, মাছ ইত্যাদি রান্না করা যায়। এ-ছাড়া এভাবে বেগুন ও টমেটো পুড়িয়ে ভর্তা করে খাওয়া যায়। এ-ক্ষেত্রে সরাসরি আগুনে ধরে রান্না করা হয়। এতে খাবারের স্বাদ বাড়ে, দারুণ গন্ধ ছড়ায়। এই পদ্ধতিতে তেল ছাড়াও রান্না করা সম্ভব।

তেলে ভাজা (Frying)

এটি সাধারণত দুধরনের :

- ☐ হালকা তেলে ভাজা : পরোটা অমলেট কাটলেট পপকর্ন ইত্যাদি।
- ☐ ডুবো তেলে ভাজা : সিঙ্গাড়া সমুচা লুচি পুরি চিপস পাকোড়া চিকেন ফ্রাই ইত্যাদি।

এই পদ্ধতিতে রান্না অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ও সুস্বাদু হয়। কিন্তু ভোজ্যতেল পুড়ে তৈরি হয় ট্রান্স ফ্যাট—যা হৃদরোগ, হার্ট অ্যাটাক, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। শরীরে চর্বি জমে। ওজন বাড়ে। এ-ছাড়া এতে খাবারের পুষ্টিগুণও চলে যায়।

টোস্টিং (Toasting)

সাধারণত এই পদ্ধতিতে স্যান্ডউইচ ও পাউরুটির টোস্ট তৈরি করা হয়।

বেকিং (Baking)

এই পদ্ধতিতে ওভেন বা এই জাতীয় সামগ্রী ব্যবহার করে রান্না করা হয়। এ-ক্ষেত্রে তাপমাত্রা থাকে ১২০°-১৩০° সেন্টিগ্রেড। এই পদ্ধতিতে পিৎজা পাউরুটি বিস্কুট কেক ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এতে ভিটামিন, মিনারেল, ফাইটোকেমিক্যাল, আঁশ নষ্ট হয়ে যায়।

মাইক্রোওয়েভে রান্না (Microwave Cooking)

এটি রান্নার সম্পূর্ণ নতুন এক পদ্ধতি। এ-ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তৈরি হয়, যার ওয়েভলেংথ ২৫০ × ১০৬ × ১০৯ অ্যাঙ্গস্ট্রম। এই পদ্ধতিতে রান্না সম্পন্ন হয় মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশনে। তবে এই পদ্ধতিতে রান্নার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন—এতে ক্যান্সারের ঝুঁকি তৈরি হয়।

অতএব রান্নার সকল পদ্ধতি বিবেচনায় এনে আমাদের এমনভাবে খাবার তৈরি করতে হবে যেন রান্নার পরেও খাবারের পুষ্টিমান অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের লক্ষ্য থাকবে যে-সব খাবার কাঁচা খাওয়া যায়, সেগুলো কাঁচা খাওয়া। আর যেগুলো রান্না ছাড়া খাওয়া সম্ভব নয় সেগুলো পরিপূর্ণ সেদ্ধ করা। তবে শাকসবজি অর্ধসেদ্ধ এবং অল্প আঁচে রান্না করে খাওয়া উচিত।

- ☐ কাঁচা খাওয়া সম্ভব এমন খাবারগুলো হলো : ফল, সালাদ, সবুজ পাতা (ধনে লেটুস পুদিনা), মটরশুঁটি, ছোলা, বিভিন্ন প্রকার বীজ (সূর্যমুখী তিল তিসি চিয়া তরমুজ মিষ্টিকুমড়া), বাদাম।
- ☐ পরিপূর্ণ সেদ্ধ করে খেতে হবে : ভাত, আলু, মাছ, মাংস, ডাল।
- ☐ অর্ধসেদ্ধ করে খাওয়া উচিত : সব ধরনের শাকসবজি ইত্যাদি।

মৃত খাবার

জীবন্ত খাবার

জীবন্ত খাবার বনাম মৃত খাবার
Living food vs Dead food

একটি খাবার যে অবস্থায় উৎপন্ন হয়, যদি খাবারটি সেই অবস্থাতেই খাওয়া হয়, সেটাই জীবন্ত খাবার। ভালোভাবে হজম হওয়ার মতো পর্যাপ্ত এনজাইম বা পাচক রস জীবন্ত খাবারে থাকে।

সকল জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদ এনজাইম তৈরি করে। এনজাইম ছাড়া জীবন চলতে পারে না। কিন্তু কোনো খাবার যখন উচ্চ তাপে রান্না করা হয় অথবা প্রক্রিয়াজাত-প্যাকেটজাত করা হয় তখন সেই খাবারের এনজাইমগুলো নষ্ট হয়ে যায়, এনজাইমগুলো তাদের কার্যকারিতা হারায়। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে সেটাই তখন পরিণত হয় মৃত খাবারে।

যখন কেউ মৃত খাবার খান, তখন এই এনজাইমশূন্য খাবার শরীরে শক্তি ও পুষ্টি জোগানোর বদলে উল্টো শরীরের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করে। এই খাবারকে হজম করার জন্যে শরীরকে তখন প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈরি করতে হয়। শরীর-মন ক্লান্ত, অবসন্ন, উদ্যমহীন, অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ দিনের পর দিন অতিরিক্ত পরিমাণে এই মৃত খাবার গ্রহণ।

মৃত খাবার : অধিক তাপ ও দীর্ঘসময় নিয়ে রান্না করা সব ধরনের খাবার (সিঙ্গাড়া পুরি পেঁয়াজু বেগুনি চপ কাটলেট পরোটা বিরিয়ানি কাচ্চি), প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন : চিপস বিস্কুট ক্র্যাকার্স জুস কেক পেস্ট্রি এবং ফাস্ট ফুড, কোমল পানীয় ইত্যাদি। এগুলো যথাসম্ভব পরিহার

করার চেষ্টা করুন। এ-ছাড়াও অতিসেদ্ধ অর্থাৎ অনেক বেশি সময় নিয়ে রান্না করা শাকসবজিও মৃত খাবারের মধ্যেই পড়ে।

আবার মৃত খাবার হলেও মাছ মাংস ডিম দুধ চাল ডাল ইত্যাদি প্রয়োজনমতো সেদ্ধ করে রান্না করুন। তবে অতিরিক্ত সময় ধরে রান্না করে খাবেন না। কেননা এতে খাদ্যের পুষ্টিমান তো নষ্ট হয়ই, সেইসাথে খাবারটাও হয়ে ওঠে অস্বাস্থ্যকর।

জীবন্ত খাবারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ : সব ধরনের তাজা ফল, সালাদ, গ্রিন জুস, বাদাম, মটরশুঁটি, ছোলা, বিভিন্ন প্রকার বীজ ও বিন, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ ইত্যাদি।

পুষ্টিবিজ্ঞান এবং এনজাইম-বিষয়ক গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রের একজন নেতৃস্থানীয় গবেষক ড. হাওয়ার্ড এফ লুমিস জুনিয়র। Enzymes : The Key to Health বইতে তিনি বলেছেন, খাবারে ভিটামিন-মিনারেল কতটুকু আছে সে ব্যাপারে আমরা খুবই সতর্ক থাকি, কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো খাবারের এনজাইম, যা অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে আমরা সাধারণত খুব একটা সচেতন নই। ভিটামিন ও মিনারেলের অভাবে স্বল্পমেয়াদি কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় বটে, কিন্তু খাবারের এনজাইমের অভাবে শরীরে সৃষ্টি হয় নানাবিধ দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা।

সুস্বাস্থ্যের জন্যে সবার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান, যেমন : এনজাইম, অক্সিজেন, হরমোন, ফাইটোকেমিক্যাল, বায়ো-ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি এবং লাইফ ফোর্স বা প্রাণশক্তি। যখন খাবারকে উচ্চ তাপে রান্না করা হয়, তখন উপরোক্ত সব উপাদান ধ্বংস হয়ে যায়। এরপরও ভিটামিন, মিনারেল, ফাইটোকেমিক্যাল কিছুটা যদি থেকেও যায়, তবে তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থা অনেকটাই বদলে যায়।

এ-ছাড়া সুষম খাদ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ফাইবার বা আঁশ, যা রেচনের জন্যে জরুরি। পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকে শাকসবজিতে। কিন্তু অধিক তাপে রান্না করলে ফাইবার বা আঁশ তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আর এ কারণেই দেখা যায়, নিয়মিত শাকসবজি খাওয়ার পরও কারো কারো কোষ্ঠকাঠিন্য সারে না।

গবেষকেরা বলছেন, এ-কালে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলক দুর্বল এবং রোগবালাই—বিশেষত অসংক্রামক রোগের হার বেড়ে

গেছে পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। এর একটি বড় কারণ ভুল ও অবৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস। বর্তমান সময়ে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় জীবন্ত খাবারের চেয়ে মৃত খাবারের পরিমাণ অনেকাংশে বেশি। আর মৃত খাবার কখনো একজন মানুষকে সুস্থ রাখতে পারে না।

আবার এ-কালেও দেখা যাচ্ছে 'হুনজা উপত্যকা' ও 'ব্লু জোন্‌স' এলাকার অধিবাসীরা শতায়ু হচ্ছেন। এরও অন্যতম প্রধান কারণ তাদের সঠিক খাদ্যাভ্যাস। তাদের খাদ্যতালিকার বড় একটি অংশ জুড়ে রয়েছে তাজা ফল, টাটকা সালাদ ও সবজি, সবুজ লতাপাতা, বাদাম, বীজ ও বিন। অর্থাৎ জীবন্ত খাবার তাদেরকে দিয়েছে শত বছরের নীরোগ জীবন।

সুতরাং সুস্থ কর্মব্যস্ত রোগমুক্ত দীর্ঘজীবনের জন্যে আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় জীবন্ত খাবার রাখুন কমপক্ষে ৩০ শতাংশ। যেমন : প্রতিদিন ৩-৪ ধরনের ফল, ৩-৪ ধরনের কাঁচা সালাদ, ৩-৪ ধরনের কাঁচা সবুজ পাতা সহযোগে তৈরি গ্রিন জুস, মুঠোভর্তি বাদাম এবং পরিমাণমতো বীজ ও বিন।

সেইসাথে শাকসবজি অর্ধসেদ্ধ ও অল্প তাপে রান্না করে খাওয়ার অভ্যাস করুন। খাদ্যতালিকায় মৃত খাবারের পরিমাণ সীমিত রাখুন। প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার যথাসম্ভব বর্জন করুন। আপনার সুস্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘজীবনের সম্ভাবনা বাড়বে।

খাদ্যের ৮টি উপাদান নিয়ে এখানে খুব সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো

১. শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

কার্বোহাইড্রেট প্রধানত দুধরনের :

- **সিম্পল (রিফাইন্ড) কার্বোহাইড্রেট :** সাদা চাল, সাদা ময়দা, চিনি, গ্লুকোজ, মধু ইত্যাদি।
- **কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট :** পূর্ণ শস্যদানা বা হোল গ্রেইন (আবরণসহ চাল গম ভুট্টা যব ওটস), সব ধরনের ফল, সব ধরনের শাকসবজি, সালাদ ও সবুজ পাতা।

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার গ্রহণের পর হজমপ্রক্রিয়ার সর্বশেষ পর্যায়ে এটি গ্লুকোজ হিসেবে রক্তে প্রবেশ করে। অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন ইনসুলিন রক্তের এই গ্লুকোজকে ধরে ধরে প্রতিটি কোষে প্রবেশ করায় এবং দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করলে লিভার একে গ্লাইকোজেন হিসেবে লিভার ও পেশিতে জমা করতে থাকে। যখন লিভার ও পেশিতে আর গ্লাইকোজেন জমা হওয়ার জায়গা থাকে না, তখন লিভার এই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে ট্রাইগ্লিসারাইড বা বডি ফ্যাটে (চর্বি) রূপান্তরিত করে।

এই রূপান্তরিত চর্বি লিভার থেকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে জমা হতে থাকে। বিশেষ করে পেটের মধ্যকার বিভিন্ন অঙ্গে এবং এর চারপাশে। আর পুরো প্রক্রিয়ায় নেপথ্য ভূমিকা পালন করে নিঃসরিত অতিরিক্ত ইনসুলিন।

বছরের পর বছর এইভাবে অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণ হওয়ার ফলে একসময় তৈরি হয় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। আর টাইপ-২ ডায়াবেটিসের প্রধান কারণ এই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। একপর্যায়ে এই অতিরিক্ত চর্বি লিভারেও জমা হতে থাকে। লিভারের ৫% চর্বিতে ভরে গেলে তখন সূচনা হয় ফ্যাটি লিভার ডিজিজের, যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

এই অতিরিক্ত ইনসুলিন লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ নামক এনজাইমের নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়, যা রক্তের ফ্যাটগুলোকে ধরে ধরে কোষের মধ্যে প্রবেশ করায়। ফলে শরীরে জমতে থাকে অতিরিক্ত ফ্যাট, যা ওজন বাড়ায়।

শুধু তা-ই নয়, এই অতিরিক্ত ইনসুলিন লিভার থেকে এইচএমজি কো-এ রিডাকটেজ নামক আরেকটি এনজাইমের উৎপাদন বাড়ায়, ফলে লিভার বেশি বেশি কোলেস্টেরল তৈরি করে। তাহলে দেখা গেল, রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড এবং কোলেস্টেরল বৃদ্ধির নেপথ্যে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করে রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট (চিনি, সাদা চাল, সাদা ময়দা), বিশেষ করে চিনি।

আর তাই চিনির অপর নাম 'হোয়াইট পয়জন' বা সাদা বিষ।

চিনি

- চিনি এমন একটি রিফাইন্ড ফুড, যা নানাভাবে প্রতিটি পরিবারের দৈনন্দিন খাদ্যসম্ভারের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। চা, কফি,

শরবত, কোমল পানীয়, চকলেট, কেক, পুডিং, মিষ্টি, পায়েস, পিঠাসহ অজস্র খাবারে চিনি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

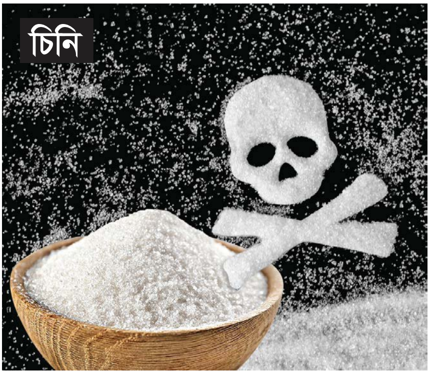

- ☐ এক চা চামচে চিনি থাকে ৪.২ গ্রাম, যা ১৬ ক্যালরি শক্তির জোগান দেয়। এতে রয়েছে শুধু গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ। নেই প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেল বা কোনো উপকারী উপাদান।
- ☐ আপনি জেনে বিস্মিত হবেন—স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার রক্তে যে পরিমাণ সুগার (গ্লুকোজ) প্রবাহিত অবস্থায় থাকে, এর পরিমাণ মাত্র এক চা চামচ।
- ☐ যদি আপনি চা/ কফি/ মিষ্টি/ কোমল পানীয়/ জুসের সাথে প্রতিদিন পাঁচ-ছয় চামচ করে চিনি খেতে থাকেন, তাহলে আপনি প্রতিদিন রক্তের মোট সুগারের চেয়ে পাঁচ-ছয় গুণ বেশি সুগার রক্তে পাঠাচ্ছেন। এর ফলাফল স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ক্ষতিকর।

দেহের ওপর চিনির ক্ষতিকর প্রভাব :

- ○ চিনি আসক্তি সৃষ্টি করে। চিনি ও চিনির তৈরি খাবার নিয়মিত খেলে মাদকের মতোই এক ধরনের আসক্তি তৈরি হয়। চিনি খেলে ব্রেন থেকে 'ডোপামিন' নিঃসরণ বাড়ে, যা আনন্দ অনুভূতির সৃষ্টি করে। ফলে বার বার চিনির তৈরি খাবার খেতে ইচ্ছে করে। চিনির প্রতি আকর্ষণ অনেকটা নিকোটিন ও কোকেনের মতোই আসক্তিকর।
- ○ ওজন বৃদ্ধি ও ফ্যাটি লিভার ডিজিজের অন্যতম কারণ চিনি।
- ○ ক্যান্সার কোষের প্রধান খাবার চিনি। তাই চিনিযুক্ত খাবার ক্যান্সার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।
- ○ চিনির কারণে অকালে দাঁত ক্ষয় হয়।
- ○ গ্রোথ হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে শরীরজুড়ে বার্ধক্যের চিহ্ন

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, চিনি ব্রেনের বয়স বাড়িয়ে দেয়। ফলে ব্রেন যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না।

- চিনি খেতে থাকলে শরীরে ক্রোমিয়ামের মাত্রা কমে যায়। ক্রোমিয়ামের অভাবে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও টাইপ-২ ডায়াবেটিস হতে পারে।
- নিয়মিত চিনি খাওয়া ইমিউন সিস্টেমের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- চিনি খেতে থাকলে আরো যে-সব রোগ হতে পারে : স্থূলতা, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ।

অন্যদিকে যখন পরিমিত পরিমাণে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট খাওয়া হয়, তখন তা পরিপাকের পর খুব ধীরে ধীরে গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করে। কেননা এতে রয়েছে প্রচুর আঁশ ও প্রোটিন বা আমিষ। ফলে রক্তের সুগার লেভেল সবসময় স্বাভাবিক থাকে, তাৎক্ষণিকভাবে বাড়ে না।

কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণ প্রতিরোধ করে। কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে রয়েছে ঢেঁকিছাঁটা চাল (লাল চাল/ ব্রাউন রাইস) এবং লাল আটা (গম ভুট্টা যব ওটস)।

লাল আটা ইদানীং পাওয়া গেলেও লাল চাল হয়ে উঠেছে ততটাই দুর্লভ। ঢেঁকির প্রচলন পুরোপুরিই উঠে গেছে, তার বদলে জায়গা করে নিয়েছে অটোমেটিক রাইস মিল। রাইস মিল থেকে যে চাল আসে তা বহুল ব্যবহৃত সাদা চাল। আর ঢেঁকিছাঁটা চাল হচ্ছে লাল চাল। এই লাল চাল ও সাদা চালের পার্থক্যটা আমাদের জানতে হবে।

লাল চাল

লাল আটা

লাল চাল অর্থাৎ পূর্ণ শস্যদানার (হোল গ্রেইন) থাকে তিনটি স্তর

- ☐ **বাইরের স্তর (Bran) :** এটিতে থাকে প্রচুর ভিটামিন বি, আয়রন, কপার, জিংক, ম্যাগনেসিয়াম, এন্টি-অক্সিডেন্ট, ফাইটোকেমিক্যাল, প্রোটিন ও ফাইবার বা আঁশ।
- ☐ **মাঝের স্তর (Endosperm) :** এই অংশে থাকে মূলতঃ কার্বোহাইড্রেট ও কিছু প্রোটিন। অতিসামান্য পরিমাণ ভিটামিন বি ও মিনারেল।
- ☐ **ভেতরের স্তর (Germ) :** এই অংশটি মূলত বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে থাকে ভিটামিন বি১, বি২, বি৫, ভিটামিন ই, উপকারী ফ্যাট, এন্টি-অক্সিডেন্ট এবং ফাইটোকেমিক্যাল।

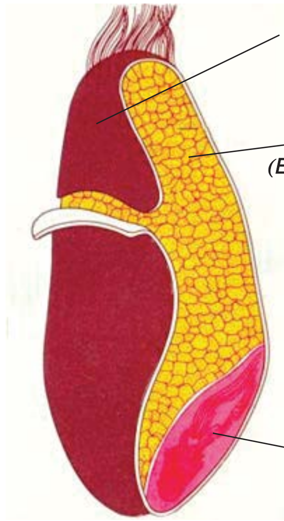

পূর্ণ শস্যদানা (হোল গ্রেইন)

যখন লাল চাল মেশিনে ছেঁটে সাদা করা হয়, তখন তা থেকে বাইরের স্তর (ব্র্যান) এবং ভেতরের স্তরের (জার্ম) বড় একটা অংশ ফেলে দেয়া হয়। ফলে পর্যাপ্ত পুষ্টি থেকে আমরা বঞ্চিত হই। কেউ যখন লাল চালের ভাত বা লাল আটার রুটি খাচ্ছেন, তখন তিনি প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, বি-ভিটামিন, আয়রন, জিংক, কপার, ম্যাগনেসিয়াম, আঁশ সবই পাচ্ছেন। কিন্তু শরীরে গ্লুকোজ প্রবেশ করছে কম। ফলে শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইড বা বডি ফ্যাট জমা হচ্ছে না, ওজন বাড়ছে না এবং পরিণতিতে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ বা টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যাচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের অন্যতম প্রধান কারণ সাদা চালের ভাত এবং সাদা ময়দার রুটিসহ অন্যান্য খাবার, যেমন : বার্গার পেটিস স্যান্ডউইচ পরোটা লুচি নুডল্‌স পাস্তা ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন। আর তাই স্থূলতা নির্মূলসহ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্যে সাদা চাল ও সাদা ময়দার পরিবর্তে লাল চাল ও লাল আটা খাওয়ার অভ্যাস করুন।

২. আমিষ বা প্রোটিন

আমিষ বা প্রোটিন দুধরনের :

- ☐ প্রথম শ্রেণির প্রোটিন : মাছ মাংস ডিম দুধ স্পিরুলিনা সয়াদুধ।
- ☐ দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন : সব ধরনের ডাল, বাদাম, শিম, মটরশুঁটি, বীজ, বিন, লাল চাল, লাল আটা।

প্রতিদিন যে-সব আমিষ জাতীয় খাবার আমরা খাই, তা হজম প্রক্রিয়ার নানা পর্যায় শেষে এমাইনো এসিড হিসেবে রক্তে প্রবেশ করে। এই এমাইনো এসিড শরীরের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণসহ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যবহৃত হয়।

মানবদেহে ২২ ধরনের এমাইনো এসিড রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি হলো এসেনশিয়াল এমাইনো এসিড (Essential amino acid) এবং ১৩টি হলো নন-এসেনশিয়াল এমাইনো এসিড (Non-essential amino acid)। এদেরকে নন-এসেনশিয়াল বলা হচ্ছে, কারণ এই ১৩টির মধ্যে কোনোটির অভাব হলে লিভার তা নিজেই তৈরি করে নিতে পারে। কিন্তু ৯টি এসেনশিয়াল এমাইনো এসিডের মধ্যে কোনোটির অভাব হলে আমাদের লিভার তা তৈরি করতে পারে না।

এসেনশিয়াল এমাইনো এসিডগুলো মূলত পাওয়া যায় মাছ মাংস ডিম দুধ অর্থাৎ সকল প্রাণিজ আমিষে। আর এ কারণে গত শতাব্দী থেকে বিজ্ঞানীরা বলে আসছেন—সুস্থ থাকার জন্যে প্রতিদিন মাছ মাংস ডিম বা দুধ খেতে হবে। তা না হলে বাচ্চাদের বৃদ্ধিসাধন হবে না এবং বড়দের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়বে।

কিন্তু এখন আর কথাটি অবধারিত সত্য নয়। কারণ যারা ভেগান অর্থাৎ মাছ মাংস ডিম দুধ কিছুই খান না তাদের যাবতীয় শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, তারা সবদিক থেকেই যথেষ্ট কর্মক্ষম এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও চমৎকার।

এখন প্রশ্ন হলো, মাছ মাংস ডিম দুধ না খাওয়ার পরও তারা কী করে সুস্থ আছেন? গবেষণায় দেখা গেছে, এককভাবে ভাত, রুটি, মটরশুঁটি বা ডালে ৯টি এসেনশিয়াল এমাইনো এসিড না থাকলেও যদি কেউ লাল চালের ভাত বা লাল আটার রুটির সাথে ডাল ও মটরশুঁটি জাতীয় বিন খান, তবে তার ৯টি এসেনশিয়াল এমাইনো এসিডের চাহিদা সহজেই পূরণ হয়ে যায়।

ভেগান মানেই তাই নিরামিষভোজী নন। তিনিও আমিষ খাচ্ছেন, তবে এর পুরোটাই আসছে উদ্ভিজ্জ আমিষ থেকে। তবে সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে, সয়াদুধ ও সামুদ্রিক শৈবাল স্পিরুলিনাতেও ৯টি এসেনশিয়াল এমাইনো এসিড থাকে।

তাই মাছ মাংস ডিম দুধ না খেয়েও একজন ভেগান চমৎকার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন এবং তার হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক কিংবা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। আবার এসব রোগ নিরাময়ে ভেগান ডায়েট দারুণ কার্যকরী।

তবে ভেগান ডায়েট অনুসরণ করলে অবশ্যই ভিটামিন বি$_{১২}$ ভিটামিন ডি ও মাল্টি ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট খেতে হবে।

দ্য চায়না স্টাডি গ্রন্থের লেখক ড. টি. কলিন ক্যাম্পবেলের দীর্ঘ গবেষণায় উঠে এসেছে যে, বিশ্বব্যাপী এত উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক ও ক্যান্সারের প্রধান কারণ মাত্রাতিরিক্ত প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ। এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ গবেষণার উল্লেখ করেছেন তিনি। গবেষণাটি প্রথম পরিচালনা করেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। জার্নালে প্রকাশিত হওয়ার পর ড. টি. কলিন ক্যাম্পবেল কর্নেল ইউনিভার্সিটির গবেষণাগারে একাধিকবার পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করেন এবং প্রতিবার একই ফল পান।

আফলাটক্সিন (Aflatoxin) একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান (Carcinogenic agent), যা লিভার ক্যান্সারের জন্যে দায়ী। বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের দুটো দলের ওপর গবেষণাটি পরিচালনা করেন। সবগুলো ইঁদুরের দেহে সমপরিমাণ আফলাটক্সিন প্রয়োগ করা হলো। এরপর এদের একদলকে প্রতিদিন ৫%-এর কম প্রাণিজ আমিষ খাওয়ানো হলো। দ্বিতীয় দলকে প্রতিদিন খাওয়ানো হলো ২০%-এর বেশি প্রাণিজ আমিষ।

নির্দিষ্ট সময় পর দেখা গেল, যে-সব ইঁদুরকে ৫%-এর কম প্রাণিজ আমিষ দেয়া হয়েছিল, তাদের কোনোটিরই ক্যান্সার হয় নি। কিন্তু যেগুলোকে ২০%-এর বেশি আমিষ দেয়া হয়েছিল, সেগুলোর প্রায় সবকটিরই লিভার ক্যান্সার দেখা দেয়। এ থেকে বিজ্ঞানীরা উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, অতিরিক্ত প্রাণিজ আমিষ টিউমারসহ নানা রকম ক্যান্সার সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

তাই এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ১০ শতাংশের কম প্রাণিজ খাবার এবং ৯০ শতাংশের বেশি উদ্ভিজ্জ খাবার থাকা জরুরি। তবেই আপনি সুস্থ কর্মময় দীর্ঘজীবনের প্রত্যাশা করতে পারেন।

৩. ফ্যাট বা চর্বি

একটা সময় ছিল যখন সব ধরনের ফ্যাট বা চর্বিকেই ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের আলোকে এখন বলা হচ্ছে, সব ফ্যাট একরকম নয়। কিছু ফ্যাট অত্যন্ত ক্ষতিকর, কিছু ফ্যাট আবার অত্যন্ত উপকারী, আর কিছু ফ্যাট আছে যা অধিক পরিমাণে খেলে ক্ষতিকর।

এসব বিবেচনায় ফ্যাট প্রধানত তিন প্রকার—

- ☐ ট্রান্স ফ্যাট (অত্যন্ত ক্ষতিকর ফ্যাট)
- ☐ মনো-আনস্যাচুরেটেড এবং পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (অত্যন্ত উপকারী ফ্যাট)
- ☐ স্যাচুরেটেড ফ্যাট (প্রয়োজন, তবে অতিরিক্ত হলেই ক্ষতিকর)

ট্রান্স ফ্যাট (অত্যন্ত ক্ষতিকর ফ্যাট)

এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর এক ধরনের ফ্যাট, যাকে বলা যেতে পারে মনুষ্যনির্মিত ফ্যাট। বেশিরভাগ ট্রান্স ফ্যাট তৈরি হয় খাদ্যশিল্পের বাই প্রোডাক্ট বা উপজাত হিসেবে। খাদ্যশিল্পে তরল উদ্ভিজ্জ তেলকে পার্শিয়াল হাইড্রোজেনেশন (আংশিক হাইড্রোজেনযুক্তকরণ) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কঠিন করা হয়, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কঠিন হয়ে জমে যায়। এটিই ট্রান্স ফ্যাট।

ট্রান্স ফ্যাট ব্যবহারের ফলে খাবারের স্থায়িত্বকাল বেড়ে যায় এবং খাবার মচমচে ও সুস্বাদু হয়। ডালডা বা বনস্পতি ঘি, কিছু মার্জারিন, বেকারি পেস্ট্রি, ফ্রাইড ফুড (চিকেন ফ্রাই, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং জিলাপি সিঙ্গাড়া সমুচা লুচি পুরি চপ বেগুনি পেঁয়াজু), চিপস বিস্কুট পেটিস চানাচুর ফ্রোজেন ফুড ইত্যাদি খাবারে থাকে এই ট্রান্স ফ্যাট।

প্রাকৃতিক কিছু খাবারেও অল্প পরিমাণ ট্রান্স ফ্যাট থাকে, যা তুলনামূলক কম ক্ষতিকর। যেমন : দুধ মাখন ঘি এবং গরু, ভেড়া ও ছাগলের মাংস। আবার রান্নার কাজে একই তেল বার বার পোড়ালেও তাতে ট্রান্স ফ্যাট তৈরি হতে পারে। ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার রক্তে মন্দ কোলেস্টেরল (এলডিএল) বাড়ায় এবং ভালো কোলেস্টেরল (এইচডিএল) কমিয়ে দেয়। ফলে করোনারি হৃদরোগ, হার্ট অ্যাটাক, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর যত মানুষ মারা যায় তার ৪.৪১ শতাংশের জন্যে দায়ী এই ট্রান্স ফ্যাট। ট্রান্স ফ্যাট নিয়ে ২০১৯ সালে ঢাকার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট একটি যৌথ গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণার বিষয় ছিল 'অ্যাসেসমেন্ট অব ট্রান্স ফ্যাট ইন পিএইচও ইন বাংলাদেশ'।

গবেষকরা বলেছেন, বাংলাদেশে ডালডা বা বনস্পতি ঘি হিসেবে পার্শিয়ালি হাইড্রোজেনেটেড অয়েল (পিএইচও) ব্যবহার করা হয়। বাসাবাড়িতে এর ব্যবহার কম হলেও ভাজাপোড়া, স্ন্যাকস, বেকারিপণ্য ও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত খাদ্যপণ্যে এটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। এই পিএইচও-তে ক্ষতিকর ট্রান্স ফ্যাট পাওয়া গেছে।

এই গবেষণার জন্যে ঢাকায় খুচরা বিক্রেতাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন বেকারি ও হোটেল রেস্তোরাঁয় খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত পিএইচও-র চারটি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডের ডালডার ২৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর তা বিশ্লেষণের জন্যে পাঠানো হয় পর্তুগালের লিসবনে ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউটের ফুড কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে।

গবেষণার ফলাফলে জানা গেছে, ২৪টি নমুনার মধ্যে ২২টিতেই (৯২ শতাংশ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় ট্রান্স ফ্যাট পাওয়া গেছে, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতি ১০০ গ্রামে সর্বোচ্চ ২ গ্রাম ট্রান্স ফ্যাট গ্রহণের অনুমোদন দিয়েছে। *(তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ও বিবিসি বাংলা, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০)*

মনো-আনস্যাচুরেটেড এবং পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (অত্যন্ত উপকারী ফ্যাট)

পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, মনো-আনস্যাচুরেটেড এবং পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট মানবদেহের জন্যে অত্যন্ত উপকারী। নিয়মিত এই ফ্যাট খেলে রক্তের ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল কমে, উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরল বাড়ে এবং হৃদরোগ, স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে। মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট পাওয়া যায় যে-সব খাবারে তার মধ্যে চীনাবাদাম, কাজুবাদাম, কাঠবাদাম, অ্যাভোকাডো, জলপাই, জলপাই তেল (অলিভ অয়েল), ক্যানোলা অয়েল, সূর্যমুখী তেল অন্যতম।

পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট হচ্ছে এসেনশিয়াল ফ্যাটি এসিড। এসেনশিয়াল ফ্যাটি এসিডকে বলা হয় ইঞ্জিন অয়েল। একটি মোটরগাড়িকে সুন্দর ও মসৃণভাবে চালানোর জন্যে যেমন নিয়মিত ইঞ্জিন অয়েল প্রয়োজন, তেমনি আমাদের দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমকে সুচারুভাবে পরিচালনার জন্যেও প্রয়োজন এসব উপকারী ফ্যাট।

এসেনশিয়াল ফ্যাটি এসিড প্রধানত দুধরনের :

- ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড (Omega-3 fatty acid)
- ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড (Omega-6 fatty acid)

ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড : যে-সব খাবারে পাওয়া যায়—মাছ (বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ) ও মাছের তেল, তিসি, চিয়া বীজ, সয়াবিন, আখরোট, চীনাবাদাম, পালং শাক, ক্যানোলা অয়েল, দুধ, পনির।

ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড : যে-সব খাবারে পাওয়া যায়—সয়াবিন, সূর্যমুখী বীজ, আখরোট, ভুট্টার তেল। ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড শরীরের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু অতিরিক্ত হলে এটিই আবার ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। উদ্ভিজ্জ তেলে বিশেষ করে সয়াবিন তেলে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড আছে। তাই অতিরিক্ত সয়াবিন তেল ইমিউন সিস্টেমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

স্যাচুরেটেড ফ্যাট (প্রয়োজন, তবে অতিরিক্ত হলেই ক্ষতিকর)

প্রকৃতিতে প্রায় ২৪ ধরনের স্যাচুরেটেড ফ্যাট পাওয়া যায়। তার মধ্যে অন্যতম হলো : গরু, ভেড়া, মহিষ, শুকর, খাসি ও পাঁঠার মাংস; চামড়াসহ মুরগি ও হাঁসের মাংস; দুধ ও দুধের তৈরি খাবার—মাখন, ঘি ও পনির; ডিম (কুসুমসহ), পাম তেল, নারিকেল তেল।

স্যাচুরেটেড ফ্যাটসমৃদ্ধ খাবার রক্তের টোটাল কোলেস্টেরল ও ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল বাড়ায় বহুগুণে, যা হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীসহ শরীরের অন্যান্য ধমনীতে ব্লকেজ তৈরি করে।

এ-ছাড়াও স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ও টাইপ-২ ডায়াবেটিস সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে স্যাচুরেটেড ফ্যাট। তাই স্যাচুরেটেড ফ্যাটসমৃদ্ধ খাবার যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো। এর বিকল্প হিসেবে মনো ও পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট খাওয়া যেতে পারে।

তেল ॥
সত্যটা জানা জরুরি

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি—স্যাচুরেটেড ফ্যাট আমাদের শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। স্যাচুরেটেড ফ্যাটসমৃদ্ধ কোনো খাবার খেলে শরীরে প্রবেশের পর স্যাচুরেটেড ফ্যাট রূপান্তরিত হয় এলডিএল কোলেস্টেরলে। আর এই এলডিএল কোলেস্টেরল হৃদরোগসহ নানা রোগের কারণ। সুতরাং স্যাচুরেটেড ফ্যাটসমৃদ্ধ খাবার সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে।

স্যাচুরেটেড ফ্যাটসমৃদ্ধ তেমনই একটি খাবার হচ্ছে উদ্ভিজ্জ তেল (Vegetable oil)। যে কয়টি খাবার মানবজাতির অস্তিত্বের জন্যে হুমকিস্বরূপ, তার মধ্যে অন্যতম হলো তেল। চিনির মতো এটিও একটি রিফাইন্ড ফুড। তেলে ফ্যাট ছাড়া অন্য কিছু নেই; কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ভিটামিন মিনারেল ফাইটোকেমিক্যাল বা আঁশ—কোনোটিই নেই। এতে রয়েছে শুধু ফ্যাট। তেল হচ্ছে ১০০% ফ্যাট।

এক চা চামচে তেল থাকে ৪.৫ গ্রাম। প্রতি গ্রাম তেলে ক্যালরির পরিমাণ হচ্ছে ৯। এই হিসাবে এক চা চামচ তেলে থাকে ৪০ ক্যালরি। আর এক টেবিল চামচে তেল থাকে ১৪ গ্রাম এবং এতে থাকে ১২০ ক্যালরি। আর এ

কারণেই তৈলাক্ত খাবার স্থূলতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। প্রতিটি তেলেই স্যাচুরেটেড, মনো-আনস্যাচুরেটেড এবং পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বিভিন্ন অনুপাতে থাকে।

বিভিন্ন ধরনের তেল (এক টেবিল চামচ) এবং অন্যান্য সমপরিমাণ চর্বিযুক্ত খাবারে থাকা ফ্যাটের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ফ্যাটযুক্ত খাবার	স্যাচুরেটেড ফ্যাট (গ্রাম)	মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (গ্রাম)	পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (গ্রাম)
নারিকেল তেল	১১.৭	০.৮	০.২
সয়াবিন তেল	২.০	৩.১	৭.৮
অলিভ অয়েল	১.৯	৯.৮	১.২
সানফ্লাওয়ার তেল	১.৪	২.৮	৮.৭
স্যাফ্লাওয়ার তেল	১.৩	১.৭	১০.০
ক্যানোলা অয়েল	০.৮	৮.৪	৪.৪
মুরগির চর্বি	৪.২	৬.৪	৩.০
গরুর চর্বি	৭.১	৬.০	০.৫
মাখন	৯.০	৪.১	০.৬

আমরা জানি, স্যাচুরেটেড ফ্যাট রক্তের ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল বাড়ায়। যেহেতু সব ধরনের তেলেই স্যাচুরেটেড ফ্যাট রয়েছে, তাই তেল খেলেই তা কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণ হবে। তবে ক্ষেত্রভেদে কম বা বেশি। নারিকেল তেলে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে সবচেয়ে বেশি। এরপর সয়াবিন তেল ও অলিভ অয়েল। ক্যানোলা অয়েলে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে সবচেয়ে কম। এরপর স্যাফ্লাওয়ার ও সানফ্লাওয়ার অয়েল।

সুতরাং সবচেয়ে কম ক্ষতিকর হলো ক্যানোলা অয়েল। এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিকর স্যাফ্লাওয়ার ও সানফ্লাওয়ার অয়েল। সবচেয়ে ক্ষতিকর নারিকেল তেল। এ-ছাড়াও তেলের পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটে থাকে ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড, যা অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

তাই প্রতিদিনের রান্নায় তেলের ব্যবহার নিয়ে সচেতন হোন। সুস্থ ও রোগমুক্ত দীর্ঘজীবন প্রত্যাশীরা রান্নায় ন্যূনতম তেল ব্যবহার করুন। মাথাপিছু প্রতিমাসে বড়জোর আধালিটার তেল। এর বেশি হলে তা হৃদরোগসহ অন্যান্য রোগের ঝুঁকি বাড়াবে।

আর আপনি যদি হৃদরোগী হন, তাহলে কমপক্ষে দুই বছর বিনা তেলে রান্না করা খাবার খান।

রান্নার স্বাদ নির্ভর করে সঠিক পরিমাণ ও অনুপাতে মসলার ব্যবহার এবং রন্ধনপ্রণালীর ওপর, তেলের ওপর নয়। সুতরাং তেল ছাড়া রান্নায় অভ্যস্ত হোন। প্রথম কিছুদিন স্বাদ একটু অন্যরকম মনে হলেও তিন সপ্তাহ থেকে তিন মাসের মধ্যে আপনি এভাবে খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন। তখন তেল ছাড়া রান্না করা খাবারটাই আপনার কাছে উপাদেয় মনে হবে।

তেল ছাড়া রান্না করার পদ্ধতি

ক. চুলাতে কড়াই গরম করুন।

খ. শুকনো কড়াইতে জিরা ভাজুন, যতক্ষণ পর্যন্ত না জিরাগুলো সশব্দে ফাটতে থাকে এবং ধূসর লালচে বর্ণ ধারণ করে, ততক্ষণ কাঠের খুন্তি দিয়ে নাড়তে থাকুন।

গ. এরপর কড়াইতে পেঁয়াজ বাটা পরিমাণমতো দিয়ে ভাজতে থাকুন। মাঝে মাঝে খুব সামান্য পরিমাণ পানি (যে পরিমাণ তেল দিতেন) ছিটিয়ে নাড়তে থাকুন, যেন গরম কড়াইতে পেঁয়াজ আটকে বা পুড়ে না যায়।

ঘ. এরপর প্রয়োজনমতো আদা ও রসুন বাটা দিন।

ঙ. এই পেঁয়াজ, আদা, রসুন ধূসর বর্ণ হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকুন। ভাজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অতি অল্প মাত্রায় বার বার পানি দিয়ে নাড়তে থাকুন। বেশি পানি একসঙ্গে দেবেন না।

চ. এরপর কুচি কুচি করে টমেটো কড়াইতে দিন এবং যতক্ষণ না ফুটন্ত ভাব আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে ভাজতে থাকুন।

ছ. এরপর প্রয়োজনমতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন।

জ. শেষে বাকি সব মসলা যেমন : লবণ, লাল মরিচের গুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো স্বাদ ও প্রয়োজনমতো দিয়ে একসঙ্গে নাড়তে থাকুন।

ঝ. তেল ছাড়া মসলা ভাজা শেষ।

সবজি রান্নার ক্ষেত্রে : সবজিগুলো গরম কড়াইতে ভাজা মসলার সঙ্গে দিয়ে দু-চার বার নাড়ুন। এবার প্রয়োজনমতো পানি দিন এবং ঢেকে রেখে কিছুক্ষণ ফোটান। রান্না শেষ হলে ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে রাখুন।

ডাল রান্নার ক্ষেত্রে : সেদ্ধ ডাল বা ভেজানো ডাল ভাজা মসলার সঙ্গে দিয়ে গরম কড়াইতে নাড়তে থাকুন। এরপর প্রয়োজনমতো পানি দিন এবং ঢেকে কিছুক্ষণ ফোটান। রান্না শেষে নামিয়ে রাখুন।

মাছ রান্নার ক্ষেত্রে : প্রস্তুতকৃত মসলার মধ্যে মাছ ছেড়ে দিয়ে নাড়তে থাকুন এবং প্রয়োজনমতো পানি দিন। ঢেকে ভালোভাবে রান্নার পর নামিয়ে রাখুন।

মাংস রান্নার ক্ষেত্রে : প্রস্তুতকৃত মসলার মধ্যে মাংস ছেড়ে দিয়ে নাড়তে থাকুন এবং প্রয়োজনমতো পানি দিন। পানি ফুটে উঠলে স্বাদ অনুয়ায়ী গরম মসলা, লবঙ্গ, জয়ত্রী, জায়ফল, কালো এলাচি, শুকনো মরিচ ইত্যাদি দিন এবং ঢেকে কিছুক্ষণ ফোটান। রান্না শেষ হলে নামিয়ে রাখুন।

কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড

রক্তের ফ্যাট বা চর্বির মাত্রা বোঝার জন্যে সাধারণত যে পরীক্ষাটি করা হয় তা হলো ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইল (Fasting Lipid Profile)। অর্থাৎ রাতে কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা না খেয়ে থেকে পরদিন সকালে খালিপেটে রক্ত পরীক্ষা করে তার ফলাফল থেকে রক্তে চর্বির মাত্রা জানা যায়। লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষায় প্রধানত দুটি জিনিস দেখা হয় :

□ কোলেস্টেরল

টোটাল কোলেস্টেরল (Total Cholesterol)

এইচডিএল কোলেস্টেরল (HDL Cholesterol)

এলডিএল কোলেস্টেরল (LDL Cholesterol)

□ ট্রাইগ্লিসারাইড (TG)

কোলেস্টেরল

কোলেস্টেরল মোমের ন্যায় দেখতে এক ধরনের লিপিড বা ফ্যাট হলেও অন্যান্য ফ্যাট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি আমাদের শরীরের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। অন্যান্য সকল ফ্যাট ভেঙে শক্তি তৈরি হলেও কোলেস্টেরল কখনো বার্নড আউট হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয় না। তাই এটি শরীরের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও অতিরিক্ত হলে এটিই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোলেস্টেরল রক্তের মধ্যে 'লাইপোপ্রোটিন' নামক এক ধরনের প্রোটিনের সাথে যুক্ত অবস্থায় পরিবাহিত হয়।

শরীরের প্রতিটি কোষের বহিরাবরণ বা সেল মেমব্রেন তৈরিতে, ভিটামিন-ডি তৈরিতে, গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যেমন : ইস্ট্রোজেন, টেস্টোস্টেরন ও এড্রেনাল হরমোন তৈরিতে এবং চর্বিজাতীয় খাবার হজমের জন্যে প্রয়োজনীয় বাইল এসিড তৈরিতে কোলেস্টেরল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গবেষণায় দেখা গেছে, দৈনন্দিন খাবার থেকে এক গ্রাম কোলেস্টেরলও যদি আমরা না পাই, তবুও প্রতিদিনের শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কোলেস্টেরল শরীর নিজেই তৈরি করে নিতে পারে। আসলে আপনার রক্তের মোট কোলেস্টেরলের তিন-চতুর্থাংশ তৈরি হচ্ছে আপনার শরীরেই—লিভার ও শরীরের অধিকাংশ কোষের মাধ্যমে।

ফলে খাবারের মাধ্যমে প্রবেশকৃত কোলেস্টেরল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে যাচ্ছে অতিরিক্ত। খাবারের এই অতিরিক্ত কোলেস্টেরল এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাটই ধমনীতে ব্লকেজ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। তাই সুস্থতার জন্যে আমাদের উচিত স্বল্প কোলেস্টেরল ও স্বল্প স্যাচুরেটেড ফ্যাটযুক্ত খাবার খাওয়া।

কতটুকু কোলেস্টেরল হার্ট অ্যাটাকের জন্যে দায়ী? গবেষকদের মতে, একবেলার উচ্চ কোলেস্টেরল ও স্যাচুরেটেড ফ্যাটযুক্ত খাবারও কারো কারো হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে।

অতিরিক্ত কোলেস্টেরল ও স্যাচুরেটেড ফ্যাট রক্তে প্রবেশের সাথে সাথে রক্তের ফ্যাক্টর সেভেন (Factor-VII) এবং থ্রম্বোক্সেন এ২ (Thromboxane-A_2) নিঃসৃত হয়, যা করোনারি ধমনীকে সংকুচিত (Coronary Spasm) করে ফেলে এবং ধমনীর ভেতর দ্রুত রক্ত জমাটবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, যার ফলাফল হার্ট অ্যাটাক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোলেস্টেরল একদিকে যেমন শরীরের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, আবার অতিরিক্ত হলে তা-ই বেশ ক্ষতিকর।

কোলেস্টেরল প্রধানত দুই ধরনের

- ☐ এইচডিএল কোলেস্টেরল (উপকারী কোলেস্টেরল)
- ☐ এলডিএল কোলেস্টেরল (ক্ষতিকর কোলেস্টেরল)

এইচডিএল কোলেস্টেরলকে আমরা অভিহিত করতে পারি নিঃস্বার্থ পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে। এইচডিএল কোলেস্টেরল করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। এটি শরীরের জন্যে ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরলকে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে লিভারে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে পিত্তের মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্র দিয়ে শরীর থেকে বের করে দেয়। তাই রক্তে এইচডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ যত বেশি থাকে তত ভালো।

এইচডিএল কোলেস্টেরল পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪০ মিগ্রা/ ডেসিলিটারের বেশি, মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫০ মিগ্রা/ ডেসিলিটারের বেশি এবং করোনারি হৃদরোগীদের ক্ষেত্রে ৬০ মিগ্রা/ ডেসিলিটারের বেশি থাকা প্রয়োজন।

অন্যদিকে এলডিএল কোলেস্টেরল শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। এটি অতিরিক্ত হলে করোনারি ধমনীতে ব্লকেজ তৈরি হয়। তাই রক্তে এলডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ কতটুকু পর্যন্ত নিরাপদ তা জানা প্রয়োজন।

বিভিন্ন গবেষণার আলোকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা ৮০ মিগ্রা/ ডেসিলিটারের মধ্যে থাকলে তা হৃদরোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ-ছাড়া হৃদরোগ নিরাময়ের জন্যে অর্থাৎ ধমনীকে ব্লকেজমুক্ত করতে চাইলেও এর মাত্রা ৮০ মিগ্রা/ ডেসিলিটারের মধ্যে রাখা প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ট, লাং ও ব্লাড ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে ও বোস্টন ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় ম্যাসাচুসেটসের ফ্রেমিংহাম শহরের অধিবাসীদের নিয়ে পরিচালিত একটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা হলো 'ফ্রেমিংহাম হার্ট স্টাডি'। ১৯৪৮ সালে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত মোট ৫,২০৯ জন মানুষের ওপর পরিচালিত এ গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের রক্তের মোট কোলেস্টেরলের (Total

Cholesterol) মাত্রা ১৫০ মিগ্রা/ ডেসিলিটারের মধ্যে ছিল, তাদের কখনো হার্ট অ্যাটাক হয় নি। সুতরাং মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা ১৫০ মিগ্রা/ ডেসিলিটারের মধ্যে থাকা নিরাপদ।

আমাদের দৈনন্দিন কিছু খাবারে কোলেস্টেরলের পরিমাণ

বিভিন্ন ধরনের খাবার	পরিমাণ	এলডিএল কোলেস্টেরল (মি.গ্রা)
গরুর মগজ	১০০ গ্রাম	২১০০
গরুর কলিজা	১০০ গ্রাম	৩০০
গরুর মাংস	১০০ গ্রাম	১০০
মুরগির ডিম (বড়)	১টি	১৮৬
ডিমের কুসুম	১টি	১৮৬
মুরগির মাংস (চামড়াসহ)	১০০ গ্রাম	৭২
মুরগির কলিজা	১০০ গ্রাম	৮৮
ননীযুক্ত দুধ	১ কাপ	৩৪
সম্পূর্ণ সর তোলা দুধ	১ কাপ	২০
সম্পূর্ণ ননী ছাড়া দুধ	১ কাপ	৫
দই (পূর্ণ ননীযুক্ত)	১ কাপ (২৫০ গ্রাম)	৩২
দই (অল্প ননীযুক্ত)	১ কাপ (২৫০ গ্রাম)	১৪
পনির	২৮ গ্রাম	২৭
বিফ বার্গার	১টি	৮০
গলদা চিংড়ি	১০০ গ্রাম	১৯০

তাই জানতে হবে—কোন কোন খাবারে কোলেস্টেরল থাকে। সকল প্রাণিজ খাবারেই কিছু না কিছু কোলেস্টেরল থাকে। মগজ, কলিজা, গরুর মাংস, মাখন, ডিমের কুসুম, ঘি, চিংড়ি ইত্যাদি খাবারে রয়েছে প্রচুর কোলেস্টেরল। অন্যদিকে উদ্ভিদজাত কোনো খাবারেই কোলেস্টেরল থাকে না। যেমন পূর্ণ শস্যদানা, শাকসবজি, সালাদ, ফলফলাদি, বীজ, বাদাম, বিন, ডাল ইত্যাদিতে কোনো কোলেস্টেরল থাকে না।

এমনকি মাছেও রয়েছে কিছু পরিমাণ কোলেস্টেরল। যে-সব মাছ অন্য মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে, তাদের চেয়ে তৃণভোজী মাছে কোলেস্টেরলের পরিমাণ অনেক কম।

ট্রান্স ফ্যাট এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাটযুক্ত খাবার খেলে রক্তের টোটাল কোলেস্টেরল এবং এলডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই ৪০ বছর বয়স হলে অন্তত দু-তিন বছর পর পর রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ (Fasting Lipid Profile) পরীক্ষা করান। এ পরীক্ষায় চমৎকার ফল পেতে কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে সংযমী হোন, নিয়মিত ব্যায়াম করুন, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ধূমপান ও এলকোহল বর্জন করুন এবং সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। স্ট্রেসমুক্ত জীবনের জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করুন।

ট্রাইগ্লিসারাইড (বডি ফ্যাট)

আমাদের শরীরে যে ফ্যাট সর্বাধিক পরিমাণে থাকে সেটিই হলো ট্রাইগ্লিসারাইড। এটি শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমা হতে থাকে এবং প্রয়োজনের সময় এ ফ্যাট ভেঙে শরীরে শক্তি উৎপন্ন হয়। এটি আমাদের শরীরের জন্যে প্রয়োজন। কিন্তু অতিরিক্ত হয়ে গেলে এটিই তখন স্থূলতা, করোনারি হৃদরোগ, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, টাইপ-২ ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগের কারণ হতে পারে। এ-ছাড়া অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড মেটাবলিক সিনড্রোমের (Metabolic Syndrome) জন্যেও দায়ী।

মেটাবলিক সিনড্রোম

গত ৩০ বছরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হচ্ছে, মেটাবলিক সিনড্রোম সম্পর্কে ধারণা লাভ। ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল কোলেস্টেরল এডুকেশন প্রোগ্রাম থেকে বলা হয় যে, যদি কারো মধ্যে নিচের

পাঁচটি লক্ষণের (Symptom) যে-কোনো তিনটি বিদ্যমান থাকে, তবে তার মেটাবলিক সিনড্রোম রয়েছে। লক্ষণগুলো হলো :

1. Abdominal obesity by waist circumference	
2. Low HDL Cholesterol	[< 40 mg/ dl]
3. High Triglyceride	[> 150 mg/ dl]
4. High Blood Pressure	[> 130/85 mm.Hg]
5. Fasting Blood Sugar	[> 5.56 mmol/L]

কোমরের আদর্শ মাপ

কোমরের মাপ (waist circumference) জানা প্রত্যেকের জন্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি মেটাবলিক সিনড্রোমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আদর্শ কোমরের মাপ হতে হবে উচ্চতার অর্ধেক বা তার চেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ, কারো উচ্চতা যদি ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি হয়, তবে তার কোমরের মাপ হতে হবে ৫ ফুট ১০ ইঞ্চির (৬০ ইঞ্চি + ১০ ইঞ্চি = ৭০ ইঞ্চি) অর্ধেক অর্থাৎ ৩৫ ইঞ্চি বা তার চেয়ে কম।

উত্তর আমেরিকার প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি তিন জনে একজন মেটাবলিক সিনড্রোমে আক্রান্ত। মেটাবলিক সিনড্রোম যে-সব রোগের ঝুঁকি বাড়ায়, তার মধ্যে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম অন্যতম।

কোমরের মাপ নেয়ার পদ্ধতি

আমাদের দেহে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হয় প্রধানত দুভাবে—

১. ভোজ্য তেল, গরু, খাসি ও মুরগির মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, মাখন, মার্জারিন ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত ফ্যাট শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি করে।

দেহে ট্রাইগ্লিসারাইডের স্বাভাবিক মাত্রা

Optimal	:	40 – 100 mg/dl
Normal	:	< 150 mg/dl
Borderline High	:	151 – 200 mg/dl
High	:	201 – 499 mg/dl
Very High	:	500 mg/dl or above

২. চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দার তৈরি সকল খাবারও শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি করে। অতএব সুস্থতার জন্যে এবং মেটাবলিক সিনড্রোম, স্থূলতা, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ বা স্ট্রোক প্রতিরোধের জন্যে রক্তের ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা স্বাভাবিক রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাই ওজন বেশি থাকলে ধীরে ধীরে ওজন স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসুন। তৈলাক্ত-চর্বিযুক্ত খাবার বর্জন করুন। ক্ষতিকর ফ্যাট এড়িয়ে চলুন। উপকারী ফ্যাট খাওয়ার অভ্যাস করুন। চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দার তৈরি খাবার পুরোপুরি বর্জন করুন।

৪. ভিটামিন

ভিটামিন হচ্ছে ক্যালরিশূন্য একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান (Essential nutrients), যা শরীরের স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিনের অভাবে যেমন রোগ হতে পারে, তেমনি অতিরিক্ত ভিটামিনও বিপদ ডেকে আনতে পারে।

প্রকৃতিতে হাজারো খাবারে ছড়িয়ে রয়েছে নানাবিধ ভিটামিন। ভিটামিন থেকে দেহ বিভিন্ন কো-এনজাইম তৈরি করে, যা দেহের এনজাইমের কাজের জন্যে অপরিহার্য।

১৭৫৩ সালে ব্রিটিশ নেভাল সার্জন ডা. জেমস লিন্ড দেখেন, দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় কিছু নাবিক মারা যাচ্ছে যাদেরকে টিনজাত খাবার দেয়া হচ্ছিল। তাজা খাবার খাওয়ার সুযোগ এদের হয় নি। এরপর তিনি নাবিকদের তাজা

লেবু এবং কমলা খেতে দিলেন। দেখা গেল কেউ আর অসুস্থ হচ্ছে না। এর সূত্র ধরে তিনি স্কার্ভি রোগ আবিষ্কার করেন, যার কারণ ছিল ভিটামিন সি-এর অভাব। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ সাইট্রাস ফল খাওয়ার মাধ্যমে এ রোগটি প্রতিরোধ করা যায়।

১৯০৬ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ইঁদুরের ওপর বেশ কিছু গবেষণা পরিচালনা করেন ডা. ফ্রেডেরিক হপকিন্স। তিনি একদল ইঁদুরকে ল্যাবরেটরিতে তৈরি কৃত্রিম প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, মিনারেল, লবণ ও পানির সমন্বয়ে তৈরি খাবার দেন। সবগুলো ইঁদুরই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়।

আরেক দল ইঁদুরকে উপরোক্ত কৃত্রিম খাবারের সাথে দুধ দেয়া হলো। দেখা গেল, তারা স্বাভাবিক সুস্থভাবে বেঁচে আছে। এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা একটি সত্যকে সামনে নিয়ে আসে—প্রাকৃতিক খাবারে এমন কিছু পুষ্টি উপাদান (Essential nutrients) থাকে, যা বেঁচে থাকার জন্যে অপরিহার্য।

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অন্যান্য সকল ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যে জরুরি হলেও এসব ভিটামিন শরীর নিজে তৈরি করতে পারে না। তাই অবশ্যই খাবারের মাধ্যমে তা শরীরে সরবরাহ করতে হবে।

আমাদের প্রতিদিনের বিপাকীয় কার্যক্রমের জন্যে ভিটামিন দরকারি বটে, কিন্তু অত্যন্ত অল্প পরিমাণে। তাই ভিটামিনকে বলা হয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস (micronutrients)। একজন সুস্থ মানুষের প্রতিদিন যে পরিমাণ ভিটামিন প্রয়োজন, সব ধরনের ভিটামিন মিলে তার পরিমাণ এক চা চামচেরও কম।

ভিটামিন মূলত দুধরনের :

- ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন :
  ভিটামিন এ, ডি, ই, কে
- ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন :
  ভিটামিন সি এবং ভিটামিন বি$_{১}$, বি$_{২}$, বি$_{৩}$, বি$_{৫}$, বি$_{৬}$, বি$_{৯}$, বি$_{১২}$

এখন খুব সংক্ষেপে প্রতিটি ভিটামিনের কাজ এবং কোন কোন খাবারে তা পাওয়া যায় তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হলো :

ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন

ভিটামিন	প্রতিদিনের চাহিদা	ভিটামিনের অভাবে সৃষ্ট রোগ	যে সকল খাবারে পাওয়া যায়
ভিটামিন এ (এন্টি-অক্সিডেন্ট)	পুরুষ : ৯০০ মাইক্রোগ্রাম মহিলা : ৭০০ মাইক্রোগ্রাম	রাতকানা রোগ, দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, শুষ্ক ত্বক, করোনারি হৃদরোগ (ব্লকেজ ও হার্ট অ্যাটাক)	**প্রাণিজ খাবার :** ডিমের কুসুম, কলিজা, মাখন, কড লিভার অয়েল, ভিটামিন-এ যুক্ত দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** ঘন সবুজ ও কমলা রঙের শাকসবজি (গাজর, মিষ্টিকুমড়া, পালং শাক, মিষ্টি আলু), সজনে ও সজনে পাতা এবং হলুদ ফল (আম, কাঁঠাল, পাকা পেঁপে ইত্যাদি)।
ভিটামিন ডি	৬০০ আই.ইউ	হাড়ক্ষয়, দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ক্যান্সার, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, টাইপ-১ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ	সূর্যরশ্মি। সামুদ্রিক মাছ, মাছের তেল, মাছের কলিজা, ডিমের কুসুম, ভিটামিন-ডি যুক্ত দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার। **কোনো উদ্ভিজ্জ খাবারে ভিটামিন-ডি থাকে না।**
ভিটামিন ই (এন্টি-অক্সিডেন্ট)	১৫ মিলিগ্রাম (২২.৪ আই.ইউ)	রক্তস্বল্পতা, লোহিত কণিকা ভেঙে যায়, নার্ভের ক্ষতি, রেটিনার ক্ষতি, উচ্চ রক্তচাপ, ধমনীতে ব্লকেজ	**প্রাণিজ খাবার :** ডিমের কুসুম, দুধের ফ্যাট, মাংস। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** পূর্ণ শস্যদানা (চাল, গম, যব, ভুট্টা), কাজুবাদাম, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী বীজ, সয়াবিন, ব্রকোলি, পালং শাক ও ঘন সবুজ শাকসবজি, হলুদ সবজি, আম, জলপাই।
ভিটামিন কে	পুরুষ : ১২০ মাইক্রোগ্রাম মহিলা : ৯০ মাইক্রোগ্রাম	রক্তক্ষরণ প্রবণতা, রক্তক্ষরণ হয় এমন রোগ, দুর্বল হাড়ের গড়ন	পরিপাকতন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা শরীর নিজে এটি তৈরি করে। **প্রাণিজ খাবার :** মাছ মাংস ডিম কলিজা পনির। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** ঘন সবুজ পত্র বিশিষ্ট শাকসবজি (ব্রকোলি, লেটুস, পালং শাক, মটরশুঁটি, সয়াবিন, সবুজ বিন)।

ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন

ভিটামিন	প্রতিদিনের চাহিদা	ভিটামিনের অভাবে সৃষ্ট রোগ	যে সকল খাবারে পাওয়া যায়
ভিটামিন সি (এন্টি-অক্সিডেন্ট)	পুরুষ : ৯০ মি.গ্রা. মহিলা : ৭৫ মি.গ্রা. (বিশেষ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০০০ মিলিগ্রাম)	স্কার্ভি, রক্তক্ষরণ, রক্তস্বল্পতা, উচ্চ রক্তচাপ, ধমনীতে চর্বির আস্তর (Atherosclerosis), কাটা জায়গা শুকাতে দেরি হওয়া	টমেটো, লেটুস, বাঁধাকপি, মিষ্টি আলু, গোল আলু, ব্রকোলি, ফুলকপি ও ঘন সবুজ শাকসবজি, সজনে ও সজনে পাতা, মরিচ এবং হলুদ সবজি। সাইট্রাস ফল (আমলকি, লেবু, কমলালেবু, আঙুর, মাল্টা, পেয়ারা, আম, পাকা পেঁপে, আনারস, তরমুজ, স্ট্রবেরি)।
থায়ামিন (ভিটামিন বি$_১$)	পুরুষ : ১.২ মি.গ্রা. মহিলা : ১.১ মি.গ্রা.	বেরিবেরি, ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, অবসন্নতা, নার্ভ ড্যামেজ বা স্নায়ু ক্ষয়, প্যারালাইসিস, হার্ট ফেইলিউর, পায়ে পানি জমা	**প্রাণিজ খাবার :** গরুর মাংস, কলিজা, দুধ ও দুধের তৈরি খাবার, ডিম। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** পূর্ণ শস্যদানা (চাল ও গম), ফুলকপি, আলু, ডাল, বাদাম, মটরশুঁটি, সয়াবিন, কমলালেবু।
রিবোফ্লাভিন (ভিটামিন বি$_২$)	পুরুষ : ১.৩ মি.গ্রা. মহিলা : ১.১ মি.গ্রা.	ঘা শুকাতে দেরি হওয়া, ঠোঁটের কোণে ঘা, জিহ্বা লাল ও ছিলে যাওয়া, চোখে অস্বস্তি, চামড়ার সমস্যা	**প্রাণিজ খাবার :** গরুর মাংস, মুরগির মাংস, গরুর কলিজা, মাছ, কিডনি, ডিম, দুধ। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** পূর্ণ শস্যদানা (চাল ও গম), মটরশুঁটি, সয়াবিন, বীজ, মাশরুম, কাজুবাদাম, মিষ্টি আলু, ব্রকোলি, পালং শাক, ঘন সবুজ শাকসবজি, সজনে ও সজনে পাতা।
নিয়াসিন (ভিটামিন বি$_৩$)	পুরুষ : ১৬ মি.গ্রা. মহিলা : ১৪ মি.গ্রা.	দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য, ডায়রিয়া, স্নায়ুর প্রদাহ, বিভ্রান্তি	**প্রাণিজ খাবার :** গরুর কলিজা, গরুর মাংস, মুরগির মাংস, মুরগির কলিজা, টার্কি, কিডনি, ডিম, দুধ, পনির। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** পূর্ণ শস্যদানা (চাল ও গম), চীনাবাদাম, অ্যাভোকাডো, মাশরুম, সবুজ মটরশুঁটি, আলু।
প্যানটো-থেনিক এসিড (ভিটামিন বি$_৫$)	৫ মি.গ্রা.	অবসন্নতা, অনিদ্রা, বিষণ্ণতা, বিরক্তি, বমি বমি ভাব বা বমি, পায়ের তালু জ্বালা-পোড়া করা	**প্রাণিজ খাবার :** মাছ, মুরগির মাংস, কলিজা, কিডনি, ডিম, দুধ, টক দই। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** পূর্ণ শস্যদানা (চাল ও গম), সূর্যমুখী বীজ, শাকসবজি, ব্রকোলি, চীনাবাদাম, ডাল, মটরশুঁটি, মাশরুম, মিষ্টি আলু।

ভিটামিন	প্রতিদিনের চাহিদা	ভিটামিনের অভাবে সৃষ্ট রোগ	যে সকল খাবারে পাওয়া যায়
পাইরিডক্সিন (ভিটামিন বি$_৬$)	পুরুষ : ১.৩ মি.গ্রা. মহিলা : ১.৭ মি.গ্রা.	রক্তস্বল্পতা (এনিমিয়া), খিঁচুনি, নার্ভের প্রদাহ (Neuritis)	**প্রাণিজ খাবার :** গরুর কলিজা, মুরগির মাংস, মুরগির কলিজা, কিডনি, টার্কি, মাছ, ডিম, দুধ। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** পূর্ণ শস্যদানা (চাল ও গম), কলা, আলু, মিষ্টি আলু, পালং শাক, ঘন সবুজ শাকসবজি, সজনে ও সজনে পাতা এবং বাদাম, মসুর ডাল, কিশমিশ, সয়াবিন, টোফু, তরমুজ, পেঁয়াজ।
ফলিক এসিড বা ফোলেট (ভিটামিন বি$_৯$)	৪০০ মাইক্রোগ্রাম	মেগালোব্লাস্টিক এনিমিয়া (রক্তস্বল্পতা), বাচ্চাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া, জন্মগত ত্রুটি (Neural Tube Defect)	**প্রাণিজ খাবার :** কলিজা, কিডনি, মুরগির মাংস, ডিম, দুধ। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** পূর্ণ শস্যদানা (লাল চাল ও গম), কমলা, পালং শাক, লেটুস, বিন, ডাল।
সায়ানোকো-বালামিন (ভিটামিন বি$_{১২}$)	২.৪ মাইক্রোগ্রাম	পার্নিশাস এনিমিয়া (এক ধরনের রক্তস্বল্পতা), নার্ভের কার্যকারিতা কমে যাওয়া	**প্রাণিজ খাবার :** গরুর মাংস, গরুর কলিজা, কিডনি, ঝিনুক, টুনা মাছ, ডিম, দুধ, টক দই, পনির। **কোনো উদ্ভিজ্জ খাবারে ভিটামিন বি$_{১২}$ থাকে না।**
বায়োটিন	৩০ মাইক্রোগ্রাম	মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধিতে এই ভিটামিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর অভাবে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি শ্লথ হয়। এ-ছাড়া চুল পড়া, কানে শুনতে এবং চোখে দেখতে অসুবিধা হওয়া।	**প্রাণিজ খাবার :** কলিজা, ডিমের কুসুম, পনির। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** কাঠবাদাম, সূর্যমুখী বীজ, মিষ্টি আলু, ফুলকপি, মাশরুম, ব্রকোলি, কলা, পালং শাক, সয়া পাউডার।

সুস্থ রোগমুক্ত দীর্ঘজীবনের জন্যে ভিটামিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রোগাক্রান্ত হওয়ার আগেই রোগ প্রতিরোধ করা বুদ্ধিমানের কাজ। আর যথাযথভাবে রোগ প্রতিরোধ করার জন্যে আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সব ধরনের ভিটামিন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় থাকতে হবে।

এজন্যে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পরিমিত মাছ/ মাংস/ ডিম/ দুধের সাথে পর্যাপ্ত ফল, সালাদ, শাকসবজি, কাঁচা সবুজ পাতা এবং পরিমিত পরিমাণে ডাল, মটরশুঁটি, বাদাম, বিভিন্ন রকম বীজ ও বিন যোগ করুন। আমরা প্রত্যাশা করি—আপনি সুস্থ থাকবেন, দীর্ঘজীবী হবেন।

৫. ফাইটোকেমিক্যাল

ফাইটোকেমিক্যাল হচ্ছে নন-নিউট্রিটিভ প্ল্যান্ট কেমিক্যাল, যা রোগ প্রতিরোধে সিদ্ধহস্ত। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, এর সংখ্যা প্রায় ১০,০০০। তবে এখন পর্যন্ত জানা ফাইটোকেমিক্যালের সংখ্যা হাজারেরও বেশি।

এই কিছুদিন আগেও মনে করা হতো, মানবদেহে ফাইটোকেমিক্যালের কোনো ভূমিকা নেই। মূলত উদ্ভিদ নিজেকে প্রতিরক্ষার জন্যে এটি তৈরি করে থাকে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলছেন, উদ্ভিদজাত এই ফাইটোকেমিক্যাল মানুষকে নানাবিধ রোগ থেকে সুরক্ষা দিতে পারে এবং দেহকোষের মধ্যে সৃষ্ট বিভিন্ন বর্জ্য ও টক্সিন দূর করে মানুষকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। এর মধ্যে Free Radicals, AGE (Advance Glycosylation End Product), Lipofusion, Lipid A_2E অন্যতম। স্ট্রোক, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে ফাইটোকেমিক্যাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফাইটোকেমিক্যাল পর্যাপ্ত পাওয়া যায় শুধু উদ্ভিজ্জ খাবারে। যেমন : পূর্ণ শস্যদানা (লাল চাল ও লাল আটা), শাকসবজি, সালাদ, ডাল এবং ফলে। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো : টমেটোতে থাকে লাইকোপিন, সয়াবিনে থাকে আইসোফ্ল্যাভনস, ফলে থাকে ফ্ল্যাভোনয়েডস।

প্রাণিজ খাবার, চিনিসহ অন্যান্য রিফাইন্ড ফুড এবং প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবারে কোনোরকম ফাইটোকেমিক্যালের অস্তিত্ব থাকে না। তাই এমনভাবে খাদ্যতালিকা তৈরি করুন যেন আপনার দৈনন্দিন খাবারে পর্যাপ্ত ফাইটোকেমিক্যাল থাকে। তবেই আপনি সুস্থ ও দীর্ঘজীবনের অধিকারী হতে পারবেন। আর এ লক্ষ্যে প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় রাখুন—

- ৩-৪ ধরনের ফল
- ৩-৪ ধরনের সালাদ
- পর্যাপ্ত শাক ও সবজি (অর্ধসেদ্ধ)

- ৩-৪ ধরনের সবুজ পাতা দিয়ে তৈরি গ্রিন জুস (লেটুস পাতা + ধনেপাতা + পুদিনা পাতা + পালং শাক + আমলকি)
- পরিমিত পরিমাণে ডাল এবং মটরশুঁটি সয়াবিন বাদাম বীজ ও বিন

৬. মিনারেল

মিনারেল আমাদের শরীরের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জীবনের জন্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বহুবিধ বিপাকক্রিয়ায় মিনারেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মিনারেল একদিকে যেমন শরীরের বিভিন্ন টিস্যু গঠনে ভূমিকা রাখে, তেমনি ভূমিকা রাখে স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে। যেমন : সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম দেহের পানির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে অক্সিজেন পরিবহনকারী হিমোগ্লোবিনের কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আয়রন।

মিনারেল প্রধানত দুধরনের :

- মেজর মিনারেল : ক্যালসিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেসিয়াম ফসফরাস সালফার।
- ট্রেস মিনারেল : আয়রন আয়োডিন জিংক সেলেনিয়াম ফ্লোরাইড কপার ম্যাঙ্গানিজ ক্রোমিয়াম মলিবডেনাম কোবাল্ট বোরন ভ্যানাডিয়াম নিকেল।

পরিচিত কয়েকটি মেজর মিনারেল এবং কয়েকটি ট্রেস মিনারেল-এর কাজ এবং কোন কোন খাবারে পাওয়া যায় তা উল্লেখ করা হলো :

মিনারেল	কাজ	কোন কোন খাবারে পাওয়া যায়
ক্যালসিয়াম (Ca)	দেহের ক্যালসিয়ামের ৯৯ শতাংশ ব্যবহৃত হয় হাড় ও দাঁত তৈরিতে। এ-ছাড়া রক্ত জমাটবাঁধার কাজে, পেশির সংকোচন ও প্রসারণ এবং স্নায়ু থেকে স্নায়ুতে তথ্য পরিবহনের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।	**প্রাণিজ খাবার :** দুধ, টক দই, পনির, কাঁটাসহ ছোট মাছ। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** বীজ (চিয়া, তিল ও সূর্যমুখী), মটরশুঁটি, সয়াবিন, টোফু, মসুর ডাল, কাজুবাদাম, মিষ্টি আলু, কমলালেবু, পালং শাক, সজনে, ব্রকোলি, ঘন সবুজ শাকসবজি।

মিনারেল	কাজ	কোন কোন খাবারে পাওয়া যায়
সোডিয়াম (Na)	শরীরের পানির মাত্রা ও এসিড-ক্ষারের পরিমাণে ভারসাম্য রক্ষা, পেশির কাজ, স্নায়ু থেকে স্নায়ুতে তথ্য পরিবহনের কাজে, খাদ্য উপাদান শোষণে সাহায্য করে।	খাবার লবণ, প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাত খাবার এবং লবণ দিয়ে তৈরি সকল খাবার। প্রাকৃতিক প্রায় সকল খাবারেই সোডিয়াম থাকে। খাবার পানিতেও সোডিয়াম থাকে। এ-ছাড়া দুধ, পনির, মুরগির মাংস, গরুর মাংস, মাছ, ডিম, ডাল, বাদাম, বিন।
পটাশিয়াম (K)	কোষের অভ্যন্তরে পানির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, এসিড-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা, স্নায়ু স্পন্দন ও পেশি সংকোচন, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, বিপাকীয় কাজ	**প্রাণিজ খাবার :** মাংস, মাছ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** পূর্ণ শস্যদানা (চাল ও গম), ব্রকোলি, কাঁচা পেঁপে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, গোল আলু, মিষ্টি আলু, মুলা, করলা, ঢেঁড়স, টমেটো, লাউ, মাশরুম, মটরশুঁটি, মসুর ডাল, সয়াবিন, শিম, শসা, লেটুস, সবুজ শাকসবজি। কলা, ডাব, আমড়া, লেবু, কমলালেবু, বাতাবি লেবু, আম, পিচ ফল, তাল, পাকা টমেটো, আপেল, পেয়ারা, আনারস।
ক্লোরাইড (Cl)	এসিড-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা, হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরিতে	খাবার লবণ, প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাত খাবার, টমেটো, লেটুস, জলপাই, গরুর মাংস, পনির।
ম্যাগনে-সিয়াম (Mg)	বিপাকক্রিয়ায়, পেশি ও নার্ভের কাজে, থাইরয়েড হরমোন নিঃসরণের কাজে	মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, পূর্ণ শস্যদানা (চাল ও গম), বাদাম, বীজ, মসুর ডাল, মটরশুঁটি, সজনে, পালং শাক, সয়াদুধ।
আয়রন (Fe)	রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে এবং এন্টিবডি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়	**প্রাণিজ খাবার :** কলিজা, গরু ও মুরগির মাংস, ডিমের কুসুম, মাছ। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** পূর্ণ শস্যদানা (লাল চাল ও লাল আটা), পালং শাক ও অন্যান্য ঘন সবুজ শাকসবজি, সজনে ও সজনে পাতা, ব্রকোলি, খেজুর, কিশমিশ, মটরশুঁটি, বিন, সয়াদুধ, বাদাম, মসুর ডাল।
আয়োডিন (I)	থাইরয়েড হরমোন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় যা বিপাকক্রিয়ার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ	আয়োডিনযুক্ত লবণ, সামুদ্রিক মাছ ও শৈবাল, দুধ, পনির, ডিমের কুসুম, কড লিভার অয়েল, পূর্ণ শস্যদানা (লাল চাল ও লাল আটা)।

মিনারেল	কাজ	কোন কোন খাবারে পাওয়া যায়
জিংক (Zn)	এনজাইম ও প্রোটিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এ-ছাড়া ইনসুলিন জমা করতে এবং রোগ প্রতিরোধের কাজেও এটি ব্যবহৃত হয়।	**প্রাণিজ খাবার :** মাংস, চিংড়ি, কাঁকড়া, ডিম, কলিজা, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার এবং পনির। **উদ্ভিজ্জ খাবার :** পূর্ণ শস্যদানা, বাদাম, বীজ, মটরশুঁটি, সয়াবিন/ অন্যান্য বিন, মসুর ডাল, সবুজ শাকসবজি।

৭. আঁশ বা ফাইবার

আমাদের খাদ্যতালিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হচ্ছে ফাইবার বা আঁশ। এটি এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট (Polysaccharide) হলেও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এখানে এটা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হলো।

সুস্থতার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রেচন বা মল নিষ্কাশন প্রক্রিয়া। বিভিন্ন প্রকার খাবার খাওয়ার পর হজম শেষে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে শোষিত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে। আর অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য এসে জমা হয় বৃহদান্ত্রে এবং মলের সাথে তা বেরিয়ে যায়। মলের সাথে বর্জ্য পদার্থ নিয়মিতভাবে বেরিয়ে যাওয়া সুস্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত জরুরি। আর এ-ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে আঁশযুক্ত খাবার।

প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে এবং ফলমূল-শাকসবজি কম খেলে কিংবা না খেলে স্বাভাবিক রেচন অর্থাৎ মল নিষ্কাশন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। আবার শাকসবজি অধিক তাপে ও দীর্ঘসময় ধরে রান্না করলে আঁশের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন রোগের সূত্রপাত ঘটে। এর মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ (পাইল্‌স), রেকটাল প্রোলাপ্‌স, এনাল ফিশার, কোলন ক্যান্সার অন্যতম। এই রোগগুলো প্রতিরোধের জন্যে নিয়মিত আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ, পর্যাপ্ত পানি পান এবং নিয়মিত ব্যায়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যে-সব খাবারে ফাইবার বা আঁশ থাকে : শুধু উদ্ভিজ্জ খাবারেই আঁশ পাওয়া যায়—

- ☐ **পূর্ণ শস্যদানা :** লাল চালের ভাত ও লাল আটার (গম যব ভুট্টা ওটস) রুটি।

- **ফল :** কলা আপেল কমলালেবু আম লিচু পেয়ারা আমলকি স্ট্রবেরি চেরি পেঁপে নাশপাতি আনারস আঙুর তরমুজ ইত্যাদি।
- **শাকসবজি :** গাজর ব্রকোলি বিট শসা সজনে করলা ধুন্দল ঝিঙে চিচিঙ্গা ঢেঁড়স ফুলকপি বাঁধাকপি পটল টমেটো লাউ কুমড়া শালগম বেগুন ওলকচু এবং গোল আলু, মিষ্টি আলু, পালং শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, মটর শাক, কলমি শাক, পাট শাক, লাউ শাক ইত্যাদি।
- **ডাল মটরশুঁটি বীজ বিন** (Legumes) **:** মটরশুঁটি বরবটি শিম ডাল বাদাম (চীনাবাদাম আখরোট কাঠবাদাম কাজুবাদাম) সয়াবিন তিসি তিল এবং চিয়া বীজ, সূর্যমুখী বীজ, মিষ্টিকুমড়া বীজ ইত্যাদি।

৮. পানি

অক্সিজেনের পরই আমাদের শরীরের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ হলো পানি। আমাদের শরীরের শতকরা ৬৫ ভাগ অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশই পানি। মানবদেহের সমস্ত কোষ, কলা (টিস্যু) ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মূল গাঠনিক উপাদান পানি। পেশির শতকরা ৭৫-৮৮ ভাগ, হাড়ের ২০-২৫ ভাগ, রক্তের ৮৫-৯০ ভাগই পানি। এমনকি দাঁতেরও ৫ শতাংশ হচ্ছে পানি।

মাথা থেকে পা অবধি শরীরের প্রতিটি কোষের দৈনন্দিন স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া চলমান রাখার জন্যে পানি এক অপরিহার্য উপাদান। তাই শুধু তৃষ্ণা মেটাতেই নয়, সুস্থ জীবনের জন্যে পর্যাপ্ত পানি পান করুন।

পর্যাপ্ত পানি পান করুন

প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান আপনার ত্বককে করবে সজীব ও প্রাণবন্ত। ত্বকের জন্যে প্রসাধনীর চেয়েও পানি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পানি ত্বকের স্বাভাবিক কমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। পরিশ্রমজনিত অবসাদ, ক্লান্তি ও শ্রান্তি দূর করে।

মস্তিষ্কের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই পানি। শরীরে পানি স্বল্পতা হলে মাথা ঘোরা, মনোযোগহীনতা দেখা দেয়। প্রয়োজনীয় পানির অভাবে বিপাকক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়, শরীরে ফ্যাট জমে। পানি মস্তিষ্ককে রাখে উদ্দীপ্ত ও কর্মচঞ্চল। এ-ছাড়াও পানি ক্ষুধার অনুভূতি কমিয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

পানি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। পেশি ও কোষে প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়। ফুসফুসের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় রাখে। কিডনির সুস্থতার জন্যে পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ-ছাড়া কিডনিতে পাথর জমার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এবং দেহ থেকে সকল প্রকার ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দেয়। পানি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে, কোলন ও মূত্রথলির ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। তাই সুস্থ-নীরোগ দীর্ঘজীবনের জন্যে প্রতিদিন কমপক্ষে দুই লিটার পানি পান করুন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মুখ ধুয়ে খালি পেটে ৪-৬ গ্লাস পানি পানের অভ্যাস করুন। এরপর ৪৫ মিনিট কোনোকিছু খাবেন না বা পান করবেন না। এ-ছাড়া দিনের অন্যান্য সময়েও পর্যাপ্ত পানি পান করুন। তবে খাওয়ার ২০-৩০ মিনিট পর পানি পান করুন। এতে হজম ভালো হয়। আর তৃষ্ণা পেলে জুস বা কোমল পানীয় নয়, পানি পান করুন। কারণ পানিই সেরা পানীয়।

প্রাকৃতিক খাবারই শ্রেষ্ঠ খাবার

এ পর্যায়ে আমরা সুস্বাস্থ্যের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রাকৃতিক খাবার নিয়ে আলোচনা করব, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ খেয়ে আসছে ভালো থাকার জন্যে। এ-ছাড়াও বেশ কিছু জরুরি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা খাবার সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরো স্পষ্ট করবে। হৃদরোগ নিরাময় এবং প্রতিরোধের লক্ষ্যে পরিকল্পিত খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করা অনেক সহজ হবে।

ঘন সবুজ পত্রযুক্ত শাকসবজি

পুষ্টিবিজ্ঞানীরা মনে করছেন, পৃথিবী নামক এই গ্রহটির সবচেয়ে পুষ্টিকর ও সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার হচ্ছে ঘন সবুজ পত্রযুক্ত শাকসবজি (Dark Green Leafy Vegetables), যা নিউট্রিশনাল পাওয়ারহাউজ নামে পরিচিত। এতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন মিনারেল ফাইটোকেমিক্যাল ক্লোরোফিল ফাইবার (আঁশ)—যা একজন মানুষকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখে, দীর্ঘজীবী করে। লেটুস, পালং শাক, ব্রকোলি, বাঁধাকপি ও অন্যান্য ঘন সবুজ শাকসবজি ইত্যাদি এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। এর রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা :

সকল ঘন সবুজ শাকসবজিতে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা রয়েছে খুবই অল্প পরিমাণে। যারা ওজন কমাতে চান তাদের ক্ষেত্রে এটি চমৎকার ভূমিকা রাখতে পারবে। এতে রয়েছে ফাইটোকেমিক্যাল (বিটা ক্যারোটিন, ল্যুটিন এবং জিয়াক্স্যানথিন)—যা আমাদের দেহকোষকে সুরক্ষা দেয়, চোখের জ্যোতি বাড়ায়, ক্যাটারাক্ট বা ছানি প্রতিরোধ করে এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। এতে রয়েছে অল্প পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, যা অত্যন্ত উপকারী। আরো রয়েছে ক্লোরোফিল, যা রক্তকে অ্যালকালাইন বা ক্ষারীয় রাখতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে পর্যাপ্ত ফলিক এসিড যা হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও স্ট্রোক প্রতিরোধ করে। এ-ছাড়া এতে রয়েছে ভিটামিন ই এবং ভিটামিন সি, যা ত্বককে করে উজ্জ্বল, মসৃণ ও আকর্ষণীয়।

সুতরাং সুস্থ কর্মব্যস্ত দীর্ঘজীবনের জন্যে প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত সবুজ শাকসবজি রাখুন। সম্ভব হলে ৩-৪ ধরনের কাঁচা সবুজ পাতার জুস তৈরি করে প্রতিদিন এক গ্লাস 'গ্রিন জুস' পান করুন। আপনি দীর্ঘজীবী হবেন।

গ্রিন জুস তৈরি করে নিন সহজেই

ধনেপাতা, পুদিনা পাতা, লেটুস পাতা ও পালং শাক পরিমাণমতো নিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন, যাতে কোনো ময়লা বা জীবাণু না থাকে। পাতাগুলোর সাথে জনপ্রতি ৩-৪টি আমলকি ধুয়ে বীজ ফেলে ব্লেন্ডারে নিন। পরিমাণমতো পানি নিন। স্বাদের জন্যে এর সাথে অল্প আদা, জিরা, হিমালয়ান সল্ট/ বিট লবণ দিন। ব্লেন্ডিং শেষে ছেঁকে গ্লাসে নিন। তৈরি হয়ে গেল 'গ্রিন জুস'। চাইলে এতে অল্প লেবুর রস, মধু বা গুড় যোগ করতে পারেন। *(এ-ছাড়াও খাওয়া যায় এমন আরো সবুজ পাতা যোগ করতে পারেন।)*

পালং শাক

পপাই দ্য সেইলর ম্যান। বিটিভিতে একসময় প্রচারিত হতো এ কার্টুনটি। নায়ক পপাই যখন প্রতিপক্ষের কাছে মার খেয়ে হেরে যাওয়ার উপক্রম হতো তখন সে একটি টিনের কৌটা থেকে সবুজ রংয়ের কিছু একটা খেয়ে নিত। মুহূর্তেই সে হয়ে উঠত শক্তিশালী এবং প্রতিপক্ষকে নিমেষেই ঘায়েল করে ফেলত। পপাই যা খেত সেটা ছিল স্পিনাচ—আমাদের অতিপরিচিত পালং শাক। কী আছে এতে, যার জন্যে একে শক্তির উৎস হিসেবে দেখানো হয়েছে কার্টুনটিতে?

পালং অত্যন্ত পুষ্টিগুণসম্পন্ন সবজি। এতে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ফাইবার ও পানি। ফাইবার থাকার কারণে এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং পাইল্‌স বা অর্শরোগ ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

পালং-এ রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন, মিনারেল ও ফাইটোকেমিক্যাল। যেমন : ভিটামিন এ, সি, ই, বি$_{৬}$, বি$_{৯}$ (ফলিক এসিড) এবং ভিটামিন কে। আরো রয়েছে আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম। আর এ কারণে পালং রক্তের কোলেস্টেরল কমায়, হৃদরোগ ও স্ট্রোক প্রতিরোধ করে। এ-ছাড়া রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। পালং চোখের জন্যে উপকারী। পাশাপাশি এটি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময় ক্ষমতা বাড়ায়।

এতে রয়েছে বেশ কিছু এন্টি-অক্সিডেন্ট ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান, যা সুস্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। যেমন : ল্যুটিন কেমফেরল নাইট্রেট্স কুয়ারসেটিন এবং জিয়াক্স্যানথিন। এ উপাদানগুলো চোখের সুস্থতা, ক্যান্সার প্রতিরোধ, স্বাভাবিক রক্তচাপ এবং সুস্থ হৃৎপিণ্ডের জন্যে অত্যন্ত উপকারী।

পালং হচ্ছে একটি সুপার ফুড। পর্যাপ্ত পুষ্টিসম্পন্ন এ খাবারটি এককভাবে নিউট্রিশনাল পাওয়ারহাউজ নামেও পরিচিত। তাই নিয়মিত পালং খাওয়ার চেষ্টা করুন। কখনো রান্না করে খান, কখনো গ্রিন জুস হিসেবে পান করুন।

ব্রকোলি

ক্রুসিফেরাস গোত্রের একটি সবজি ব্রকোলি। একেও এককভাবে নিউট্রিশনাল পাওয়ারহাউজ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এতে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ফাইবার ভিটামিন (এ, সি, বি$_{৯}$) ও মিনারেল (পটাশিয়াম ও ফসফরাস) এবং ফাইটোকেমিক্যাল। এ কারণেই ব্রকোলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এটি চোখের জন্যে উপকারী এবং হাড় ও অস্থিসন্ধিকে মজবুত করে।

ব্রকোলিতে রয়েছে পর্যাপ্ত এন্টি-অক্সিডেন্ট, যেমন : সালফোরাফেন, ল্যুটিন এবং জিয়াক্স্যানথিন; যা শরীরের কোষগুলোকে ফ্রি-রেডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। রক্তের কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড ও সুগারের মাত্রা কমায়। ফলে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে।

ব্রকোলিতে রয়েছে বেশ কিছু বায়ো-একটিভ কম্পাউন্ড যা স্তন ক্যান্সার, প্রোস্টেট ক্যান্সার, পাকস্থলীর ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার, কিডনি ও মূত্রথলির ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। এটি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। এতে থাকা সালফোরাফেন দেহের বার্ধক্যগতিকে শ্লথ করার মাধ্যমে দীর্ঘজীবী করে। তাই বাজারে যতদিন পাওয়া যায়, প্রতিদিন ব্রকোলি খাওয়ার চেষ্টা

করুন। ব্রকোলি হালকা ভাপ দিয়ে বা রান্না করে অর্ধসেদ্ধ অবস্থায় খাওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি সুস্থ কর্মব্যস্ত ও দীর্ঘজীবনের অধিকারী হবেন।

বিটরুট

বিটরুট সাধারণ মানুষের কাছে বিট হিসেবে পরিচিত। এটি অত্যন্ত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন সবজি। এতে ক্যালরি রয়েছে খুব কম। পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেল।

এতে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট আঁশ ও ভিটামিন সি, বি$_৬$, বি$_৯$, এবং ম্যাগনেসিয়াম পটাশিয়াম ফসফরাস ম্যাঙ্গানিজ আয়রন।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বিটরুট কার্যকর। এতে রয়েছে অজৈব নাইট্রেটস, যা শরীরে ঢুকে নাইট্রিক অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। ফলে রক্তচাপ কমে। এ-ছাড়াও হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায় বিট।

বিটে রয়েছে প্রচুর আঁশ, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং ওজন কমাতে সহায়তা করে। এটি ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রষ্টতা প্রতিরোধ করে। এতে রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধী উপাদান। বিট নানাভাবে খাওয়া যেতে পারে—সালাদ, জুস বা চাটনি। এর পাতা শাক হিসেবেও খাওয়া হয়ে থাকে।

মটরশুঁটি

মটরশুঁটি সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এটি মূলত একপ্রকার বীজ/ দানাদার খাদ্য। এতে রয়েছে অসাধারণ পুষ্টিকর সব উপাদান। যেমন : কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফাইবার ও ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ভিটামিন বি$_১$, ভিটামিন বি$_৯$ (ফলিক এসিড) এবং ম্যাঙ্গানিজ আয়রন ফসফরাস।

মটরশুঁটিতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন বা আমিষ, যা থেকে ভেগান বা ভেজিটেরিয়ানদের প্রোটিনের চাহিদা সহজেই পূরণ হতে পারে। এতে থাকা পর্যাপ্ত ফাইবার বা আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। এ-ছাড়া প্রচুর আঁশ থাকার কারণে অল্প মটরশুঁটি খেলেই পেট ভরার অনুভূতি তৈরি হয়, যা ওজন কমাতে সাহায্য করবে।

মটরশুঁটিতে রয়েছে এন্টি-অক্সিডেন্ট পলিফেনল, যা ফ্রি-রেডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেহকোষকে রক্ষা করে। পর্যাপ্ত ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম থাকার কারণে মটরশুঁটি হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ করে। এ-ছাড়া এটি এলডিএল কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

মটরশুঁটি একটি লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI) খাবার হওয়ায় রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করে। এ-ছাড়া মটরশুঁটিতে রয়েছে স্যাপোনিন্‌স নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদজাত যৌগ, যা ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। সুতরাং সুস্বাস্থ্যের জন্যে খাদ্যতালিকায় মটরশুঁটি ও অন্যান্য বিন সংযুক্ত করুন। আপনি দীর্ঘজীবী হবেন।

ক্যাপসিকাম

ক্যাপসিকাম অত্যন্ত উপকারী একটি সবজি। এটি মূলত সালাদ হিসেবে খাওয়া হয়। এর রয়েছে বহুবিধ গুণাগুণ।

এতে রয়েছে ভিটামিন এ, ই, কে$_{১}$ এবং বি$_{৬}$ ও বি$_{৯}$ (ফলিক এসিড)। এতে আরো থাকে এন্টি-অক্সিডেন্ট, যা ক্ষতিকর ফ্রি-রেডিক্যালের হাত থেকে দেহকে সুরক্ষা দেয়। ক্যাপসিকাম ওজন কমাতেও সাহায্য করে। এন্টি-অক্সিডেন্ট ও ফাইটোকেমিক্যালের উপস্থিতির কারণে এটি দৃষ্টিস্বল্পতা ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। লাল ক্যাপসিকামে রয়েছে লাইকোপেন নামের ফাইটোকেমিক্যাল, যা হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখে। এতে আরো রয়েছে ভিটামিন সি, যা ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে। নিয়মিত ক্যাপসিকাম খেলে রক্তস্বল্পতা দূর হয়।

বীজ

বীজ অত্যন্ত পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য। শতবর্ষীদের বসবাস যে-সব অঞ্চলে, সেখানকার অধিবাসীদের নিয়মিত একটি খাবার হচ্ছে বীজ। এতে থাকে পর্যাপ্ত আঁশ, পলি-আনস্যাচুরেটেড ও মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেল এবং এন্টি-অক্সিডেন্ট। সহজলভ্য ও উপকারী বীজের মধ্যে তিসি চিয়া তিল মিষ্টিকুমড়া তরমুজ ও সূর্যমুখীর বীজ অন্যতম।

- ☐ চিয়া বীজে রয়েছে আঁশ, প্রোটিন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড। আরো রয়েছে ভিটামিন বি$_{১}$, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও এন্টি-অক্সিডেন্ট। এটি হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিরাময়ে সাহায্য করে।
- ☐ তিল অত্যন্ত সহজলভ্য এবং বহুল ব্যবহৃত একটি বীজ। এতেও রয়েছে আঁশ, মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, কপার, ম্যাঙ্গানিজ ও ম্যাগনেসিয়াম। নিয়মিত খেলে তিল হৃদরোগ ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে এবং রক্তের কোলেস্টেরল কমায়। এ-ছাড়াও এটি হাঁটুর বাতব্যথা কমায়।

- মিষ্টিকুমড়ার বীজে রয়েছে আঁশ, প্রোটিন, মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাস। এতে রয়েছে ফাইটোস্টেরলস, যা রক্তের কোলেস্টেরল কমায়। এ-ছাড়াও এটি স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।
- সূর্যমুখী বীজেও রয়েছে আঁশ, প্রোটিন, মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন ই, ম্যাঙ্গানিজ ও ম্যাগনেসিয়াম। এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল কমায়।

তিসি

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তিসি ব্যবহার করে আসছে। প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর ও চীনে এটি হারবাল ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এর রয়েছে বহুবিধ উপকারী শক্তি।

তিসিতে রয়েছে বেশ কিছু ভিটামিন (ভিটামিন বি$_১$, বি$_৬$) এবং মিনারেল (ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ফলেট, ফসফরাস ও পটাশিয়াম)।

তিসিতে রয়েছে প্রচুর ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড (আলফা লিনোলেনিক এসিড), যা আমাদের দেহের ইঞ্জিন অয়েল এবং আমাদের দেহের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্যে অত্যাবশ্যকীয়। তিসির ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড হৃদরোগ ও স্ট্রোক প্রতিরোধ করে।

তিসিতে রয়েছে লিগন্যান্স নামের একটি উপাদান, যা ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। বিশেষ করে প্রোস্টেট ও স্তন ক্যান্সার। এতে রয়েছে প্রচুর ফাইবার বা আঁশ, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং অর্শ বা পাইল্স ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। তিসিতে রয়েছে উচ্চমানের প্রোটিন বা আমিষ, যা ভেগানদের আমিষের চাহিদার একটি অংশ পূরণ করে।

তিসি রক্তের ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল কমাতে এবং উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে। এটি উচ্চ রক্তচাপ কমাতে ও রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এ-ছাড়া ওজন কমাতেও সাহায্য করে। তাই প্রতিদিন এক টেবিল চামচ করে তিসি খান। অবশ্যই চিবিয়ে, ভর্তা করে বা গুঁড়া করে খাবেন।

বাদাম

বাদাম খুব সহজলভ্য একটি খাবার। এটি আপনার হৃদযন্ত্রের জন্যে দারুণ উপকারী। একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, বাদাম হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়। বাদামে রয়েছে প্রচুর উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ভিটামিন মিনারেল ফাইবার বা আঁশ এবং এন্টি-অক্সিডেন্টের মতো প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান।

বাদামের শতকরা ৮০ ভাগই ফ্যাট। কিন্তু এ ফ্যাটের প্রায় পুরোটাই হলো শরীরের জন্যে উপকারী অসম্পৃক্ত চর্বি (আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট)। সে তুলনায় ক্ষতিকর সম্পৃক্ত চর্বির (স্যাচুরেটেড ফ্যাট) পরিমাণ খুবই নগণ্য। বাদামের এই অসম্পৃক্ত চর্বি উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ায় এবং ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায়।

বাদামে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এমাইনো এসিড এল-আরজিনিন, যা আমাদের ধমনীর দেয়ালকে সবল ও নমনীয় হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এ-ছাড়া এটি ধমনীর অভ্যন্তরে অযাচিত রক্ত জমাটবদ্ধতা (ব্লাড ক্লট) রোধ করে। ফলে ধমনীপথে স্বাভাবিক রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকে, কমে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি।

বাদামে রয়েছে কো-এনজাইম কিউ$_{১০}$। এটি একটি শক্তিশালী এন্টি-অক্সিডেন্ট। হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও পেশির স্বাভাবিক কাজ এবং খাদ্য থেকে দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনের জন্যে এটি দরকারি। শরীর নিজেই এটি নির্দিষ্ট মাত্রায় তৈরি করে। এ-ছাড়া বাদাম জাতীয় খাবার থেকেও আমরা কো-এনজাইম কিউ$_{১০}$ পেয়ে থাকি।

বাদামে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, যা মানব মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেক্স, শুক্রাণু, শুক্রাশয় ও চোখের রেটিনার প্রাথমিক গঠন-উপাদান হিসেবেও কাজ করে।

বাদামে রয়েছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন ই, যা দেহের স্বাভাবিক সুস্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ত্বক, চুল ও পেশির স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এ-ছাড়া বাদামে রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মিনারেল, যেমন : আয়রন ম্যাগনেসিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম জিংক কপার সেলেনিয়াম।

বিভিন্ন রকম বাদাম রয়েছে—চীনাবাদাম, পেস্তাবাদাম, কাজুবাদাম, কাঠবাদাম, আখরোট। বেশি উপকার পাওয়ার জন্যে বিভিন্ন রকম বাদাম মিশিয়ে প্রতিদিন ৫০ গ্রাম করে খাওয়ার চেষ্টা করুন। তবে লবণ মেশানো প্রক্রিয়াজাত বাদাম খাবেন না।

অন্যান্য বাদাম দামি হলেও সহজলভ্য ও সস্তা হচ্ছে চীনাবাদাম। অনেকেরই বাদাম খেলে পেটে গ্যাস হয় অথবা পেট ফুলে যেতে চায়। সে-ক্ষেত্রে বাদাম ৬-৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে খেলে এ সমস্যা হবে না। পৃথিবীর যে জনপদগুলোতে দীর্ঘায়ু মানুষের বসবাস, তাদের খাদ্যতালিকার একটি নিয়মিত উপাদান হচ্ছে বাদাম।

তবে হৃদরোগ নিরাময়ের লক্ষ্যে যারা ২ বছর রিভার্সাল ডায়েট অনুসরণ করবেন, এ সময়টাতে তাদের বাদাম খাওয়ার প্রয়োজন নেই।

সয়াবিন

সাম্প্রতিক সময়ে যে কয়েকটি খাদ্য নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে, সয়াবিন তার মধ্যে অন্যতম। সয়াবিন আমাদের কাছে ভোজ্য তেলের উৎস হিসেবে পরিচিত হলেও, নানা গবেষণা ও উপাত্তের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা একে একটি পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সয়াবিন হলো প্রোটিনের একটি সমৃদ্ধ উৎস। শরীরের জন্যে অতি প্রয়োজনীয় (এসেনশিয়াল) ৯টি এমাইনো এসিডের সবগুলোই রয়েছে এতে। এ-ছাড়া সয়াবিন থেকে তৈরি খাবার ও সয়াদুধে রয়েছে কোলস্টেরলমুক্ত অসম্পৃক্ত চর্বি (আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড) এবং হৃৎপিণ্ডের জন্যে উপকারী ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড।

সয়াবিন ও সয়াদুধ

এতে রয়েছে ভিটামিন এ, সি, ই, কে এবং ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (বি$_১$, বি$_২$, বি$_৩$, বি$_৫$, বি$_৬$, বি$_৯$)। রয়েছে প্রচুর আঁশ যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

সয়া পাউডার

সয়াবিন রক্তের উচ্চ কোলেস্টেরল, হৃদরোগ আর স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। এ-ছাড়া ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। সয়াবিন হাড়ক্ষয় প্রতিরোধ করে। মেনোপজ বা রজঃনিবৃত্তি-পরবর্তী জটিলতা দূর করে।

ক্যালসিয়ামের জন্যে যারা গরুর দুধ খান, তাদের ক্ষেত্রে সয়াদুধ হতে পারে গরুর দুধের সার্থক বিকল্প। সয়াদুধে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট সোডিয়াম পটাশিয়াম ফসফরাস ম্যাগনেসিয়াম ম্যাঙ্গানিজ কপার আয়রন জিংক ও ক্যালসিয়াম যা সম্পূর্ণ কোলেস্টেরলমুক্ত। বাজার থেকে সয়াবিন কিনে ঘরে নিজেই বানিয়ে নিতে পারেন সয়াদুধ।

সয়াদুধ তৈরির নিয়ম

২৫০ গ্রাম সয়াবিন ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর পানি ফেলে দিয়ে তাতে পুনরায় এক লিটার পানি মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন। ব্লেন্ডার না থাকলে পাটায় পিষে নিতে পারেন। দুধ তৈরি হলে পাতলা কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে নিন। এরপর কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল সয়াদুধ। সয়াদুধ গরম কিংবা ঠান্ডা যে-কোনোভাবে খেতে পারেন।

সয়াদুধের নিজস্ব কোনো ফ্লেভার নেই। তাই আপনার পছন্দমতো ফল কিংবা বাদাম মিশিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন মজাদার পানীয়।

এ-ছাড়াও সয়াবিন সবজিতে দিয়ে মটরশুঁটির মতো রান্না করে খেতে পারেন। অল্প পরিমাণ সয়াবিন ৪-৫ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ঘষে সয়াবিনের বাইরের আবরণটি তুলে ফেলে দিন। এরপর সয়াবিনগুলো সবজির মধ্যে দিয়ে রান্না করুন।

স্পিরুলিনা

স্পিরুলিনা হলো অতি ক্ষুদ্র আনুবীক্ষণিক নীলাভ-সবুজ সামুদ্রিক শৈবাল, যা শত শত বছর থেকে মানুষের জন্যে উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

স্পিরুলিনা শৈবাল

স্পিরুলিনা

এতে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন (প্রায় ৬০ ভাগ), যা সম্পূর্ণ কোলেস্টেরলমুক্ত। রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন (ভিটামিন এ, সি, ই, কে এবং ভিটামিন বি$_১$, বি$_২$, বি$_৩$, বি$_৫$, বি$_৯$)। রয়েছে মিনারেল (ক্যালসিয়াম আয়রন ম্যাগনেসিয়াম ম্যাঙ্গানিজ ফসফরাস পটাশিয়াম সোডিয়াম জিংক)। স্পিরুলিনা পাউডার, ট্যাবলেট এবং ক্যাপসুল হিসেবে পাওয়া যায়।

স্পিরুলিনায় থাকা উচ্চমাত্রার প্রোটিনে রয়েছে ১৮ ধরনের এমাইনো এসিড। উচ্চমাত্রার প্রোটিন, পর্যাপ্ত ভিটামিন ও মিনারেল থাকার কারণে এটি অত্যন্ত উপকারী। নিয়মিত সেবনে এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। ক্ষতিকর টক্সিন দূর করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। রক্তের এলডিএল কোলেস্টেরল ও উচ্চ রক্তচাপ কমায়। এটি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে ভূমিকা রাখে। অকালবার্ধক্য রোধ করে। সৃষ্টি করে মানসিক প্রফুল্লতা। তাই সুস্বাস্থ্যের জন্যে প্রতিদিন কমপক্ষে ২-৩টি স্পিরুলিনা ট্যাবলেট/ ক্যাপসুল খান।

মাশরুম

ইদানীং যে খাবারটি জীববিজ্ঞানী ও পুষ্টিবিদদের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে, সেটি হলো মাশরুম। মাশরুমে রয়েছে মাংস, পনির ইত্যাদি প্রাণিজ খাবারের সমান প্রোটিন। রয়েছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেল ও এন্টি-অক্সিডেন্ট যা মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে বহুগুণ।

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা মেডিকেল স্কুলের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মাশরুমে রয়েছে এসপিরিন-সদৃশ কিছু বৈশিষ্ট্য, যা হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়। শীতকালীন ফ্লু প্রতিরোধেও রয়েছে মাশরুমের ভূমিকা। এটি প্রোস্টেট ও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। এতে রয়েছে এন্টি-টক্সিন এসওডি, যা শরীরের ক্ষতিকর টক্সিন দূর করে। কাঁচা মাশরুম খাওয়া উচিত নয়। রান্না করে খাওয়াটাই সবদিক থেকে নিরাপদ।

ডিম

সাম্প্রতিককালে যে কয়টি খাবার নিয়ে মানুষের মনে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে ডিম অন্যতম। অনেকে ভয়ে ডিম খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন; অন্যদিকে কেউ কেউ দিনে একাধিক ডিম খাচ্ছেন। কোন পক্ষ সঠিক?

একটি বড় আকারের ডিমে রয়েছে প্রায় ৬ গ্রাম প্রথম শ্রেণির প্রোটিন এবং এতে রয়েছে ৯টি এসেনশিয়াল অ্যামাইনো এসিড। ডিমে কোলেস্টেরল রয়েছে প্রায় ১৮৬ মিলিগ্রাম এবং এর পুরোটাই রয়েছে কুসুমে। ডিমে রয়েছে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং বি$_{২}$, বি$_{৫}$,

বি৬, বি১২। এ-ছাড়া আছে আয়রন ফলেট ফসফরাস ম্যাঙ্গানিজ আয়োডিন কপার জিংক ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম ও সালফার। ডিম ভিটামিন ডি-এর একটি চমৎকার প্রাকৃতিক উৎস। তাই ডিমকে বলা হয় 'সুপার ফুড'।

ডিম চোখকে সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। এ-ছাড়াও ডিমের কুসুমে রয়েছে স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী কোলিন (choline), যা গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ডিমের কুসুমে রয়েছে ল্যুটিন ও জিয়াক্স্যানথিন, যা চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। এ-ছাড়াও ডিম উচ্চ রক্তচাপ ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। এর এন্টি-অক্সিডেন্ট ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে।

আমরা জেনেছি, ডিমে রয়েছে প্রায় ১৮৬ মিগ্রা কোলেস্টেরল। এটি নিয়েই আমাদের যত চিন্তা। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন ডিম খাওয়ার পরেও ৭০ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে এটি রক্তে ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায় না। আর ৩০ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পায় অল্প মাত্রায়।

তাই সুস্থ থাকলে অর্থাৎ হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও কিডনি জটিলতার কারণে চিকিৎসকের নিষেধ না থাকলে এবং রক্তের কোলেস্টেরল স্বাভাবিক মাত্রায় থাকলে প্রতিদিন কুসুমসহ একটি ডিম খান।

আপনি হৃদরোগী হলে দুই বছর ডিম খাওয়া বন্ধ রাখুন।

কলা

কলা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ফল। শহর-গ্রাম সর্বত্রই বছরব্যাপী পাওয়া যায় বলে এটি অধিকাংশ মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত। সব ধরনের কলাই পুষ্টিগুণে ভরপুর।

কলায় থাকে প্রচুর কর্বোহাইড্রেট প্রোটিন পটাশিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কপার ভিটামিন সি ও বি৬ এবং বহুবিধ এন্টি-অক্সিডেন্ট ও ফাইটোকেমিক্যাল। কলায় থাকে আঁশ, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

পাকা কলায় থাকে সুক্রোজ, ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ। প্রচুর সুগার (প্রাকৃতিক) থাকলেও কলা একটি লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI) ফুড। এতে রয়েছে পর্যাপ্ত পটাশিয়াম, যা হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক কর্মছন্দের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ-ছাড়াও পটাশিয়াম রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে।

তাই প্রতিদিনের খাবারে একটি পাকা কলা রাখুন। সাধারণভাবে প্রতিদিন একটি কলা খাওয়াই উত্তম। আর লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI) ফুড হওয়ায় ডায়াবেটিসের রোগীরা প্রতিদিন অথবা একদিন পর পর একটি ছোট আকৃতির কলা সকালের নাশতায় খেতে পারেন।

প্রো-বায়োটিক্স এবং টক দই (ইয়োগার্ট)

প্রো-বায়োটিক্স

আমাদের শরীরে রয়েছে প্রায় একশ ট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া। পরিপাকতন্ত্র, মুখ, নাক, ত্বক ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় তারা সহাবস্থান করে। এর মধ্যে কিছু ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে উপকারী এবং কিছু হচ্ছে ক্ষতিকর। উপকারী ও ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান আমাদেরকে সুস্থ রাখে।

কোনো কারণে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমে গেলে আমরা অসুস্থ হই। এসময় যদি কোনোভাবে শরীরে উপকারী ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করানো যায়, তখন তা মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে শরীর থেকে বের করে দেয় এবং ভারসাম্য পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সুস্থতা নিশ্চিত করে।

এই উপকারী জীবন্ত ব্যাকটেরিয়াকেই (সেইসাথে কিছু ঈস্ট) বলা হয় প্রো-বায়োটিক্স। সম্প্রতি কিছু কিছু রোগ নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রো-বায়োটিক্স সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক যে কয়টি খাবারে প্রো-বায়োটিক্স থাকে এর মধ্যে টক দই অন্যতম।

টক দই (ইয়োগার্ট)

দুধকে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ফারমেন্টেশন করার পর তৈরি হয় টক দই। বিশেষ উপকারী ব্যাকটেরিয়া যোগ করলে এগুলো দুধের ল্যাকটোজ নামের সুগারকে ফারমেন্ট করে ল্যাকটিক এসিড তৈরি করে, যা টক দইয়ের বিশেষ ঘ্রাণ তৈরি করে।

শত শত বছর থেকে মানুষ টক দই ব্যবহার করে আসছে। দুধ থেকে তৈরি হলেও এটি দুধের চেয়ে অনেক বেশি উপকারী। এটি ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে এবং ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। টক দই হজমশক্তি বাড়ায়, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আইবিএস) উপশম করে ও ডায়রিয়া প্রতিরোধ করে। টক দইয়ে রয়েছে প্রচুর ক্যালসিয়াম, যা হাড়ক্ষয় প্রতিরোধ করে ও হাড়কে শক্তিশালী করে।

এ-ছাড়াও টক দইয়ের প্রো-বায়োটিক্স ভিটামিন বি$_{১}$, বি$_{২}$, বি$_{৫}$, বি$_{৬}$, বি$_{১২}$, ভিটামিন কে এবং ফলিক এসিড তৈরি করে, যা হৃদরোগ প্রতিরোধ করে এবং গর্ভস্থ শিশুর এক ধরনের গঠনগত ত্রুটি প্রতিরোধ করে।

এতে রয়েছে পর্যাপ্ত ফসফরাস ম্যাগনেসিয়াম ও পটাশিয়াম, যা রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে এবং স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। এতে রয়েছে প্রথম শ্রেণির পর্যাপ্ত প্রোটিন, যা দেহের প্রোটিন বা আমিষের চাহিদা পূরণে সাহায্য করে।

টক দই উপকারী হলেও মিষ্টি দই কিন্তু ক্ষতিকর। মিষ্টি দইয়ে চিনি থাকায় তা ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বাড়ায় এবং স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। সুতরাং প্রতিদিন এক কাপ টক দই খাওয়ার অভ্যাস করুন।

হৃদরোগ নিরাময়ের জন্যে রিভার্সাল ডায়েটে টক দই খাওয়া যাবে না। তাই প্রথম দুই বছর টক দই খাবেন না। এরপর খেতে পারবেন।

আদা

রান্নার জন্যে অপরিহার্য একটি মসলা হলো আদা। আদা শুধু রান্নার স্বাদই বাড়ায় না; এতে রয়েছে এমন কিছু উপাদান, যা সুস্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এতে রয়েছে শক্তিশালী একটি প্রদাহ প্রতিরোধী (এন্টি-ইনফ্লামেটরি) ও এন্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান জিনজেরল, যা দেহকোষকে নানাভাবে রক্ষা করে। আদার জিনজেরল ক্যান্সার প্রতিরোধেও সক্ষম। শুধু কাঁচা আদাতেই রয়েছে এই জিনজেরল। এ-ছাড়া আদার এন্টি-অক্সিডেন্ট আলঝেইমার্স ডিজিজ প্রতিরোধে সাহায্য করে ও ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে। গলা বসা, ঠান্ডা লাগা, খুসখুসে কাশি ইত্যাদি পরিস্থিতিতে আদা দারুণ কার্যকর।

রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণেও আদার ভূমিকা রয়েছে। আদা রক্তের ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড কমাতে সাহায্য করে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। তাই নিয়মিত কাঁচা আদা খান। প্রতিদিন সকালে একমুঠ ভিজানো ছোলা, এক টুকরো আদা ও অল্প বিট লবণ সহযোগে খান। আপনার সুস্থতার পরিমাণ বাড়তে থাকবে।

রসুন

রান্নার স্বাদ-গন্ধ বৃদ্ধির জন্যে পৃথিবীর বহু দেশেই রসুন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, গ্রিস, রোম এবং চীনে ওষুধ হিসেবেও রসুন ব্যবহৃত হয়।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, রসুনের সালফার কম্পাউন্ডের মধ্যেই রয়েছে এর মূল ওষধি শক্তি, যা তৈরি হয় রসুন কাটা, থেঁতলানো বা চিবানোর সময়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এলিসিন। রসুন অত্যন্ত পুষ্টিকর, আবার ক্যালরির পরিমাণও এতে খুব কম। কাঁচা রসুনে রয়েছে ভিটামিন সি, বি$_১$ ও বি$_৬$ এবং ম্যাঙ্গানিজ সেলেনিয়াম ক্যালসিয়াম কপার পটাশিয়াম ফসফরাস আয়রন ও আঁশ।

কাঁচা রসুনের রয়েছে অগণিত উপকার। এটি ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে। সাধারণ সর্দি-ঠান্ডা ও ফ্লু প্রতিরোধ করে রসুন। এটি রক্তের ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় ও রক্ত তরল রাখতে সাহায্য করে। রসুনের রয়েছে এন্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য। ফলে তারুণ্য দীর্ঘায়িত হয়।

রসুন ন্যাচারাল এন্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে, তাই শরীরের যে-কোনো জায়গা কেটে গেলে রসুন খেলে তা দ্রুত শুকিয়ে যায়। রসুন হৃদরোগ ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

এ-ছাড়া রসুন আলঝেইমার্স ডিজিজ ও ডিমেনশিয়া প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং হাড়ক্ষয় প্রতিরোধ করে। তাই সুস্থ নীরোগ দীর্ঘায়ুর জন্যে প্রতিদিন ১-২ কোষ কাঁচা রসুন খাওয়ার অভ্যাস করুন।

মধু

প্রকৃতির আরেকটি আশ্চর্য শক্তিশালী পথ্য হলো মধু। এক টেবিল চামচ (২১ গ্রাম) মধুতে থাকে ৬৪ ক্যালরি। এতে থাকে গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ মাল্টোজ ও সুক্রোজ। মধুতে কোনো প্রোটিন, ফ্যাট বা ফাইবার নেই। তবে মধুতে রয়েছে কিছু ভিটামিন ও মিনারেল।

গুণগত মানসম্পন্ন প্রাকৃতিক মধুতে রয়েছে প্রচুর এন্টি-অক্সিডেন্ট (ফ্ল্যাভোনয়েডস), যা হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ও ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। মধু রক্তের ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড কমায় এবং উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরল বাড়ায়। এটি উচ্চ রক্তচাপ কমাতে কার্যকর। মধু দ্রুত ক্ষতস্থান শুকাতে সাহায্য করে। সর্দি-ঠান্ডা নিরাময়েও সাহায্য করে। মধু ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে। তাই প্রতিদিন ১-২ চা চামচ মধু খান।

কালোজিরা

কালোজিরা অত্যন্ত পুষ্টিকর একটি বীজ, যা প্রাচীনকাল থেকে বহুবিধ রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কালোজিরা সরাসরি চিবিয়ে, ভর্তা করে অথবা পিষে পাউডার করে খাওয়া যেতে পারে। বিস্ময়কর এ খাবারের কিছু পুষ্টিগুণ এখানে তুলে ধরা হলো :

কালোজিরাতে রয়েছে প্রচুর এন্টি-অক্সিডেন্ট, যা ফ্রি-রেডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেহকে সুরক্ষা দেয়। এ-ছাড়া এসব এন্টি-অক্সিডেন্ট ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও স্থূলতা প্রতিরোধে পারঙ্গম। কালোজিরাতে যে-সব এন্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায় তার মধ্যে থাইমোকুইনন, কারভ্যাক্রল, ট্যানেথল, ও ফোর-টারপিনিয়ল অন্যতম। কালোজিরার তেলেও রয়েছে প্রচুর এন্টি-অক্সিডেন্ট।

কালোজিরা রক্তের ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড কমায় এবং উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরল বাড়ায়। কালোজিরা কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে সাহায্য করে।

কালোজিরা লিভারকে বিভিন্ন ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। এটি ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে রক্তের সুগার কমাতে সাহায্য করে, পাকস্থলীর ঘা প্রতিরোধ করে এবং ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে। তাই প্রতিদিন অল্প পরিমাণ কালোজিরা দানা চিবিয়ে অথবা গুঁড়ো বা ভর্তা করে খাওয়ার অভ্যাস করুন।

লেবু পানি

সকালে ঘুম থেকে উঠেই অনেকে খালি পেটে এক গ্লাস হালকা গরম পানিতে একটি লেবুর রস মিশিয়ে পান করে থাকেন। এর সাথে এক চা-চামচ মধুও যোগ করে থাকেন কেউ কেউ। এই লেবু পানি কিন্তু শরীরের জন্যে দারুণ উপকারী।

প্রথমত, লেবু পানি আপনার পানির চাহিদা পূরণে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত, প্রতিদিন কমপক্ষে দুই লিটার পানি পান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লেবু পানিতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি, যা অত্যন্ত শক্তিশালী এন্টি-অক্সিডেন্ট। এটি দেহকোষকে ফ্রি-রেডিক্যালের হাত থেকে রক্ষা করে।

ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং সাধারণ সর্দি-ঠান্ডা ও ফ্লু থেকে প্রতিরক্ষা দেয়। এ-ছাড়া এটি রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

শান্তি ও রসায়নে দুবারের নোবেল জয়ী খ্যাতিমান মার্কিন বিজ্ঞানী ড. লিনাস পলিং তার দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণ করেন, ক্রমাগত ভিটামিন সি-র অভাবে করোনারি ধমনীতে ব্লকেজ সৃষ্টি হয় এবং উচ্চ রক্তচাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী তার প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি নিজেই তৈরি করতে পারে। ব্যতিক্রম শুধু মানুষ, গিনিপিগ ও একটি বিশেষ প্রজাতির বাদুড়। তাই প্রতিদিন পর্যাপ্ত ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল খাওয়া উচিত।

লেবু পানি ওজন কমাতে সক্ষম। এটি কিডনিতে পাথর হওয়া প্রতিরোধ করে। ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। লেবুতে রয়েছে লিমোনিন ও ন্যারিঞ্জিন, যা ক্যান্সার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে। লেবু পানি হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। ত্বককে করে তোলে মসৃণ উজ্জ্বল আকর্ষণীয়। এ-ছাড়া এটি ত্বকে ভাঁজ পড়া প্রতিরোধ করে।

তাই প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস হালকা গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন। প্রয়োজনে এতে মধু/ আদা কুচি/ দারুচিনি মেশাতে পারেন। যেহেতু লেবু পানি এসিডিক বা অম্লীয়, এটি দাঁতের সংস্পর্শে এলে এনামেলের ক্ষতি হতে পারে, তাই লেবু পানি পান করতে স্ট্র ব্যবহার করুন অথবা পান করার পর কুলি করে ফেলুন।

মিষ্টি আলু

মিষ্টি আলুতে রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন, মিনারেল ও এন্টি-অক্সিডেন্ট। এতে রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি৩, বি৫, বি৬ এবং পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, কপার—যা দেহকোষগুলোকে ক্ষতিকর ফ্রি-রেডিক্যালের হাত থেকে রক্ষা করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

এতে রয়েছে প্রচুর ফাইবার বা আঁশ, যা কোষ্ঠকাঠিন্য ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। বেগুনি রঙের মিষ্টি আলুতে রয়েছে অ্যানথোসায়ানিন্‌স নামের এন্টি-অক্সিডেন্ট যা মূত্রথলি, কোলন, পাকস্থলী ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

মিষ্টি আলুতে রয়েছে এন্টি-অক্সিডেন্ট বিটা-ক্যারোটিন, যা শরীরে ঢুকে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়। ভিটামিন এ চোখের নানাবিধ রোগ প্রতিরোধ করে। এ-ছাড়াও মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়াতে ভূমিকা রাখে। তাই সুযোগ পেলেই খাদ্যতালিকায় মিষ্টি আলু সংযোজন করুন।

ডাব

ডাব আমাদের দেশের অত্যন্ত পরিচিত, সহজলভ্য ও পুষ্টিকর পানীয়। এতে রয়েছে প্রচুর মিনারেল। ডাবের ৯৪ শতাংশই হলো পানি। এতে ফ্যাট থাকে খুব কম। ডাবের পানিতে থাকে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট (ফ্রুকটোজ, গ্লুকোজ, সুক্রোজ) এবং ফাইবার বা আঁশ। এ-ছাড়া রয়েছে ভিটামিন-সি ম্যাগনেসিয়াম ম্যাঙ্গানিজ পটাশিয়াম সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম।

গবেষণায় দেখা গেছে, ডাবের পানি রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ও কিডনিতে পাথর জমতে বাধা দেয়। ডাবের পানি রক্তের কোলেস্টেরল

কমাতে ভূমিকা রাখে, রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে এবং ধমনীর ভেতর রক্ত জমাটবাঁধার প্রবণতা কমায়। দৈনন্দিন ব্যায়ামের পর কচি ডাবের পানি দেহের ইলেক্ট্রোলাইট ও পানিশূন্যতা দূর করতে সাহায্য করে। ১০০ মিলি ডাবের পানিতে রয়েছে ২৫০ মিগ্রা পটাশিয়াম এবং ১০৫ মিগ্রা সোডিয়াম। তাই ডায়রিয়ার চিকিৎসায় ডাবের পানি একটি উৎকৃষ্ট পানীয়।

সম্ভব হলে প্রতিদিন একটি কচি ডাবের পানি পান করুন। বিশেষ করে দীর্ঘভ্রমণের পূর্বে ও পরে, ব্যায়াম এবং অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের পরে এবং ডায়রিয়ার চিকিৎসায়। আপনি সারাদিন চাঙ্গা থাকবেন।

খেজুর

খেজুর আমাদের অতিপরিচিত ও প্রিয় একটি ফল। পবিত্র রমজান মাসে সারাদিন রোজা রেখে ইফতার করার সময় অধিকাংশের ক্ষেত্রে খেজুর একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এটি প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যের খাবার হলেও এ দেশে বেশ জনপ্রিয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খেজুরের জনপ্রিয়তা অনেক বেড়েছে। এদেশে উৎপাদনও শুরু হয়েছে।

শুকনো খেজুরে থাকে অনেক বেশি ক্যালরি। এই ক্যালরির অধিকাংশই আসে কার্বোহাইড্রেট থেকে। তবে লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ফুড হওয়ায় রক্তের সুগার লেভেল হঠাৎ বৃদ্ধি পায় না। এ-ছাড়াও থাকে প্রোটিন ভিটামিন বি$_৬$ ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কপার ম্যাঙ্গানিজ ও আয়রন। এতে রয়েছে প্রচুর আঁশ, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং কোলন ক্যান্সার ও পাইল্‌স প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ-ছাড়া আঁশ রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

এতে আছে একাধিক এন্টি-অক্সিডেন্ট—ফ্ল্যাভোনয়েডস, ফেনোলিক এসিড ও ক্যারোটিনয়েডস, যা ক্ষতিকর ফ্রি-রেডিক্যাল থেকে দেহকে রক্ষা করে, যৌবন দীর্ঘায়িত করে, সুস্থতা বজায় রাখে। এ-ছাড়া এই এন্টি-অক্সিডেন্ট হৃদরোগ, ক্যান্সার ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সাহায্য করে।

খেজুর শরীরে প্রদাহ কমায়, ব্যথার অনুভূতি হ্রাস করে এবং ব্রেনের রক্তনালীতে ব্লকেজ তৈরিতে বাধা দেয়। ফলে বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিশক্তি কমে যায় যে রোগে, সেই আলঝেইমার্স ডিজিজ প্রতিরোধে সাহায্য করে। খেজুরে রয়েছে প্রাকৃতিক মিষ্টি উপাদান ফ্রুক্টোজ, যা হতে পারে চিনির উত্তম বিকল্প। কেননা ফ্রুক্টোজের সাথে এতে রয়েছে ভিটামিন, মিনারেল ও এন্টি-অক্সিডেন্ট। সুস্থ কর্মময় দীর্ঘজীবনের জন্যে প্রতিদিন দুটি করে খেজুর খান।

গ্রিন টি

গ্রিন টি পৃথিবীর অন্যতম স্বাস্থ্যকর পানীয়। এতে এন্টি-অক্সিডেন্ট ইজিসিএইচ রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে, যা চায়ের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান। এর উপস্থিতি গ্রিন টি-কে ওষধি পানীয়তে পরিণত করেছে।

এ-ছাড়াও গ্রিন টি-তে রয়েছে পলিফেনল, যা শরীরে ফ্রি-রেডিক্যাল তৈরিতে বাধা দেয়, ফলে দেহকোষগুলো সুরক্ষা পায়। গ্রিন টি-তে রয়েছে এমন কিছু উপাদান, যা ব্রেনকে উদ্দীপ্ত করে। ফলে শরীরে চাঙ্গা ভাব আসে। এর মধ্যে ক্যাফেইন এবং এল-থিয়ানিন অন্যতম।

গ্রিন টি স্তন ক্যান্সার, প্রোস্টেট ক্যান্সার ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং আলঝেইমার্স ডিজিজ প্রতিরোধ করে।

গ্রিন টি ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বাড়ায় এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমায়। এতে রক্তের সুগার লেভেল কমে আসে। ফলে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে। এ-ছাড়া গ্রিন টি টোটাল কোলেস্টেরল ও ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল কমায়, উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরল বাড়ায়। ফলে কমে আসে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি। গ্রিন টি মেটাবলিক রেট বা বিপাকক্রিয়ার হার বাড়ায় এবং শরীরের জমানো ফ্যাট পোড়াতে সাহায্য করে। সুতরাং দিনে ২-৩ কাপ গ্রিন টি ওজন কমাতে সাহায্য করবে।

গ্রিন টির সাথে রয়েছে দীর্ঘজীবনের সম্পর্ক। ৪০,৫৩০ জন জাপানির ওপর ১১ বছর গবেষণা করে দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন ৪-৫ কাপ গ্রিন টি পান করেছেন, তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং প্রতিদিন ৩-৪ কাপ গ্রিন টি পান করুন।

অ্যাপল সাইডার ভিনেগার

শত শত বছর ধরে মানুষ অ্যাপল সাইডার ভিনেগার ব্যবহার করে আসছে রান্নায় এবং ওষুধ হিসেবে। এর রয়েছে নানা উপকারী দিক।

অ্যাপল সাইডার ভিনেগারের প্রধান উপাদান ৫-৬% এসিটিক এসিড। ফিল্টার ছাড়া অরগানিক ভিনেগারে আরেকটি উপাদান থাকে—'মাদার'। এই 'মাদার'-এ থাকে প্রোটিন, এনজাইম এবং কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া। এই এসিটিক এসিডই ভিনেগারের বিশেষ গন্ধ ও স্বাদের জন্যে দায়ী এবং এটির রয়েছে বিশেষ উপকারী দিক। এ-ছাড়াও অ্যাপল সাইডার ভিনেগারে রয়েছে কিছু পটাশিয়াম, এমাইনো এসিড ও এন্টি-অক্সিডেন্ট।

এই এসিটিক এসিড ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস এবং বংশবিস্তার রোধ করতে পারে। এ-ছাড়াও এটি জীবাণুনাশক এবং প্রাকৃতিক প্রিজারভেটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে অ্যাপল সাইডার ভিনেগার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়। ভিনেগার ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বাড়ায়, ফলে রক্তে সুগারের মাত্রা কমে। গবেষণায় দেখা গেছে, রাতে শোয়ার আগে দুই টেবিল চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনেগার পান করলে পরদিন ফাস্টিং ব্লাড সুগার কমে ৪%।

অ্যাপল সাইডার ভিনেগার পান করলে পেট ভরে যাওয়ার অনুভূতি হয়, ফলে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের প্রবণতা কমে। এতে দ্রুত ওজন কমে। বিভিন্ন প্রাণীর ওপর পরীক্ষায় দেখা গেছে, এ ভিনেগার রক্তের কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে; সুতরাং এটি রাতে এক টেবিল চামচ পরিমাণ এক গ্লাস পানিতে মিশিয়ে নিয়মিত পান করুন।

ফাস্ট ফুড ও কোমল পানীয়

রসনাকে পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে যে কয়টি খাবার ও পানীয়কে মানুষ তার জীবনের অংশ করে নিয়েছে, তার অন্যতম হলো ফাস্ট ফুড বা জাংক ফুড এবং কোমল পানীয়।

ফাস্ট ফুডকে বলা হয় টেস্টি পয়জন বা সুস্বাদু বিষ। এর প্রভাবে প্রতিবছর গড়ে ৪০ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে বিশ্বজুড়ে। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে নানা দুরারোগ্য রোগে। ফাস্ট ফুডের জনপ্রিয়তা এখন শুধু পাশ্চাত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বব্যাপী এর জয়জয়কার। আসুন আমরা জানার চেষ্টা করি এর আদ্যোপান্ত।

ফাস্ট ফুড বা জাংক ফুড

প্রক্রিয়াজাত-প্যাকেটজাত সকল খাবারই হচ্ছে ফাস্ট ফুড। এটি অত্যন্ত সুস্বাদু, দৃষ্টিনন্দন, সুঘ্রাণে ভরা। এতে থাকে প্রচুর চিনি লবণ তেল চর্বি এডিক্টার টেস্টার ফ্যাটেনার। এটি খুব দ্রুত পরিবেশন করা যায়। যেমন : বার্গার পিৎজা হটডগ পেস্ট্রি চিপস ক্র্যাকার্স কুকিজ সসেজ হ্যাম এবং ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিকেন ফ্রাই ইত্যাদি। ফাস্ট ফুড কেন ক্ষতিকর?

ফাস্ট ফুডে থাকে প্রচুর চিনি এবং রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট (সাদা ময়দা)। ফলে হজম শেষে অতিরিক্ত গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করে। ইনসুলিনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ রক্ত থেকে কোষে প্রবেশ করে এবং বিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ প্রথমে গ্লাইকোজেন এবং একপর্যায়ে ট্রাইগ্লিসারাইড (বডি ফ্যাট) হিসেবে লিভার, পেশি এবং পেটের মধ্যে জমা হতে থাকে। ফলে দেখা দেয় স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিস।

ফুড প্রসেসিং অর্থাৎ খাবার প্রক্রিয়াজাত করার সময় ভোজ্য তেল থেকে একটি নতুন ফ্যাট তৈরি হয়, যার নাম ট্রান্স ফ্যাট। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি ফ্যাট। ভোজ্য তেলের পার্শিয়াল হাইড্রোজেনেশনের ফলে সৃষ্ট এই ট্রান্স ফ্যাট ক্রমাগত শরীরে প্রবেশের ফলে রক্তের ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পায়, উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরল কমে যায় এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিস, স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

ফাস্ট ফুড অত্যন্ত সুস্বাদু হওয়ার অন্যতম কারণ প্রচুর লবণ। তেল ও চিনির সাথে লবণ যোগ হয়ে খাবারকে সুস্বাদু করে তোলে। লবণে থাকে সোডিয়াম। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সোডিয়াম শরীরে অতিরিক্ত পানি ধরে রাখে। ফলে শরীরে একটি ফোলা ফোলা ভাব চলে আসে ও একপর্যায়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং হার্টের ওপর চাপ প্রয়োগ করে হার্টের ক্ষতি করে।

ফাস্ট ফুডে বাড়ে অ্যাজমার ঝুঁকি। গবেষণায় দেখা গেছে, যে-সব শিশু সপ্তাহে কমপক্ষে তিন বার ফাস্ট ফুড খেয়েছে তাদের অ্যাজমায় আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। ফাস্ট ফুড শিশুর আইকিউ দুর্বল করে দিতে পারে। বিশেষত বয়স তিন বছর হওয়ার আগে থেকেই যে-সব শিশু চিপস পিৎজা বার্গার পেস্ট্রি ইত্যাদি খেতে শুরু করে, তাদের আইকিউ কমতে থাকে। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী চার হাজার স্কটিশ শিশুর ওপর চালানো এ গবেষণার ফলাফল দেখে বিজ্ঞানীরা বলেন, ফাস্ট ফুড খাওয়ার ফলে শিশুর মস্তিষ্কের ক্ষমতা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

প্রজনন ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফাস্ট ফুড। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ফাস্ট ফুডে রয়েছে থ্যালেইটস নামের একটি কেমিক্যাল, যা সেক্স-হরমোনের স্বাভাবিক কাজে বাধা প্রদান করে। তাই নিয়মিত ফাস্ট ফুড খেলে প্রজনন হার কমে যাওয়ার পাশাপাশি বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে।

ফাস্ট ফুড খাওয়ার ফলে টিন-এজারদের ব্রন ও একজিমা হতে পারে। এর পেছনে মূল কারণ ফাস্ট ফুডের অতিরিক্ত চিনি ও রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট। এর আরেকটি ক্ষতিকর প্রভাব হচ্ছে দাঁতের ক্যাভিটি (গর্ত) তৈরি এবং হাড় ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া। প্রক্রিয়াজাত খাবার হওয়ার কারণে এতে নেই কোনো ভিটামিন, মিনারেল ও ফাইটোকেমিক্যাল। উপরন্তু এটি নানাবিধ রোগের জন্ম দেয় এবং ইমিউন সিস্টেমকে দুর্বল করে তোলে। ফলে ফাস্ট ফুড-প্রেমীরা সহজেই রোগাক্রান্ত হন, বিশেষ করে ফ্লু জাতীয় রোগে।

খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ফাইবার বা আঁশ, যা ফাস্ট ফুডে প্রায় অনুপস্থিত। যার ফলে হতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য, পাইল্‌স, এনাল ফিশার, রেকটাল প্রোলাপ্‌স, কোলন ক্যান্সার ইত্যাদি। ফাস্ট ফুডের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে স্থূলতা। স্থূলতার প্রভাব শরীরে সর্বব্যাপী। হৃদরোগ, কোলন ক্যান্সার, পাকস্থলীর ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস,

আর্থ্রাইটিস, স্ট্রোক এমনকি বন্ধ্যাত্বের সাথে স্থূলতার সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রক্রিয়াজাত মাংসকে গ্রুপ-১ কার্সিনোজেন (ক্যান্সার সৃষ্টিতে সক্ষম) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। হট ডগ, সালামি, বেকন, হ্যাম ইত্যাদি তৈরিই হয় প্রক্রিয়াজাত মাংস দিয়ে।

কোমল পানীয়

কোমল পানীয় একটি তরল বিষ, যা পৃথিবীজুড়ে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নামে কোমল হলেও হিংস্রতায় কঠিন এই পানীয়টি হতে পারে কিডনি রোগ, স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, টাইপ-২ ডায়াবেটিস ও ক্যান্সারের কারণ। কীভাবে?

ইথিলিন গ্লাইকল ॥ আর্সেনিক-সদৃশ বিষ!

ফ্রিজে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তার কম তাপমাত্রায় কোনো তরল দীর্ঘক্ষণ রাখলে তা জমে বরফ হয়ে যায়। কিন্তু কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকসের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। কারণ এগুলোতে এন্টি-ফ্রিজার হিসেবে মেশানো হয় একটি রাসায়নিক উপাদান—ইথিলিন গ্লাইকল। এটি মানবদেহের জন্যে স্বল্পমাত্রার আর্সেনিকের মতোই বিষ। মূলত শিল্পকারখানায় ব্যবহারযোগ্য হলেও বর্ণ ও গন্ধহীন স্বচ্ছ এ উপাদানটি বিভিন্ন পানীয়ে এন্টি-ফ্রিজার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে হরদম। গবেষকদের মতে, ইথিলিন গ্লাইকল মানবদেহে নীরব বিষক্রিয়া ঘটায়। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, লিভার, কিডনির জটিলতা এমনকি দীর্ঘমেয়াদে কিডনি বৈকল্য পর্যন্ত ঘটাতে পারে এ উপাদান।

ইথিলিন গ্লাইকলের পাশাপাশি কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকসে মেশানো হয় কিছু কৃত্রিম রঙ, যেমন : টারট্রাজিন, কারমোসিন, ব্রিলিয়ান্ট ব্লু, সালফেট ইয়েলো ইত্যাদি। নরওয়ে সুইডেন ফিনল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে এগুলো বিক্রয় নিষিদ্ধ। কারণ এ উপাদানগুলো ক্যান্সার সৃষ্টির জন্যে দায়ী।

কোমল পানীয় এসিডিক বা অম্লীয় (pH ২.৪ থেকে ২.৮ এর মধ্যে)। ফলে দীর্ঘদিন পান করলে তা দাঁত ও হাড়সহ শরীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতিসাধন করে। ঝাঁঝালো স্বাদের জন্যে এতে মেশানো হয় ফসফরিক এসিড, যা দাঁতের এনামেল আর শরীরের হাড়ের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত। পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোমল পানীয় ভর্তি বোতলে একটি দাঁত ফেলে রেখে দিলে তা ১০ দিনের মধ্যে পুরোপুরি গলে যায়। ব্রিটিশ ডেন্টাল এসোসিয়েশনের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, প্রতিবার কোমল পানীয় গ্রহণের প্রায় একঘণ্টা পর্যন্ত দাঁতের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব বজায় থাকে।

নিয়মিত কোমল পানীয় পানের ফলে শরীর থেকে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান মূত্রের সাথে বেরিয়ে যায়। ফলে বাড়তে থাকে হাড়ক্ষয়ের সম্ভাবনা এবং হাইপোথাইরয়েডিজম (থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কার্যকারিতা কমে যাওয়া)।

কোমল পানীয় এক ধরনের আসক্তি সৃষ্টি করে। এর প্রধান কারণ উচ্চ মাত্রার ক্যাফেইন। এই ক্যাফেইন মাদকের মতোই আসক্তিকর। এজন্যে এগুলো একবার পান করলে বার বার পান করতে ইচ্ছে হয়। অতিরিক্ত ক্যাফেইন শরীরের স্বাভাবিক হৃদস্পন্দনকেও বাধাগ্রস্ত করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত ক্যাফেইন গর্ভপাত, নির্দিষ্ট সময়ের আগে প্রসব, কম ওজনের সন্তান প্রসব ও গর্ভস্থ শিশুর জন্মগত ত্রুটি ঘটানোর মতো জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এ-ছাড়াও মূত্রাশয় ও পাকস্থলীর ক্যান্সারসহ কমপক্ষে ছয় ধরনের ক্যান্সার ও উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ এই অতিরিক্ত ক্যাফেইন।

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, কোমল পানীয়কে সুস্বাদু করার জন্যে প্রতি বোতল কোমল পানীয়তে মেশানো হয় গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ফ্রুকটোজ ইত্যাদি সুগার, যার পরিমাণ প্রায় ৩৭ গ্রাম বা প্রায় ১০ চা চামচ চিনির সমান। আর রক্তে যে পরিমাণ সুগার থাকে তার পরিমাণ মাত্র এক চা চামচ চিনির সমান।

ফলে দেখা যাচ্ছে, এক বোতল বা এক ক্যান কোমল পানীয় পানের ফলে রক্তে সুগারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় প্রায় ১০ গুণ। এই অতিরিক্ত চিনি বা সুগার স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও টাইপ-২ ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, গলব্লাডারে পাথর, উচ্চ রক্তচাপ এবং অকালমৃত্যুর কারণ হতে পারে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এসব চিনিযুক্ত পানীয় বা সুগারি ড্রিংক কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। বলা হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের কোলা, সোডা বা চিনিযুক্ত পানীয় যারা নিয়মিত পান করেন, তাদের কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে ৩৩% বেশি।

একালের প্রখ্যাত মার্কিন গবেষক, বক্তা ও টিভি ব্যক্তিত্ব মার্ক পেন্ডারগ্রাস্ট। ২০০০ সালে প্রকাশিত তার একটি বই *ফর গড কান্ট্রি এন্ড কোকাকোলা*। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতে রচিত এ বইটিতে কোকাকোলাসহ অন্যান্য কোমল পানীয়ের অনেক অজানা দিক উন্মোচন করেন পেন্ডারগ্রাস্ট। তিনিই প্রথমবারের মতো বলেন, কোকাকোলার ফর্মুলায় এলকোহলের উপস্থিতি রয়েছে। তার ভাষায়, 'শিশুরাও মদ খাচ্ছে! কারণ মা-বাবারা তাদের হাতে কোকের গ্লাস তুলে দিচ্ছেন'।

মালয়েশিয়াভিত্তিক ভোক্তাদের সংগঠন 'উটুসান কনজ্যুমার' থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'কোকে রয়েছে এলকোহল, তাই মুসলমানদের জন্যে এটি সম্পূর্ণ হারাম'।

এখানেই শেষ নয়। মার্ক পেন্ডারগ্রাস্টের মতে, কোকাকোলার আরেকটি উপাদান গ্লিসারিন। কোকাকোলা কোম্পানিও তাদের পানীয়ে গ্লিসারিন থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেন নি। গ্লিসারিন হচ্ছে তেল ও চর্বির উপজাত, যা ব্যবহৃত হয় সাবান তৈরিতে। অনেকেরই আশঙ্কা, মুসলমানদের জন্যে নিষিদ্ধ বা হারাম প্রাণী থেকেও এ চর্বি সংগৃহীত হতে পারে। নবীজী (স) বলেন, 'যা বৈধ তা সুস্পষ্ট, যা অবৈধ সেটাও সুস্পষ্ট। কিন্তু সন্দেহজনক জিনিস যা অনেক মানুষই জানে না, সেগুলো থেকে যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, সে তার ধর্ম ও সম্মানকে নিষ্কলুষ রাখে'। *(বোখারী ও মুসলিম)*

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাজারে প্রচলিত কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস-সহ সব ধরনের প্রক্রিয়াজাত পানীয় এবং প্যাকেটজাত ও বোতলজাত জুস—সবই আসলে কমবেশি একই উপাদান দিয়ে তৈরি। আর এসব পানীয়তে বর্ণ, গন্ধ ও প্রিজারভেটিভ হিসেবে যা ব্যবহৃত হয়, তার অধিকাংশই মানবদেহের জন্যে ক্ষতিকর ও নীরব ঘাতক। তাই ফাস্ট ফুড বা জাংক ফুড, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস, প্যাকেটজাত বা বোতলজাত জুস পুরোপুরি পরিহার করুন। আপনি সুস্থ থাকবেন ও দীর্ঘজীবী হবেন।

সুস্বাস্থ্যের জন্যে দেহে বজায় রাখুন অ্যালকালাইন বা ক্ষারীয় অবস্থা

আমরা জানি, পানির pH মান হলো ৭.০০ যা নিউট্রাল। যদি কোনোকিছুর pH ৭.০০ এর বেশি হয়, তবে তা এলকালাইন বা ক্ষারীয় এবং pH ৭.০০ এর কম হলে তা এসিডিক বা অম্লীয়। মানবদেহের রক্ত কিছুটা এলকালাইন বা ক্ষারীয় (pH : ৭.৩৫-৭.৪৫)। অন্যদিকে পাকস্থলী হচ্ছে এসিডিক বা অম্লীয় (pH : ৩.৫ অথবা এর নিচে), যা হজমের জন্যে প্রয়োজন। হাইড্রোক্লোরিক এসিডের কারণেই পাকস্থলীর pH এত কম।

যেহেতু মানুষের রক্ত হচ্ছে ক্ষারীয় এবং সেই রক্ত আমাদের দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে, তাই দেহের সর্বত্র ক্ষারীয় অবস্থা বিরাজমান। এ কারণে অ্যালকালাইন বা ক্ষারীয় অবস্থায় দেহের ইমিউন সিস্টেম সুন্দরভাবে কাজ করে। আর এসিডিক বা অম্লীয় অবস্থায় দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই দেহের এই ক্ষারীয় অবস্থা বজায় রাখতে সচেতন হতে হবে।

দেহের জন্যে এই কাঙ্ক্ষিত অ্যালকালাইন বা ক্ষারীয় অবস্থা বজায় রাখতে খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। এ কারণেই জানতে হবে, কোন কোন খাবার ক্ষারীয় এবং কোন কোন খাবার অম্লীয় অবস্থা তৈরি করে।

যে-সব খাবার অ্যালকালাইন বা ক্ষারীয় অবস্থা তৈরি করে	যে-সব খাবার এসিডিক বা অম্লীয় অবস্থা তৈরি করে
সব ধরনের শাকসবজি, অধিকাংশ ফল, পালং শাক, ব্রকোলি, সালাদ, টমেটো, ডাল, বিন, বীজ, জলপাই, ওটস, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মসলা, স্পিরুলিনা, টক দই, গুড়	মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, পনির, চিনি, লেবু, মধু, কফি, লবণ, বার্গার, নুডল্‌স, চকলেট, স্যান্ডউইচ, সাদা পাস্তা, আইসক্রিম, চিকেন ফ্রাই, ভাত ও রুটি, কোমল পানীয়, পেস্ট্রি ও কেক, চিপস ও ক্র্যাকার্স, ভাজাপোড়া খাবার, চিনিযুক্ত জুস ও ড্রিংকস, প্রক্রিয়াজাত সকল খাবার

কাঙ্ক্ষিত ক্ষারীয় অবস্থা বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজন

- ☐ প্রতিদিন একঘণ্টা ব্যায়াম
- ☐ প্রতিদিন নিয়মিত প্রাণায়াম
- ☐ প্রতিদিন দুবেলা মেডিটেশন
- ☐ অ্যালকালাইন বা ক্ষারীয় অবস্থা তৈরি করে এমন খাবার বেশি খাওয়া।

শরীরের ক্ষারীয় অবস্থা বজায় রাখতে পূর্বের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত খাদ্যতালিকা অনুসারে আমাদের প্রাকৃতিক ও সুষম খাবার খেতে হবে।

তাই আমাদের—

- ○ প্রতিদিনের খাদ্যতালিকার ৯০ শতাংশের বেশি থাকতে হবে উদ্ভিজ্জ খাবার অর্থাৎ শাকসবজি সালাদ ফল ডাল মটরশুঁটি বীজ বিন এবং অল্প পরিমাণ ভাত/ রুটি। ১০ শতাংশের কম থাকতে হবে প্রাণিজ আমিষ ও প্রাণিজ চর্বি অর্থাৎ মাছ মাংস ডিম দুধ টক দই ইত্যাদি।
- ○ এর পাশাপাশি প্রতিদিন কমপক্ষে দুই লিটার পানি পান করতে হবে।

এসবের ফলে দেহের স্বাভাবিক অ্যালকালাইন বা ক্ষারীয় অবস্থা বজায় থাকবে। ফলে আপনার ইমিউন সিস্টেম সুন্দরভাবে কাজ করবে। আপনি সুস্থ প্রাণবন্ত দীর্ঘজীবনের অধিকারী হবেন।

ভালোভাবে চিবিয়ে খান

খাবার স্রষ্টার দেয়া অনেক বড় নেয়ামত। বেঁচে থাকার জন্যে তো বটেই, সুস্বাস্থ্যের জন্যেও খাবার অপরিহার্য। অবৈজ্ঞানিক খাবার একদিকে মানুষকে রোগগ্রস্ত করতে পারে; অন্যদিকে পুষ্টিবিজ্ঞানসম্মত সুষম খাবার মানুষকে রোগমুক্ত দীর্ঘজীবনের অধিকারী করে। তবে খাবার থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে হলে খেতে হবে নিয়মমতো। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, খাবার খুব ভালোভাবে চিবিয়ে খেতে হবে।

খাবার হজমের প্রক্রিয়া শুরু হয় মুখ থেকে, চিবানোর মাধ্যমে। যখন খুব ভালোভাবে চিবানো হয়, খাবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। খাবারের এই ক্ষুদ্র কণা মুখনিঃসৃত লালার সাথে মিশে যায়, যাতে রয়েছে বেশ কিছু

এনজাইম যেমন : এমাইলেজ, মালটেজ, লিংগুয়াল লাইপেজ, লাইসোজাইম, কার্বোনিক এনহাইড্রেজ ইত্যাদি। ফলে সব ধরনের খাবারের প্রাথমিক হজম প্রক্রিয়া শুরু হয় এই এনজাইমগুলোর সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে। যখন খুব ভালোভাবে চিবানো হয়, তখন খাবার ক্ষুদ্রতম কণায় পরিণত হয়। খাদ্য যত ক্ষুদ্রতম কণায় রূপান্তরিত হয়, প্রাথমিক হজমপ্রক্রিয়া তত সুন্দর হয়।

কতবার চিবালে ভালোভাবে চিবানো হবে, এটি নির্ভর করে খাবারের ধরনের ওপর। আমেরিকার ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির বিশেষজ্ঞদের মতে, নরম খাবার—যেমন নরম ফল ৫-১০ বার চিবালেই যথেষ্ট, আবার মাংস জাতীয় জমাট খাবার ৩০ বার পর্যন্ত চিবাতে হতে পারে।

যখন খাবার ভালোভাবে চিবানো হয় তখন পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে বার্তা চলে যায় যে, খাবার আসছে, প্রস্তুতি গ্রহণ করো। ফলে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র পরবর্তী ধাপের হজমপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে পূর্ণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে। পাকস্থলীতে পর্যাপ্ত এনজাইম ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসৃত হয়, যা হজমপ্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ চমৎকারভাবে সুসম্পন্ন করে।

হজমপ্রক্রিয়ার তৃতীয় ও শেষ ধাপ সম্পন্ন হয় ক্ষুদ্রান্ত্রে। প্রস্তুতিপর্ব ভালো থাকলে হজম পর্বও সুন্দর হয় এবং হজম শেষে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান রক্তে প্রবেশ করে। আর অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থগুলো শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে অবস্থান নেয় বৃহদান্ত্রে।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলছেন, খাবার চিবানোর পুরো প্রক্রিয়ার সাথে মস্তিষ্কের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। আমরা যতই ক্ষুধার্ত থাকি, খাবারের মেন্যু আর পরিমাণ যা-ই থাকুক, কোনো খাবারই ১৪/১৫ মিনিটের বেশি সময় নিয়ে আমরা চিবাতে পারব না। ১৫ মিনিট ধরে চিবাতে থাকলে মস্তিষ্ক সংকেত পাঠাতে থাকবে যে খাওয়া হয়ে গেছে, এবার থামো!

শুধু তা-ই নয়, যখন আপনি অল্প পরিমাণ খাবারও দীর্ঘসময় ধরে চিবিয়ে খাবেন, তখন এই অল্প পরিমাণ খাবারও আপনার পেট ভরা বা ক্ষুধা নিবৃত্তির অনুভূতি সৃষ্টি করবে এবং চাইলেও তখন বেশি খেতে পারবেন না। ফলে ওজন বাড়বে না। আর বাড়তি ওজন থাকলে তা সহজে কমে যাবে।

যথাযথ পরিমাণ না চিবিয়ে দ্রুত বা তাড়াহুড়ো করে খেলে যে-সব সমস্যা হতে পারে :

- বদহজম, ডায়রিয়া
- পেটে গ্যাস/ পেট ফাঁপা/ পেট ফুলে যাওয়া
- এসিড রিফ্লাক্স
- পেটব্যথা
- বমি বমি ভাব
- মাথাব্যথা
- অস্বস্তি বিরক্তি অসহিষ্ণুতা
- অপুষ্টি
- ওজন বৃদ্ধি

পরিপূর্ণ হজমের জন্যে খাবার গ্রহণের ২০-৩০ মিনিট পূর্বে অথবা পরে পানি পান করুন। যদি ওজন কমাতে চান, তবে অবশ্যই আপনি 'খাবার পান করুন আর পানি চিবিয়ে খান'। অর্থাৎ খাবার পর্যাপ্ত সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে ভালোভাবে চিবিয়ে খান, যেন খাবারটা মুখের ভেতর অনেকটা তরল হয়ে যায়। এরপর গিলে ফেলুন। তাহলেই খাবার যে স্রষ্টার কত বড় নেয়ামত, সেটি আপনি অনুভব করতে পারবেন।

পানি পানের বেলায়ও তা-ই। যতই তৃষ্ণার্ত কিংবা ব্যস্ত থাকুন, তাড়াহুড়ো করে এক ঢোকে কখনো গ্লাসের সবটা পানি পান করবেন না। সবসময় এক গ্লাস পানি একাধিক চুমুকে ও একাধিক ঢোকে বেশ খানিকটা সময় নিয়ে পান করুন। সুস্বাস্থ্যের জন্যে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ভূঁড়ি থেকে মুড়ি, সর্বরোগের গুড়ি

প্রাচীন বাংলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল—'ভূঁড়ি থেকে মুড়ি, সর্বরোগের গুড়ি'। এখানে ভূঁড়ি হচ্ছে পেট বা পরিপাকতন্ত্র, মুড়ি হচ্ছে ব্রেন বা মস্তিষ্ক এবং গুড়ি মানে হচ্ছে শিকড়। অর্থাৎ যাবতীয় রোগের মূল উৎস হচ্ছে পরিপাকতন্ত্র এবং মস্তিষ্ক। প্রাচীনকালের এই প্রবাদটি এখন সত্য হয়ে উঠছে বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণায়।

আমরা জানি, সুস্থ থাকার জন্যে প্রয়োজন অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ইমিউন সিস্টেম। অবাক করা ব্যাপার, এই ইমিউন সিস্টেমের ৭০ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করে আপনার পরিপাকতন্ত্র।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মস্তিষ্কের বাইরে একমাত্র অঙ্গ হচ্ছে পরিপাকতন্ত্র, যার রয়েছে নিজস্ব স্নায়ুতন্ত্র। আপনার স্পাইনাল কর্ডে যে সংখ্যক নিউরোন রয়েছে, তার সমসংখ্যক নিউরোন রয়েছে আপনার পরিপাকতন্ত্রে। শরীরে যে পরিমাণ সেরোটনিন নিঃসরণ হয়, এর ৭০ শতাংশ নিঃসৃত হয় পরিপাকতন্ত্রের স্নায়ুকোষ থেকে। আসলে মস্তিষ্কে যত নিউরোট্রান্সমিটার রয়েছে, এর চেয়েও বেশি নিউরোট্রান্সমিটার রয়েছে আপনার পরিপাকতন্ত্রে। পরিপাকতন্ত্রের স্নায়ুতন্ত্রকে তাই বলা হয় দ্বিতীয় মস্তিষ্ক (সেকেন্ড ব্রেন)।

এ কারণেই পরিপাকতন্ত্র ও ব্রেনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কারণে এই ভারসাম্য নষ্ট হলে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং পরিপাকতন্ত্র ও ব্রেনের মধ্যকার ভারসাম্য নষ্ট হয়—এমন কিছু করা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকা উচিত।

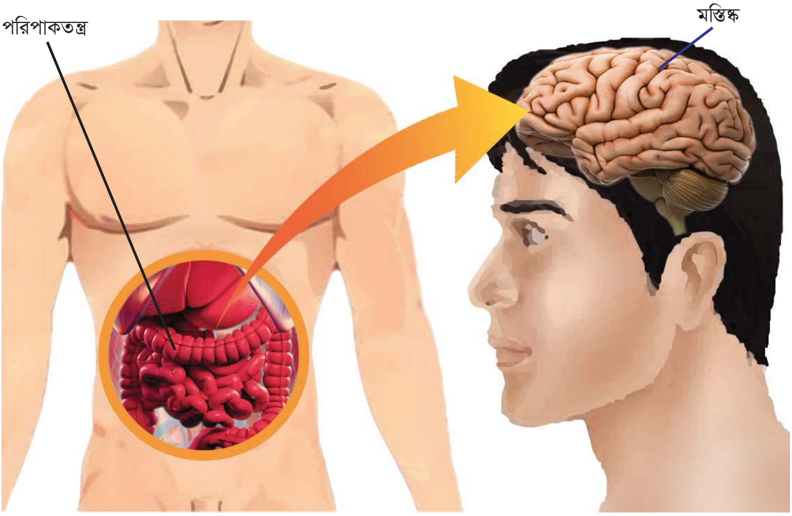

শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেমের জন্যে প্রয়োজন
পরিপাকতন্ত্র ও মস্তিষ্কের মধ্যে পূর্ণ ভারসাম্য

যে-সব কারণে এই ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে—

- ☐ জাংক ফুড বা অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ।
- ☐ অতিরিক্ত ওষুধ সেবন, বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক, ব্যথানাশক ও স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ।
- ☐ ক্ষুদ্রান্ত্রে জীবাণু সংক্রমণের ফলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং উপকারী ব্যাকটেরিয়া কমে যাওয়া।
- ☐ এনজাইমের স্বল্পতা (যা টেনশন, গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ সেবন ও জিংকের স্বল্পতার কারণে হয়ে থাকে)।
- ☐ মানসিক চাপ বা স্ট্রেস বা টেনশন।

পরিপাকতন্ত্র ও ব্রেনের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্যে করণীয়—

- ○ অস্বাস্থ্যকর ও অবৈজ্ঞানিক ক্ষতিকর খাবার, যেমন : প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার, সফট ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস, ফাস্ট ফুড, চিনি, তেল-চর্বিযুক্ত খাবার, অতিরিক্ত ভাজাপোড়া খাবার ইত্যাদি বর্জন করুন।
- ○ প্রচুর আঁশযুক্ত খাবার খান। এজন্যে প্রতিদিন লাল চালের ভাত বা লাল আটার রুটি, পর্যাপ্ত ফল এবং সালাদ সবজি বাদাম বীজ ও বিন খান। এতে পরিপাকতন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়বে।
- ○ প্রো-বায়োটিক্স সমৃদ্ধ খাবার, যেমন টক দই নিয়মিত খান। এতে পরিপাকতন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়বে।
- ○ ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ খাবার বেশি বেশি খান।
- ○ নবজাত শিশুকে শালদুধ এবং নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ান।
- ○ নিয়মিত ব্যায়াম করুন।
- ○ পর্যাপ্ত (৬-৮ ঘণ্টা) ঘুমানোর চেষ্টা করুন।
- ○ নিয়মিত মেডিটেশন করুন।

মেডিটারেনিয়ান ডায়েট

মেডিটারেনিয়ান সী বা ভূমধ্যসাগর উপকূলবর্তী দেশগুলো মেডিটারেনিয়ান অঞ্চল নামে পরিচিত। স্পেন ইতালি গ্রিস স্লোভেনিয়া ক্রোয়েশিয়া আলবেনিয়া বসনিয়া-হার্জেগোভিনা তুরস্ক লেবানন ইসরায়েল ইত্যাদি দেশ এর অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলজুড়ে প্রচলিত খাদ্যাভ্যাসই 'মেডিটারেনিয়ান ডায়েট' নামে পরিচিত। আমেরিকা ও উত্তর ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় এ অঞ্চলের মানুষদের হৃদরোগ কম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ সাল থেকে এ অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে গবেষকদের মনে আগ্রহ তৈরি হয়।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় ও স্বাস্থ্যসম্মত ডায়েটগুলোর মধ্যে মেডিটারেনিয়ান ডায়েট রয়েছে সবার ওপরে। গবেষণা বলছে, এই বিশেষ ধরনের ডায়েট অনুসরণে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, স্থূলতা ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে।

কী রয়েছে মেডিটারেনিয়ান ডায়েটে?

এতে রয়েছে পূর্ণ শস্যদানা (হোল গ্রেইন), পর্যাপ্ত শাকসবজি ও সালাদ, ফলমূল, বাদাম, ডাল-শিম-বীজ-মটরশুঁটি জাতীয় খাবার, টক দই, সামুদ্রিক মাছ, ন্যূনতম পরিমাণে চর্বিহীন মাংস এবং অলিভ অয়েল। রেড মিট (গরু, খাসি, পাঁঠার মাংস), স্যাচুরেটেড ফ্যাট (ক্ষতিকর সম্পৃক্ত চর্বি), দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার এবং চিনি ও লবণের পরিমাণ অতিসামান্য। প্রক্রিয়াজাত-প্যাকেটজাত খাবারের পরিমাণ একেবারে শূন্য।

আধুনিককালের পুষ্টিবিদরাও সুস্বাস্থ্যের জন্যে এ-জাতীয় খাদ্যাভ্যাসের কথাই বলছেন। এ-জাতীয় খাদ্যাভ্যাস স্থূলতা, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধে খুবই কার্যকরী।

তবে হৃদরোগসহ অন্যান্য লাইফস্টাইল ডিজিজ প্রতিরোধে মেডিটারেনিয়ান ডায়েট কার্যকরী হলেও নিরাময়ের ক্ষেত্রে এটি ফলপ্রসূ নয়। এর জন্যে প্রয়োজন রিভার্সাল ডায়েট।

মাছে-ভাতে বাঙালি

আমরা কথায় কথায় বলে থাকি 'মাছে-ভাতে বাঙালি'। এটি যে বাঙালিদের বেলায় কতটা সত্য তা বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে। হাওর-বাঁওড়, খালবিল আর নদীনালাসমৃদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের খাবারের একটি প্রধান উপাদান ছিল মিঠা পানি ও নোনা পানির হরেক পদের মাছ। জাল ফেললেই মাছ, ছিপ ফেললেই মাছ। সহজলভ্যতা ও স্বাদের কারণে মাছ ছিল বাঙালির আমিষের প্রধান উৎস। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯ শতকের কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়–

ভাত-মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল
ধানে ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল

এ-ছাড়া পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত কিছু ফলকে রয়েছে নানা রকম মাছের ছবি। আবার অনেক পুরনো মন্দিরে প্রাপ্ত ফলকেও মাছের ছবি আঁকা রয়েছে। এ-ছাড়া বাঙালির উৎসব-পার্বণের আল্পনা, শাড়ির আঁচল, কানের দুল এমনকি গলার হারের নকশায়ও থাকে মাছের ছবি।

আসলে হাজার হাজার বছর থেকে বাঙালির ডিএনএ-র সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে

জড়িয়ে আছে মাছ। বাঙালির আমিষের একটি বড় অংশই পূরণ হয়ে আসছে মাছ থেকে। মাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর একটি খাবার। এতে আমিষ বা প্রোটিন ছাড়াও রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন এবং মিনারেল।

মাছে থাকে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, যা সুস্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং হৃদবান্ধব। ছোট মাছের কাঁটায় থাকে ক্যালসিয়াম। এ-ছাড়া সামুদ্রিক মাছ অত্যন্ত হৃদবান্ধব এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর।

অপরিকল্পিত বাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ আর অমনোযোগিতার ফলে মাঝে মাছের উৎপাদন কমে গেলেও বর্তমানে প্রাকৃতিক উৎসের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। আর সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসারে, বিশ্বের মোট ইলিশ উৎপাদনের ৮৬ শতাংশই উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে।

বাঙালির ঘরে এখন আটার রুটি বা ময়দার লুচি-পরোটার প্রচলন থাকলেও গম কিন্তু এদেশের আদি শস্য নয়। মধ্য এশিয়া থেকে শাসকদের হাত ধরে গম এদেশে আসে। হাজার বছর ধরে বাংলার প্রধান শস্য হচ্ছে ধান। প্রায় ৩৫০ ধরনের সুগন্ধি চাল উৎপাদিত হতো এ বাংলায়, যার বেশিরভাগ উৎপাদিত হতো উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হতো সুগন্ধি চাল। কিন্তু এসব আজ অতীত। ইংরেজ কর্তৃক জোরপূর্বক নীলচাষের ফলে গুটিকয় প্রজাতি ছাড়া বাকি সকল ধানের প্রজাতিই আজ বিলুপ্ত প্রায়।

ঢেঁকিছাঁটা লাল চালের ভাত মাছ শাকসবজি ভর্তা ডাল দেশি ফল—এই ছিল বাঙালির নিত্যদিনের খাবার। মাংস যে খাওয়া হতো না, তা নয়; তবে কালেভদ্রে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় বদলে যেতে শুরু করল আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি। পোলট্রি শিল্পের বিস্তার, রেফ্রিজারেটরের ব্যবহার, অটো রাইস মিলের প্রচলন আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফলে আমাদের খাদ্যাভ্যাসে একটি মৌলিক পরিবর্তন এসে গেছে।

লাল চালের জায়গা পুরোপুরি দখল করে ফেলেছে প্রক্রিয়াজাত সাদা চাল আর মাছের বড় একটা অংশ দখল করে ফেলেছে মুরগি এবং এর পাশাপাশি গরু, খাসি বা পাঁঠার মাংস। রেস্তোরাঁ এবং ফাস্ট ফুড শিল্পের বদৌলতে চিনি, সাদা ময়দা আর মুরগি ও অন্যান্য মাংসের ছড়াছড়ি। এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে সপ্তাহের সাত দিনই মাংস খাওয়া হয়।

এই অতিরিক্ত মাংসের ছড়াছড়ি এবং চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দার অতিব্যবহারই লাইফস্টাইল ডিজিজের জন্ম দিচ্ছে। এ কারণেই উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, আলঝেইমার্স ডিজিজ আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে।

পৃথিবীতে যত ধরনের ডায়েট রয়েছে, এর মধ্যে প্রতিটি স্বাস্থ্যকর ডায়েটে রয়েছে লাল চাল বা লাল আটা এবং ডাল বাদাম বীজ বিন ফল সালাদ শাকসবজি মাছ। মাংস খুবই কম। থাকলেও বড়জোর মুরগির মাংস।

আমাদের পূর্বপুরুষদের খাবারও ছিল এমনটাই। আর এ কারণেই সেকালে ছিল না ঘরে ঘরে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক। তাই সুস্থ প্রাণবন্ত রোগমুক্ত দীর্ঘজীবন পেতে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আমাদের পূর্বপুরুষদের খাদ্যাভ্যাসে, আমাদের ডিএনএ-র পরিচিত খাবারে। আর এ লক্ষ্যে সপ্তাহে দুদিন ছোট মাছ, দুদিন বড় মাছ (সামুদ্রিক হলে ভালো) এবং মুরগি খাওয়ার অভ্যাস একদিনে সীমিত রাখুন। বাকি দুদিন মাছ-মাংস খাবেন না, শুধুই নিরামিষ খাবেন। আর গরু-খাসি কদাচিৎ, অগত্যা খেতে হলে মাসে একদিনের (একবেলা) বেশি নয়। অর্থাৎ গরু-খাসি যত কম খান তত ভালো, না খেলে আরো ভালো।

হৃদরোগ নিরাময়ে বিশেষ খাদ্যাভ্যাস (রিভার্সাল ডায়েট)

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়া যারা হৃদরোগ নিরাময় করতে চান, তারা এই রিভার্সাল ডায়েট কমপক্ষে দুই বছর অনুসরণ করবেন। দুই বছর পর তিনি প্রিভেনশন ডায়েট অর্থাৎ কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাসে ফিরে যাবেন। এ লক্ষ্যে আপনার করণীয় :

বর্জন করুন (দুই বছরের জন্যে)

- সব ধরনের প্রাণিজ আমিষ অর্থাৎ মাছ মাংস ডিম ও দুধ।
- তেল এবং তেল দিয়ে রান্না করা সকল খাবার।
- সব ধরনের বাদাম।

বর্জন করুন (সবসময়ের জন্যে)

- চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দা।
- ঘি মাখন ডালডা মার্জারিন দুধের সর।
- কোমল পানীয় ও এনার্জি ড্রিংকস।
- ভাজাপোড়া খাবার : সিঙ্গাড়া সমুচা পেঁয়াজু লুচি পুরি পরোটা চপ মোগলাই কাবাব বিরিয়ানি কাচ্চি পোলাও তেহারি।
- ফাস্ট ফুড : বার্গার স্যান্ডউইচ শর্মা পিৎজা পেটিস ক্রিমরোল কেক পেস্ট্রি হটডগ ফেঞ্চ ফ্রাই চিকেন ফ্রাই।
- প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত সকল খাবার।

প্রতিদিন খান

- লাল চালের ভাত বা লাল আটার রুটি (ন্যূনতম পরিমাণে)।
- ৩-৪ ধরনের ফল, বিশেষ করে মৌসুমি ফল।
- ৩-৪ ধরনের সালাদ।
- ৩-৪ ধরনের কাঁচা সবুজ পাতার গ্রিন জুস।
- পর্যাপ্ত অর্ধসেদ্ধ শাকসবজি।
- পরিমিত পরিমাণে ডাল-মটরশুঁটি-শিম-বিন।
- ভিজানো কাঁচা ছোলা (পরিমিত), সয়াদুধ, মিষ্টি আলু, মাশরুম।
- অল্প পরিমাণে আদা রসুন লেবু স্পিরুলিনা কালোজিরা মধু ও অ্যাপল সাইডার ভিনেগার।
- অল্প পরিমাণে তিসি তিল এবং চিয়া সূর্যমুখী মিষ্টিকুমড়া ও তরমুজের বীজ; কিশমিশ, অ্যাপল সাইডার ভিনেগার।

রিভার্সাল ডায়েট অনুসরণ করলে অবশ্যই বিকল্প আমিষ হিসেবে প্রতিদিন লাল চালের ভাত বা লাল আটার রুটি, ডাল মটরশুঁটি শিম বরবটি সয়াদুধ স্পিরুলিনা মাশরুম এবং বিভিন্ন ধরনের বীজ ও বিন খেতে হবে। তবে কিডনি রোগীরা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এগুলো খাবেন।

কখন খাবেন

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ খাদ্য গ্রহণ করেছে দিনে ৩ বার—সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবার। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার। খাদ্যশিল্পে বিপ্লব আর মুখরোচক খাবারের বহুল প্রচলনের ফলে এই তিন প্রধান খাবারের মাঝে যোগ হলো স্ন্যাক্স। শুরুটা পাশ্চাত্যে হলেও ধীরে ধীরে এটি ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিশ্বে। রেফ্রিজারেটর ও মাইক্রোওয়েভের বহুল ব্যবহার, হোটেল ও রেস্টুরেন্টে খাওয়ার প্রচলন, প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের ছড়াছড়ি আর খাদ্যজ্ঞানের অভাব আমাদেরকে দিনে ৫-৬ বার খেতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ঘন ঘন খাবার গ্রহণ রক্তে ইনসুলিন হরমোনের প্রবাহ বাড়িয়ে দেয়। ফলে একটা সময় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়, যার পরিণতি টাইপ-২ ডায়াবেটিস। বিশ্বজুড়ে ডায়াবেটিস বাড়ার প্রধানতম কারণ বার বার খাওয়া—যার অন্যতম উপাদান চিনি তেল চর্বি এবং অন্যান্য রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্‌স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির নিউরোসায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ডা. মার্ক ম্যাটসন বলেন, দিনে ৫ বারের পরিবর্তে ৩ বার খাবার গ্রহণ এবং দুই খাবারের মাঝে ৬ ঘণ্টার বিরতি সুস্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাই সুস্থতার জন্যে সকালে তুলনামূলক বেশি পরিমাণে নাশতা করুন, দুপুরে পরিমিত খান এবং রাতে খুব হালকা খাবার গ্রহণ করুন। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিন। সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত ভারী খাবার বর্জন করুন। এসময় প্রয়োজনে পানি, অ্যাপল সাইডার ভিনেগার বা সালাদ, সবজি খেতে পারেন।

কীভাবে খাবেন

ভোর ৬টায়

এক গ্লাস হালকা গরম পানিতে অর্ধেক/ পুরো একটি লেবু মিশিয়ে পান করুন। প্রয়োজনে এক চা চামচ মধু যোগ করতে পারেন।

ভোর সাড়ে ৬টায়

আগের রাতে ভিজানো একমুঠ ছোলা, একটুকরো আদা ও অল্প পরিমাণ হিমালয়ান সল্ট/ বিট লবণ দিয়ে খেয়ে নিন।

সকালের নাশতা (সকাল ৭টা—৮টায়)

প্লেট-১

৩-৪ ধরনের যে-কোনো ফল খান। মৌসুমি ফল হলে ভালো। এর মধ্যে সাইট্রাস ফলও থাকতে হবে।

প্লেট-২

লাল আটার রুটি (২-৩টি), মটরশুঁটিসহ মিক্সড সবজি (অর্ধসেদ্ধ), ছোলার ডাল ও সালাদ খান। এর সাথে এক গ্লাস সয়াদুধ খেতে পারেন।

অথবা

ঢেঁকিছাঁটা লাল চালের খিচুড়ি (১-২ কাপ), মটরশুঁটিসহ মিক্সড সবজি (অর্ধসেদ্ধ), ভর্তা ও সালাদ খান। এর সাথে এক গ্লাস সয়াদুধ খেতে পারেন।

দুপুরের খাবার (দুপুর ১টা—২টায়)

প্লেট-১

৩-৪ ধরনের সালাদ (শসা গাজর টমেটো ক্যাপসিকাম বিট) খান।

৩-৪ ধরনের সবুজ পাতার (পুদিনা লেটুস ধনে পালং) সাথে ৩-৪টি আমলকি দিয়ে ব্লেন্ড করে গ্রিন জুস তৈরি করে পান করুন। স্বাদের জন্যে এতে অল্প পরিমাণে জিরা, আদা, হিমালয়ান সল্ট/ বিট লবণ, মধু/ গুড় দিতে পারেন।

প্লেট-২

ঢেঁকিছাঁটা লাল চালের ভাত (১ কাপ), শাক, মটরশুঁটিসহ পর্যাপ্ত মিক্সড সবজি (অর্ধসেদ্ধ), ভর্তা, ডাল।

রাতের খাবার (সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে)

লাল চালের ভাত (আধা কাপ)/ লাল আটার রুটি (১টি), মটরশুঁটিসহ মিক্সড সবজি (অর্ধসেদ্ধ), ভর্তা, সালাদ। ডাল খেতে চাইলে খুব অল্প পরিমাণে খান। ওজন বেশি থাকলে তা না কমা পর্যন্ত রাতে ভাত/ রুটি পুরোপুরি বন্ধ রাখতে পারেন। এতে বাড়তি ওজন দ্রুত কমবে।

সন্ধ্যা ৭টা—রাত ১১টায়

অ্যাপল সাইডার ভিনেগার (৩-৪ চা চামচ) পানির সাথে মিশিয়ে খেয়ে নিন। খুব বেশি ক্ষুধা লাগলে অল্প সালাদ/ সবজি খেতে পারেন।

ভিটামিন ও মিনারেল সাপ্লিমেন্ট

রিভার্সাল ডায়েট হচ্ছে ভেগান ডায়েট, যেখানে সব ধরনের প্রাণিজ আমিষ খাওয়া বন্ধ থাকে। আমরা জানি, ভিটামিন বি$_{১২}$ এবং ভিটামিন ডি থাকে শুধু প্রাণিজ খাবারে। তাই যতদিন ভেগান ডায়েট চালিয়ে যাবেন ততদিন আপনাকে এই দুই ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে হবে।

এ-ছাড়াও ভেগান ডায়েট চলাকালে ক্যালসিয়াম, জিংক, আয়রন ও আয়োডিনের স্বল্পতা হতে পারে বিধায় যথাযথ পরিমাণে তা পাওয়ার জন্যে প্রতিদিন একটি মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট খেতে হবে।

অতএব রিভার্সাল ডায়েট চলাকালীন পুরো দুবছর নিম্নলিখিত পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন ও মিনারেল সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করুন।

ভিটামিন বি$_{১২}$

Tab. MB-12 (0.5mg)/ Methicol (0.5mg)/ Mecolin (0.5mg)

১+০+১ খাওয়ার পর—দুই বছর

মাল্টিভিটামিন ও মাল্টিমিনারেল

Tab. Bextram Gold/ Tab. Filwel Gold/ Tab. Super Gold

১+০+০ খাবার পর ১ মাস, এরপর ৭ দিন বন্ধ, আবার ১ মাস, পরে ৭ দিন বন্ধ ... এভাবে দুবছর। (বয়স ৪৫ বছর হলে Gold এর পরিবর্তে Silver)

ভিটামিন ডি

Cap. D-3 (40,000 IU)/ D-Balanace (40,000 IU)/ D-Rise (40,000 IU) প্রতি সপ্তাহে ১টি করে খাবার পর—১২ সপ্তাহ।

এ-ছাড়াও সপ্তাহে ৩-৪ দিন ১৫-২০ মিনিট সকালের নরম রোদ শরীরে লাগান। প্রয়োজনে আপনার চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে রক্তের ভিটামিন ডি-এর মাত্রা পরীক্ষা করে রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করুন।

রিভার্সাল ডায়েটের পাশাপাশি হৃদরোগ নিরাময়ে আপনার করণীয়

- সবসময় শোকরগোজার থাকুন। সারাদিন হাসিখুশি থাকুন।
- প্রতিদিন দুবেলা হৃদরোগ নিরাময়ের মেডিটেশন করুন। এ-ক্ষেত্রে মেডিটেশন ডাউনলোড করতে পারেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট quantummethod.org.bd থেকে।
- প্রতিদিন ২০-৩০ মিনিট কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা করুন।
- প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট ঘণ্টায় চার মাইল বেগে হাঁটুন।
- প্রতিদিন ৩-৫ দফা প্রাণায়াম করুন।
- সপ্তাহে ১-২ দিন রোজা/ উপবাস/ ফাস্টিং করুন।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত ওজন বজায় রাখুন।

হৃদরোগ প্রতিরোধে কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস (প্রিভেনশন ডায়েট)

রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। এটাই সত্য, সর্ববিচারে নিরাপদ এবং প্রত্যেক মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত এটাই। জীবনাচার তথা খাদ্যাভ্যাসও নির্ধারিত হওয়া উচিত এ লক্ষ্যেই। আর তাই হৃদরোগ প্রতিরোধে কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস হতে পারে একটি আদর্শ খাদ্যাভ্যাস।

বর্জন করুন/ এড়িয়ে চলুন

- রেড মিট অর্থাৎ গরু খাসি পাঁঠার মাংস।
- পোলাও বিরিয়ানি কাচ্চি তেহারি।
- চিংড়ি, কাঁকড়া, বড় মাছের মাথা।
- ফাস্ট ফুড : বার্গার স্যান্ডউইচ পিৎজা পেটিস কেক পেস্ট্রি ফ্রেঞ্চফ্রাই ও চিকেন ফ্রাই ইত্যাদি।
- তৈলাক্ত ও ভাজাপোড়া খাবার : সিঙ্গাড়া সমুচা পেঁয়াজু পুরি লুচি চপ কাবাব পরোটা মোগলাই।
- ঘি মাখন ডালডা মার্জারিন দুধের সর।
- চিনি ও চিনির তৈরি সব খাবার। চিনির বদলে প্রয়োজনে গুড় খান।
- জুস জ্যাম জেলি।
- কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস।
- প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত সকল খাবার।

প্রতিদিন খান

- লাল চালের ভাত বা লাল আটার রুটি (খুব অল্প পরিমাণে)।
- ৩-৪ ধরনের ফল (বিশেষ করে মৌসুমি ফল)।
- ৩-৪ ধরনের সালাদ।
- ৩-৪ ধরনের কাঁচা সবুজ পাতার গ্রিন জুস।
- পর্যাপ্ত অর্ধসেদ্ধ সবজি।

- পরিমিত পরিমাণে ডাল-মটরশুঁটি-শিম-বিন।
- অল্প পরিমাণে ভিজানো কাঁচা ছোলা, সয়াদুধ, মিষ্টি আলু, মাশরুম
- অল্প পরিমাণে আদা রসুন লেবু স্পিরুলিনা কালোজিরা মধু ও অ্যাপল সাইডার ভিনেগার।
- অল্প পরিমাণে বাদাম তিসি তিল এবং চিয়া সূর্যমুখী মিষ্টিকুমড়া ও তরমুজের বীজ; কিশমিশ, অ্যাপল সাইডার ভিনেগার।
- মাছ-মাংসের পরিমাণ সীমিত রাখুন। সপ্তাহে ২ দিন ছোট মাছ, ২ দিন বড় মাছ (সামুদ্রিক হলে ভালো) ও ১ দিন মুরগির মাংস খান। সপ্তাহে ২ দিন মাছ-মাংস খাবেন না।
- প্রতিদিন একটি ডিম খান।
- রান্নায় ন্যূনতম তেল ব্যবহার করুন।

হৃদরোগ একদিনে হয় না। বছরের পর বছর ধরে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পরিণতিতে করোনারি ধমনীতে ব্লকেজ তৈরি হয়। তাই হৃদরোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার প্রতিদিনের খাবার অবশ্যই হতে হবে সুষম।

এ লক্ষ্যে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকার ৯০ শতাংশের বেশি থাকতে হবে উদ্ভিজ্জ খাবার অর্থাৎ পর্যাপ্ত শাকসবজি সালাদ ফল ও পরিমিত পরিমাণে ডাল মটরশুঁটি বীজ বিন এবং অল্প পরিমাণ ভাত/ রুটি। ১০ শতাংশের কম থাকতে হবে প্রাণিজ আমিষ ও প্রাণিজ ফ্যাট অর্থাৎ মাছ মাংস ডিম দুধ টক দই ইত্যাদি। এ-ছাড়া প্রতিদিন কমপক্ষে ২ লিটার (৮ গ্লাস) পানি পান করতে হবে। এই খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করে আপনি সহজেই হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে পারবেন।

কখন খাবেন

সকালে তুলনামূলক বেশি পরিমাণে নাশতা করুন, দুপুরে পরিমিত খান এবং রাতে খুব হালকা খাবার খান। সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই রাতের খাবার খেয়ে নিন।

কীভাবে খাবেন

ভোর ৬টায়

এক গ্লাস হালকা গরম পানিতে অর্ধেক/ পুরো ১টি লেবু মিশিয়ে পান করুন। প্রয়োজনে ১ চা চামচ মধু দিতে পারেন।

ভোর সাড়ে ৬টায়

একমুঠ ভিজানো ছোলা, একটুকরো আদা ও অল্প পরিমাণ হিমালয়ান সল্ট/ বিট লবণ দিয়ে খেয়ে নিন।

সকালের নাশতা (সকাল ৭—৮টায়)

প্লেট-১

৩-৪ ধরনের যে-কোনো ফল খান। মৌসুমি ফল হলে ভালো হয়। এর মধ্যে সাইট্রাস ফলও থাকতে হবে।

প্লেট-২

লাল আটার রুটি (২-৩টি), পর্যাপ্ত সবজি, সালাদ ও ডিম।

অথবা

ঢেঁকিছাঁটা লাল চালের খিচুড়ি (১-২ কাপ), পর্যাপ্ত সবজি ভর্তা সালাদ ডিম।

দুপুরের খাবার (দুপুর ১—২টায়)

প্লেট-১

৩-৪ ধরনের সালাদ (শসা গাজর টমেটো বিট ক্যাপসিকাম)

৩-৪ ধরনের সবুজ পাতার (পুদিনা লেটুস ধনে ও পালং পাতা) গ্রিন জুস তৈরি করে পান করতে পারেন। স্বাদের জন্য পাতার সাথে অল্প পরিমাণে জিরা, আদা, বিট লবণ, মধু/ গুড় এবং ৩-৪টি আমলকি দিয়ে ব্লেন্ড করে গ্রিন জুস তৈরি করুন।

প্লেট-২

ঢেঁকিছাঁটা লাল চালের ভাত (১ কাপ), ভর্তা ডাল শাক মাছ/ মাংস এবং পর্যাপ্ত সবজি।

রাতের খাবার (সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে)

লাল চালের ভাত (আধা কাপ)/ লাল আটার রুটি (১টি), ডাল, সবজি, সালাদ, ভর্তা।

ওজন বেশি থাকলে তা না কমা পর্যন্ত রাতে ভাত/ রুটি পুরোপুরি বন্ধ রাখতে পারেন। এতে বাড়তি ওজন দ্রুত কমবে।

রাতে মাছ-মাংস-ডিম-দুধ অর্থাৎ কোনো প্রাণিজ খাবার খাবেন না।

সন্ধ্যা ৭টা—রাত ১১টা পর্যন্ত

৩-৪ চা চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনেগার এক গ্লাস পানির সাথে মিশিয়ে পান করুন। খুব বেশি ক্ষুধা লাগলে অল্প সালাদ/ সবজি খেতে পারেন।

হৃদরোগ প্রতিরোধে প্রিভেনশন ডায়েটের পাশাপাশি আপনার করণীয়

- সবসময় শোকরগোজার থাকুন। সারাদিন হাসিখুশি থাকুন।
- প্রতিদিন দুবেলা মেডিটেশন করুন। এ-ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট quantummethod.org.bd থেকে মেডিটেশন ডাউনলোড করতে পারেন।
- প্রতিদিন ২০-৩০ মিনিট কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা করুন।
- ঘণ্টায় চার মাইল বেগে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটুন।
- প্রতিদিন ৩-৫ দফা প্রাণায়াম করুন।
- মাঝে মাঝে ১-২ দিন রোজা/ উপবাস/ ফাস্টিং করুন।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত ওজন বজায় রাখুন।

কোয়ান্টাম ইয়োগা করুন নিয়মিত হাঁটুন

দম : জীবনের মূল ছন্দ	।	১৭০
সহজ উজ্জীবন	।	১৭১
নাসায়ন বা একনাসা প্রাণায়াম	।	১৭২
ভ্রমণ প্রাণায়াম	।	১৭৩
ব্যায়াম ॥ সুস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ	।	১৭৩
প্রতিদিন হাঁটুন ॥ আপনার হৃৎপিণ্ড ভালো থাকবে	।	১৭৫
কোয়ান্টাম ইয়োগা ॥ আধুনিক মানুষের ব্যায়াম	।	১৭৭

হৃদরোগ তথা লাইফস্টাইল ডিজিজ নিরাময়ে প্রয়োজনীয় ইয়োগা

উজ্জীবন	।	১৭৯
অর্ধচন্দ্রাসন	।	১৮৫
ত্রিকোণাসন	।	১৮৬
বৃক্ষাসন	।	১৮৭
তুলাসন বা উৎকট আসন	।	১৮৮
ভুজঙ্গাসন	।	১৮৯
অর্ধশলভাসন ও শলভাসন	।	১৯০
পবনমুক্তাসন	।	১৯১
গোমুখাসন	।	১৯২
উষ্ট্রাসন	।	১৯৪
পদ্মাসন	।	১৯৫
বঙ্গাসন	।	১৯৬
দণ্ডাসন	।	১৯৭
বজ্রাসন	।	১৯৮
শবাসন	।	১৯৯

কোয়ান্টাম ইয়োগা করুন

নিয়মিত হাঁটুন

সুস্বাস্থ্য একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। কেননা গাড়ি-বাড়ি ধন-সম্পদ প্রভাব-প্রতিপত্তি যশ-খ্যাতি সবই অর্থহীন হয়ে যেতে পারে যদি আপনি সুস্থ না থাকেন। এ কারণেই নবীজী (স) বলেছেন, সুস্বাস্থ্য হচ্ছে স্রষ্টার সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

সুস্বাস্থ্য যে কত বড় নেয়ামত এটি সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করতে পারেন একজন অসুস্থ ব্যক্তি; যেমন উপলব্ধি করেছিলেন মার্কিন ধনকুবের ফোর্ড মোটরস-এর প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ড। একদিন এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকেরা জিজ্ঞেস করলেন, মি. ফোর্ড, গত ছয় মাসে আপনার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা কোনটি? কিছুক্ষণ চিন্তা করে মি. ফোর্ড জানালেন, ১৫ দিন আগে তিনি একটি অর্ধসেদ্ধ ডিমের অর্ধেকটা কুসুমসহ খেয়েছিলেন এবং তা হজম করতে পেরেছিলেন। এটিই তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাংবাদিকেরা শুনে বিস্মিত হলেন।

কেন এটি গত ছয় মাসের মধ্যে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা? কারণ তিনি মাতৃদুগ্ধ ছাড়া কিছুই হজম করতে পারতেন না। তার এজেন্টরা শহরের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ করে নিয়ে এলে তিনি তা পান করতেন। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার তাকে সুস্থ রাখতে পারে নি।

আসলে সুস্থতার জন্যে প্রয়োজন মনোযোগ। শরীর আপনার মনোযোগ চায়। তার প্রাপ্য যত্ন চায়। যখনই যত্নের অভাব হবে শরীর তখনই অসুস্থ হবে। অর্থাৎ সুস্থতার জন্যে, সুস্বাস্থ্যের জন্যে প্রয়োজন যত্নায়ন। গুরুত্বপূর্ণ দুটি যত্নায়ন নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব—প্রথমটি হলো দম এবং দ্বিতীয়টি ব্যায়াম।

দম : জীবনের মূল ছন্দ

দম হচ্ছে জীবনের মূল ছন্দ। খাবার ছাড়া আপনি বেশ কিছুদিন বাঁচতে পারবেন, পানি ছাড়াও কয়েকদিন বাঁচা সম্ভব। কিন্তু দম ছাড়া অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়া আপনি বড়জোর কয়েক মিনিট বাঁচতে পারেন।

অক্সিজেন আমাদের দেহের বায়ো-ইলেক্ট্রিক্যাল ব্যালান্স নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। আর খাবার দেহের বায়ো-কেমিক্যাল ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

সাধারণত আমরা দুভাবে দম নিয়ে থাকি :

- অ্যাবডোমিনাল ব্রিদিং (ওপর পেটে দম) : স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের দম নেয়ার সহজাত পদ্ধতিটি হলো এই অ্যাবডোমিনাল ব্রিদিং। কিন্তু এভাবে দম নিলে ফুসফুস পূর্ণমাত্রায় প্রসারিত হতে পারে না। ফুসফুস বঞ্চিত হয় পর্যাপ্ত অক্সিজেন থেকে। যার ফলে আমরা অধিকাংশ মানুষই পূর্ণ কর্মশক্তি ও প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে কাজ করতে পারি না।
- চেস্ট ব্রিদিং (বুক ফুলিয়ে দম) : এভাবে দম নিলে ফুসফুস পূর্ণমাত্রায় প্রসারিত হতে পারে। প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুস কাজ করতে পারে তার পুরো কর্মক্ষমতা নিয়ে। ফলে ক্লান্তি দূর হয় নিমেষেই এবং শরীর-মন সারাদিন প্রফুল্ল থাকে। এটাই দম নেয়ার সবচেয়ে সঠিক ও কার্যকরী পদ্ধতি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, শ্বসনতন্ত্রের অনেক অসুখের কারণ হলো সঠিকভাবে দম নিতে না পারা। দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমরা অধিকাংশ মানুষই এ ব্যাপারে উদাসীন। সঠিকভাবে দম নেয়া তখনই সম্ভব হবে—যখন আপনি নাক দিয়ে দম নেবেন, আপনার বুক ফুলবে এবং ফুসফুস প্রসারিত হবে পূর্ণমাত্রায়। এভাবে দম নিলে সারাদিন আপনি থাকবেন কর্মোদ্যমী ও প্রাণবন্ত। তাই যখনই পারেন, সচেতনভাবে বুক ফুলিয়ে দম নিন।

দমের মধ্য দিয়ে শরীরে শুধু অক্সিজেনই প্রবেশ করে না, এক ধরনের প্রাণশক্তিও প্রবেশ করে। সাধকেরা এটিকে বলতেন 'প্রাণা'। তাই দমচর্চার এই পদ্ধতিকে প্রাচীন যোগব্যায়ামের ভাষায় সাধকেরা অভিহিত করেছেন 'প্রাণায়াম' নামে। প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায় ও দেহকে জরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে বলেই এর নাম প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম আপনার দেহ ও মনের মধ্যে ব্রিজ বা সেতু হিসেবে কাজ করে। স্ট্রেসের কারণে যখন সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম উদ্দীপ্ত হয়, দেহ-মনে চলতে থাকে ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স। তখন তৈরি হয় অস্থিরতা-অশান্তি এবং করোনারি ধমনীতে অযাচিত সংকোচন। আর এ অবস্থায় নিয়মিত প্রাণায়াম বা দমচর্চা আপনার দেহ-মনকে টেনশনমুক্ত করে। ভেতরে সৃষ্টি হয় অনাবিল প্রশান্তি। সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের উদ্দীপনা কমে আসে। ফলে করোনারি ধমনীতে যে ক্ষতিকর সংকোচন সৃষ্টি হয়েছিল সেটি দূর হয়।

যোগসাধনায় বহু ধরনের প্রাণায়াম রয়েছে। এর মধ্যে হৃৎপিণ্ডের সুস্থতাসহ সার্বিক সুস্থতার জন্যে উপকারী তিনটি প্রাণায়াম হচ্ছে সহজ উজ্জীবন, নাসায়ন ও ভ্রমণ প্রাণায়াম। দিনের যে-কোনো সময় যে-কোনো পরিবেশে আপনি খুব সহজেই এ তিনটি প্রাণায়াম অনুশীলন করতে পারেন। মুহূর্তেই হয়ে উঠতে পারেন টেনশনমুক্ত ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

সহজ উজ্জীবন

পদ্ধতি : মেরুদণ্ড পুরোপুরি সোজা রেখে দাঁড়ান অথবা বসুন। দুই হাত কোমরের দুই পাশে রাখুন। তাতে ফুসফুস পূর্ণমাত্রায় প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পাবে। এবার সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বুক ফুলিয়ে দম নিন। দম নেবেন নাক দিয়ে, মুখ বন্ধ থাকবে। দম নেয়ার সাথে সাথে বুক ফুলবে, ওপরের পেট নয়। ফুসফুস সর্বোচ্চ প্রসারিত হওয়ার পর কয়েক সেকেন্ড দম ধরে রাখুন, ফুস্ করে ছেড়ে দেবেন না।

এবার ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেয়ার চেয়ে দম ছাড়তে একটু বেশি সময় নিন। একবার দম নেয়া হলো। এভাবে ১৯ বার দম নিলে একদফা সহজ উজ্জীবন হবে। সারাদিনে ৫/৬ দফা চর্চা করুন।

সহজ উজ্জীবন

নাসায়ন বা একনাসা প্রাণায়াম

নাসায়ন : ছবি–১

হাত ও আঙুলের ভঙ্গি

নাসায়ন : ছবি–২

পদ্ধতি : মেরুদণ্ড সোজা রেখে প্রথমে এক পা ওপরে তুলে আর এক পা ভাঁজ করে নিচে রেখে (১নং ছবির মতো করে) বসুন। প্রথমে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে নাকের ডান পাশের ছিদ্র চেপে ধরুন। এমনভাবে ধরুন যেন বাতাস বেরিয়ে যেতে না পারে।

এবার বাম পাশের ছিদ্র দিয়ে দম নিয়ে অনামিকা দিয়ে বাম পাশের ছিদ্রটিও বন্ধ করে দিন। তারপর বাম ছিদ্র বন্ধ রেখেই ডান ছিদ্র থেকে বুড়ো আঙুল তুলে ডান ছিদ্র দিয়ে দম ছাড়ুন। বাম ছিদ্র বন্ধ রাখা অবস্থায়ই নাকের ডান ছিদ্র দিয়ে পুনরায় দম নিন। দম নেয়া হলে বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান ছিদ্র বন্ধ করে পুনরায় বাম ছিদ্র দিয়ে দম ছাড়ুন।

এভাবে একবার বাম নাক বন্ধ রেখে ও ডান নাক দিয়ে ছাড়া আবার ডান নাক বন্ধ রেখে বাম নাক দিয়ে ছাড়া—এই মিলে একপ্রস্থ হবে। এভাবে ৬ থেকে ১০ প্রস্থ করতে পারেন। পদ্মাসনে বসেও নাসায়ন করতে পারেন।

নাসায়নের ফলে ফুসফুসে প্রচুর অক্সিজেন প্রবেশ করে। ধারণা করা হয়, নাসায়ন মস্তিষ্কের দুই বলয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। ফলে দেহ-মন মুহূর্তেই সজীব ও সতেজ হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি স্নায়ু ও পেশি শিথিল হতে শুরু করে। এ-ছাড়াও মাইগ্রেন নিরাময়ে নাসায়ন বেশ উপকারী।

ভ্রমণ প্রাণায়াম

পদ্ধতি : মেরুদণ্ড সোজা রেখে সমান তালে পা ফেলে হাঁটতে শুরু করুন। এবার ৬ কদমে হাঁটতে হাঁটতে দম নিন এবং ৮ কদমে দম ছাড়ুন। অর্থাৎ ধীরে ধীরে দম নিতে নিতে মনে মনে গণনা করে ৬ কদম এগিয়ে যান। আর ধীরে ধীরে দম ছাড়তে ছাড়তে মনে মনে গণনা করে ৮ কদম হাঁটুন। ফলে দম নেয়ার চেয়ে ছাড়ার সময় একটু বেশি লাগবে।

এভাবে প্রতি বার ৫/৭ মিনিট হাঁটুন। ধীরে ধীরে কদমের সংখ্যা বাড়াতে থাকুন। ৮ কদমে দম নিন। ১০ কদমে ছাড়ুন। ১০ কদমে নিন। ১২ কদমে ছাড়ুন। ১২ কদমে নিন। ১৬ কদমে ছাড়ুন।

উপকারিতা

১. এ প্রাণায়ামটি সবার জন্যে উপযোগী। বিশেষ করে বয়স্কদের জন্যে বিশেষ উপযোগী।

২. যারা অসুখ-বিসুখের জন্যে কোনো ধরনের ব্যায়াম করতে পারেন না, তারা এ প্রাণায়ামটি অভ্যাস করলে সুস্থতা ত্বরান্বিত হবে।

বি. দ্র. : *প্রাণায়ামটি করার সময় যদি বুকে চিনচিন ব্যথা অনুভব করেন, তাহলে বুঝতে হবে ফুসফুসের ক্ষমতা অনুযায়ী মাত্রা বেশি হয়ে যাচ্ছে। যেদিন এরকম অনুভব করবেন সেদিন বন্ধ রাখুন। পরে মাত্রা কমিয়ে ২/৩ মিনিট করুন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে ৫/৭ মিনিট করুন।*

ব্যায়াম ॥
সুস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ

জীবন-অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ নিরাময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো ব্যায়াম। কেন? স্রষ্টা এমনভাবে মানবদেহ সৃষ্টি করেছেন যে, পরিশ্রম করলে আপনি ভালো থাকবেন। পবিত্র কোরআনে সূরা বালাদের ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন—'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।'

অথচ ভালো থাকার নামে আমরা আজ আরাম-আয়েশে ডুবে গিয়েছি। হয়ে পড়েছি শ্রমবিমুখ। কায়িক শ্রমকে আমরা গুরুত্বহীন মনে করছি। কিন্তু চারপাশে একটু খেয়াল করলে দেখব—যারা শারীরিক পরিশ্রম করছেন, দিনরাত নানা রকম পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন, যেমন : দিনমজুর কৃষক রিকশাওয়ালা ইত্যাদি, তারাই তুলনামূলক ভালো আছেন। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক—এ জাতীয় রোগে তারা আক্রান্ত হচ্ছেন একেবারেই কম।

আধুনিক নগরজীবনে আমরা আরাম-আয়েশের অসংখ্য উপকরণের মাঝে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, দিনের পর দিন আমাদের কায়িক পরিশ্রম করার সুযোগ হয় না। কিন্তু সুস্থ থাকতে হলে শারীরিক শ্রমের কোনো বিকল্প নেই। তাই সচেতনভাবে ও পরিকল্পিত উপায়ে আমাদের পরিশ্রম করতে হবে—যদি সুস্থ থাকতে চাই। আর এই সচেতন ও পরিকল্পিত পরিশ্রমটাই হতে পারে ব্যায়াম।

সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় তথা সার্বিক সুস্থতার জন্যে প্রতিদিন কমপক্ষে একঘণ্টা ব্যায়াম করা উচিত। তবে সপ্তাহে ৫ দিন ব্যায়াম করলেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন ব্যায়াম সবচেয়ে উপকারী?

ব্যায়াম মূলত তিন ধরনের

- ☐ অ্যারোবিক (হাঁটা জগিং সাইক্লিং সাঁতার ইত্যাদি)
- ☐ অ্যানারোবিক (ইনস্ট্রুমেন্টাল এক্সারসাইজ)
- ☐ ইয়োগা (যোগব্যায়াম)

তিন ধরনের ব্যায়ামের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী ব্যায়াম ইয়োগা। তবে পরিপূর্ণ উপকার পেতে চাইলে কিছু সময় জোরে জোরে হাঁটাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ, ওজন নিয়ন্ত্রণ তথা সার্বিক ফিটনেসের জন্যে প্রতিদিন ৩০ মিনিট ইয়োগা করুন এবং ঘণ্টায় চার মাইল বেগে কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটুন ও কিছুক্ষণ জগিং করুন।

প্রতিদিন হাঁটুন ॥
আপনার হৃৎপিণ্ড ভালো থাকবে

করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্যে তো বটেই, আপনার সার্বিক সুস্থতার জন্যেই প্রতিদিন নিয়ম করে ৩০ মিনিট থেকে একঘণ্টা হাঁটুন। কোয়ান্টাম ইয়োগার সাথে নিয়মিত হাঁটা যুক্ত হলে ব্যায়ামের সবগুলো উপকারই আপনি পরিপূর্ণভাবে লাভ করবেন। আর হৃদরোগীদের সুস্থতার জন্যে নিয়মিত হাঁটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন?

প্রথমত, আমরা জেনেছি, এইচডিএল কোলেস্টেরল আমাদের শরীরের জন্যে ভালো। প্রয়োজনের তুলনায় এটি যাদের কম, নিয়মিত হাঁটলে তাদের শরীরে এইচডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ে। দ্বিতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, গবেষণায় দেখা গেছে—নিয়মিত হাঁটেন যারা, তাদের হৃৎপিণ্ডের চারপাশে কোলেটারাল সার্কুলেশন তৈরি হয়। সেটা কেমন?

আমরা অনেক সময় শুনি, কারো একটি বা কখনো দুটি করোনারি ধমনীতেই রক্ত চলাচল শতভাগ বন্ধ অর্থাৎ ১০০% ব্লকেজ। মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—তবে তিনি বেঁচে আছেন কী করে? কারণ রক্তনালী শতভাগ বন্ধ হয়ে পড়লে তো হৃৎপিণ্ডের কোষ আর পেশিগুলো প্রয়োজনীয় রক্ত ও পুষ্টির অভাবে পুরোপুরি অকেজো হওয়ার কথা এবং রোগীর মারা যাওয়ার কথা। কিন্তু তার ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে না কেন?

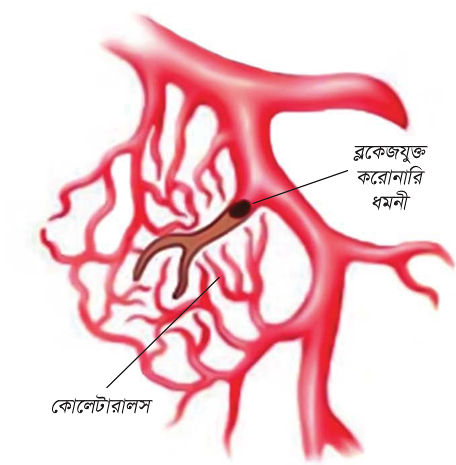

কোলেটারাল সার্কুলেশন বা ন্যাচারাল বাইপাস

এর অন্যতম কারণ হলো, এদের হৃৎপিণ্ডের ব্লকেজ-আক্রান্ত ধমনীর চারপাশে কিছু পরিপূরক রক্তনালী সচল হয়ে ওঠার মাধ্যমে একটি কোলেটারাল সার্কুলেশন গড়ে ওঠে। এখানে যে বিষয়টি ঘটে—হৃৎপিণ্ডের করোনারি

ধমনীর চারপাশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালী থাকে, যারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, ব্যায়াম করেন, বিশেষত যারা নিয়মিত হাঁটেন, তাদের এই রক্তনালীগুলো সচল হয়ে ওঠে এবং মূলত এই বিকল্প রক্ত সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমেই হৃৎপিণ্ডের সব অংশে প্রয়োজনীয় রক্ত পৌঁছে যায়।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালীর সংখ্যা কারো কারো ক্ষেত্রে ২০০-২৫০টি পর্যন্ত হতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে 'ন্যাচারাল বাইপাস' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

আর আপনার হৃৎপিণ্ডে ন্যাচারাল বাইপাস বা কোলেটারাল সার্কুলেশন দারুণভাবে তৈরি হতে পারে জোরকদমে হাঁটার মধ্য দিয়ে। প্রতিদিন নিয়মিত অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটুন। ডাক্তারের বারণ না থাকলে হাঁটার পাশাপাশি কিছুক্ষণ হালকা জগিং করতে পারেন। এতে ন্যাচারাল বাইপাসের সম্ভাবনা আরো ত্বরান্বিত হবে।

তৃতীয়ত, নিয়মিত হাঁটলে দেহের বাড়তি ওজন কমে। উল্লেখ্য, অতিরিক্ত ওজন করোনারি হৃদরোগের একটি অন্যতম কারণ। তাই করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে হাঁটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু তা-ই নয়, যারা নিয়মিত হাঁটেন, তাদের বয়সজনিত স্মৃতিভ্রম রোগ আলঝেইমার্সের ঝুঁকি কমে অনেকখানি। এ-ছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত হাঁটার গুরুত্ব এখন কমবেশি সবাই জানেন।

কীভাবে হাঁটবেন? আপনার হাঁটার গতি হবে ঘণ্টায় চার মাইল। অর্থাৎ মিনিটে প্রায় ১৩০ কদম। কিন্তু প্রথমদিন হাঁটতে নেমেই এ গতিতে হাঁটতে যাবেন না; হাঁটার গতি প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়ান। যদি আপনার হার্টের অবস্থা বিবেচনা করে কার্ডিওলজিস্ট ঘণ্টায় চার মাইল বেগে হাঁটার অনুমতি না দেন, তবে তিনি যেভাবে বলবেন প্রথমে সেভাবেই হাঁটুন। এরপর ধীরে ধীরে গতি বাড়ান।

কোয়ান্টাম ইয়োগা ॥
আধুনিক মানুষের ব্যায়াম

খ্রিষ্টপূর্ব ২,৫০০ অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৪,৫০০ বছর পূর্বে সিন্ধুনদ তীরবর্তী অঞ্চল মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি জাতির বসবাস ছিল। তারা সেই সময় এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, যা পরিচিত ছিল দ্রাবিড় সভ্যতা নামে। তারা 'যোগসাধনার' মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতেন।

'যোগ' (Yoga) শব্দটি এসেছে সংযোগ থেকে। সাধকেরা বলেন, আমাদের আত্মা পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই এত অশান্তি, অতৃপ্তি, এত হাহাকার। তাই পরমাত্মার সাথে আত্মার সংযোগ স্থাপনই ছিল যোগসাধনার উদ্দেশ্য। যোগসাধনার একটি ধাপ হচ্ছে 'আসন', যা সময়ের পথ ধরে আমাদের কাছে যোগব্যায়াম বা ইয়োগা নামে পরিচিতি পেয়েছে।

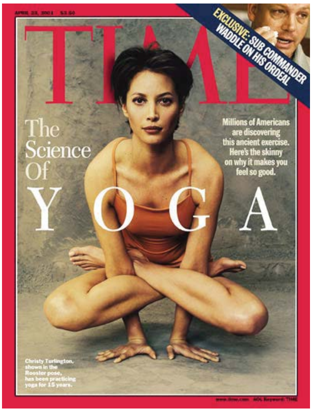

পাশ্চাত্যে একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, সব ধরনের ব্যায়ামের মধ্যে সেরা হলো ইয়োগা। কারণ মানুষ শুধু দেহেরই অধিকারী নয়, তার রয়েছে একটি সংবেদনশীল মন। আর এই দেহ ও মন জন্মাবধি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মনের প্রভাব যেমন দেহে পড়ে তেমনি দেহের সুখ-অসুখও প্রভাবিত করে আমাদের মনকে। আর যোগব্যায়াম হচ্ছে একমাত্র ব্যায়াম, যেখানে দেহের সাথে সাথে আপনি আপনার মনকেও সম্পৃক্ত করতে পারেন। ইয়োগা মনের অস্থিরতা বিষণ্নতা দূর করে। এসব কারণে পাশ্চাত্যেও ইয়োগার জনপ্রিয়তা ও চর্চা দিন দিন বাড়ছে।

এ-ছাড়া যোগব্যায়াম বা ইয়োগার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এ ব্যায়ামে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পেশির জন্যে আলাদা আলাদা আসন রয়েছে। হৃৎপিণ্ডের তথা সার্বিক সুস্থতার জন্যে যে-সকল ইয়োগা করা যেতে পারে : উজ্জীবন, অর্ধচন্দ্রাসন, ত্রিকোণাসন, বৃক্ষাসন, উৎকট আসন,

ভুজঙ্গাসন, অর্ধশলভাসন, শলভাসন, পবনমুক্তাসন, গোমুখাসন, উষ্ট্রাসন, পদ্মাসন, বঙ্গাসন, দণ্ডাসন, বজ্রাসন, শবাসন।

যখন আপনি এই ব্যায়ামগুলো করবেন, তখন অন্যান্য উপকারিতার পাশাপাশি হৃৎপিণ্ড বিশেষভাবে উপকৃত হবে। করোনারি ধমনী প্রসারিত হবে, হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ বাড়বে। ব্যায়ামের সময় যদি আপনি অবলোকন করেন যে, করোনারি ধমনীতে যে ব্লকেজ ছিল তা দূর হয়ে গেছে, সেখানে প্রচুর রক্ত চলাচল করছে, তখন আপনি আপনার মনের শক্তিটাকেও সেখানে যোগ করলেন। দেহকে স্ট্রেসমুক্ত রাখার জন্যে, পেশির টেনশনজনিত অতিরিক্ত সংকোচন দূর করার জন্যে এবং একইসাথে মেরুদণ্ড ও শরীরের সমস্ত অস্থিসন্ধিগুলোকে নমনীয় রাখার জন্যে এর কোনো বিকল্প নেই।

যোগব্যায়াম বা ইয়োগার একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক সংস্করণ কোয়ান্টাম ইয়োগা। বাংলাদেশে আশির দশকের শুরু থেকে দীর্ঘ চার দশকের নিরন্তর চর্চা ও গবেষণার ফল হচ্ছে কোয়ান্টাম ইয়োগা। এখানে বিভিন্ন আসনের সাথে দমের সম্পর্ককে শিথিল করা হয়েছে। ফলে আধুনিক মানুষের কাছে কোয়ান্টাম ইয়োগা দিন দিন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

শুরু করার আগে কোয়ান্টাম ইয়োগার নিয়মাবলি জেনে নিন—

- ☐ আরামদায়ক ঢিলেঢালা পোশাক পরুন।
- ☐ একেবারে খালি পেটে অথবা একেবারে ভরপেটে ইয়োগা করা উচিত নয়। হালকা কিছু খেয়ে ইয়োগা করা যায়। যেমন, ভিজানো কাঁচা ছোলা (২/৩ টেবিল চামচ) অথবা ২/৩ টুকরো কাঁচা পেঁপে।
- ☐ খুব শক্ত বা নরম জায়গায় ইয়োগা করা উচিত নয়। মেঝেতে কার্পেট বা কাঁথা-কম্বল বিছিয়ে তার ওপর চাদর বিছিয়ে ইয়োগা করা উচিত।
- ☐ পূর্ণ আহারের ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা পরে ইয়োগা করা উচিত।
- ☐ আলো-বাতাসপূর্ণ খোলা জায়গায় কিংবা বাতাস চলাচল করে এমন ঘরে ইয়োগা করা ভালো।
- ☐ শীতের সময় ঘরের দরজা-জানালা খুলে বাতাস প্রবেশ করিয়ে নিয়ে ইয়োগা করুন। এতে ঘরে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের সরবরাহ নিশ্চিত হবে।

- ☐ কোয়ান্টাম ইয়োগা করার সময় কথা বলবেন না, গান-বাজনা শুনবেন না। বরং যে আসন করছেন সে আসনের উপকারিতার বিষয়গুলো কল্পনা করুন ও পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে অনুভব করুন।
- ☐ প্রতিদিন ১০-১২টি আসন করতে পারেন।
- ☐ ব্যায়ামের আগে পাঁচ মিনিট শবাসনে শিথিলায়ন করে মনকে স্থির করে ইয়োগা শুরু করুন। ব্যায়ামের শেষে ১০-১৫ মিনিট শবাসন করুন।

বিশেষভাবে লক্ষ করুন

কোনো আসন প্রথমবারেই সঠিক ভঙ্গিমায় জোর করে করার চেষ্টা করবেন না। সহজভাবে যতটুকু পারেন, ততটুকুই করুন। ধীরে ধীরে শরীর নমনীয় হয়ে উঠলে ভঙ্গিমাও ঠিক হয়ে যাবে। তা না হলে হঠাৎ করে শরীরের কোনো জায়গায় টান পড়তে পারে কিংবা মেরুদণ্ডে ঘাড়ে কোমরে টান লেগে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তাই প্রতিটি আসন করতে গিয়ে অতিরিক্ত জোর না খাটিয়ে বরং আপনি যতটুকু পারছেন ততটুকুই করুন।

হৃদরোগ তথা লাইফস্টাইল ডিজিজ নিরাময়ে প্রয়োজনীয় ইয়োগা

কোয়ান্টাম ইয়োগা হচ্ছে মনোদৈহিক ব্যায়াম। ব্যায়ামের সময় নির্দিষ্ট অঙ্গের সুস্থতার মনছবি শরীরের সাথে মনের শক্তির সংযোগ সাধন করে। এর ফলে চর্চাকারী দ্বিগুণ ফল লাভ করে থাকেন।

উজ্জীবন

ব্যায়াম শুরু করার পূর্বে শরীরটাকে উজ্জীবিত করা বা ‘ওয়ার্ম-আপ’ করে নেয়া ভালো। দেহকে একটু উজ্জীবিত করে নিলে দেহ নমনীয় হবে, পরবর্তী আসনগুলো করা সহজ হবে। ১৫ ধাপে বিভক্ত এ অনুশীলনীর মাধ্যমে পেশি ও জয়েন্টের জড়তা কেটে যাবে, ব্যায়াম ও আসনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠবে আপনার শরীর। যে-কোনো ব্যায়ামের আগেই একটু ওয়ার্ম-আপ প্রয়োজন। এই ১৫ ধাপের অনুশীলন শরীরকে সুন্দরভাবে উজ্জীবিত করে বলে একে ‘উজ্জীবন’ বলা হয়। এই অনুশীলনকালে দম স্বাভাবিক থাকবে।

উজ্জীবনের ১৫ ধাপ

পদ্ধতি : দুই পায়ের মাঝখানে চার আঙুল ফাঁক রেখে দুহাত শরীরের দুপাশে রেখে বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ান।

১. বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দুহাত সোজা ওপরে তুলুন। খেয়াল রাখুন আপনার শরীরের ওজন যেন দুই পায়ের ওপর সমানভাবে পড়ে। কোনো দিকে কাত হবেন না বা কোনো পায়ে ভর বেশি দেবেন না।

উজ্জীবন : ছবি–১

উজ্জীবন : ছবি–২

২. ধীরে ধীরে হাত ও মাথা পেছন দিকে নিতে থাকুন। কোমর থেকে মেরুদণ্ড পেছন দিকে বেঁকে যাবে। হাঁটু ভাঙবে না। পা সোজা থাকবে। ঘাড় থাকবে শিথিল। যতদূর সম্ভব শরীর পেছন দিকে বাঁকিয়ে দিন।

উজ্জীবন : ছবি–৩

৩. পুরো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ুন। কপাল যতদূর সম্ভব হাঁটুর কাছাকাছি নিয়ে আসুন। হাতের আঙুল মেঝে স্পর্শ করবে।

উজ্জীবন :
ছবি–৪

৪. হাঁটু ভাঁজ করে কোমর ও মাথা মাটির সমান্তরালে নিয়ে আসুন। হাতের আঙুল ও করতল এবার সুন্দরভাবে মেঝে স্পর্শ করবে। হাতের ওপর কিছুটা ওজন থাকবে।

৫. দুহাতের ওপর ভর দিয়ে প্রথমে ডান পা পেছন দিকে নিন।

উজ্জীবন :
ছবি–৫

৬. এরপর বাম পা-ও পেছন দিকে নিন। পুরো শরীরের ওজন হাত ও পায়ের আঙুলের ওপর পড়বে। মাথা ও কোমর মেঝের সমান্তরাল থাকবে।

উজ্জীবন :
ছবি–৬

উজ্জীবন :
ছবি–৭

৭. পা ও ঊরু মাটির সাথে লেগে থাকবে। কোমর থেকে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে হাতে ভর দিয়ে মাথা যতদূর সম্ভব পেছন দিকে নিয়ে যান।

৮. সমস্ত শরীর মেঝেতে লাগিয়ে দিন। পা হাঁটু পেট বুক কপাল—সব মেঝেতে লেগে যাবে, হাত দুটো থাকবে মাথার দুপাশে।

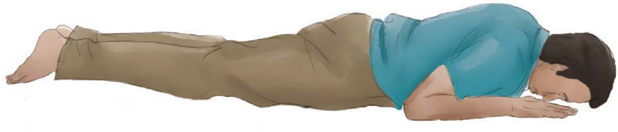

উজ্জীবন : ছবি–৮

উজ্জীবন : ছবি–৯

৯. হাতের ওপর ভর দিয়ে আবার মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে দিন। হাঁটু জোড়া লেগে থাকবে। (৭নং অবস্থানের মতো)

১০. আগের মতো দুহাত ও দুপায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে কোমর ও মাথা মাটির সমান্তরাল রাখুন। (৬নং অবস্থানের মতো)

উজ্জীবন : ছবি–১০

১১. প্রথমে ডান পা হাতের সামনে আনুন। অন্য পায়ের পাতা পেছনে মাটিতে লাগানো থাকবে। (৫নং অবস্থানের মতো)

উজ্জীবন : ছবি–১১

উজ্জীবন :
ছবি–১২

১২. হাঁটু ভাঙা অবস্থায় দুহাতের পাশে দুই পা রাখুন। কোমর ও মাথা মেঝের সমান্তরাল থাকবে। (৪নং অবস্থানের মতো)

১৩. দুই পায়ের ওপর ওজন রেখে হাঁটু সোজা করুন। কপাল হাঁটুর কাছাকাছি থাকবে। হাতের আঙুল মাটি স্পর্শ করবে।
(৩নং অবস্থানের মতো)

উজ্জীবন : ছবি–১৩

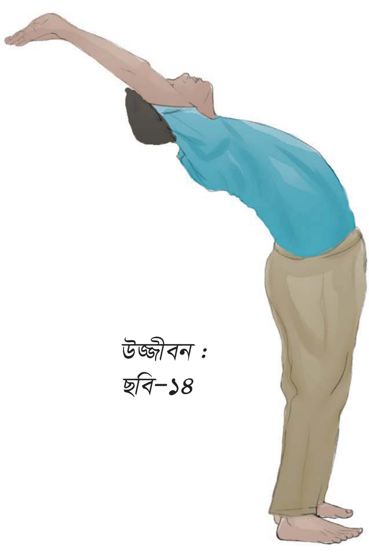

উজ্জীবন :
ছবি–১৪

১৪. হাঁটুর কাছ থেকে মাথা উঠিয়ে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে একেবারে পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে দিন। হাত দুটো মাথার পেছনে থাকবে। (২নং অবস্থানের মতো)

১৫. এবার বুক টান করে হাত সোজা ওপরের দিকে আনুন। (১নং অবস্থানের মতো)

এবার দুহাত শরীরের দুপাশে রাখুন। আরাম করে দাঁড়ান। এভাবে ৫ থেকে ১০ বার করতে পারেন।

সতর্কতা

যাদের বাইপাস সার্জারি হয়েছে এবং যারা বিভিন্ন কারণে ব্যাকপেইন অর্থাৎ কোমর বা পিঠের ব্যথায় ভুগছেন, তারা উজ্জীবন করা থেকে বিরত থাকুন।

উজ্জীবন : ছবি–১৫

অর্ধচন্দ্রাসন

পদ্ধতি : প্রথমে দুই পা ও মেরুদণ্ড সোজা করে দুই পায়ের পাতা কাছাকাছি রেখে দাঁড়ান। এবার দুহাত মাথার ওপরে তুলুন। হাত দুটো যেন কানের সাথে লেগে থাকে। দুহাতের তালু একত্রে চেপে রাখুন (১নং ছবির মতো)। এবার কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ ধীরে ধীরে ডান দিকে বাঁকান (২নং ছবির মতো)। একইভাবে ১নং ছবির মতো অবস্থানে ফিরে এসে কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ ধীরে ধীরে বাম দিকে বাঁকান (৩নং ছবির মতো)। দম স্বাভাবিক রাখুন। খেয়াল রাখুন যেন শরীর সামনে কিংবা পেছনে ঝুঁকে না যায়।

আয়নার সামনে এটি করলে আপনি সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন। এভাবে একবার ডানে ও একবার বামে—প্রত্যেক পাশে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড করে অবস্থান করুন। তবে সহজভাবে যতটুকু পারেন করুন। জোর করে করবেন না। একবার ডানে ও একবার বামে মিলে এক প্রস্থ হয়। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করুন।

অর্ধচন্দ্রাসন : ছবি–১

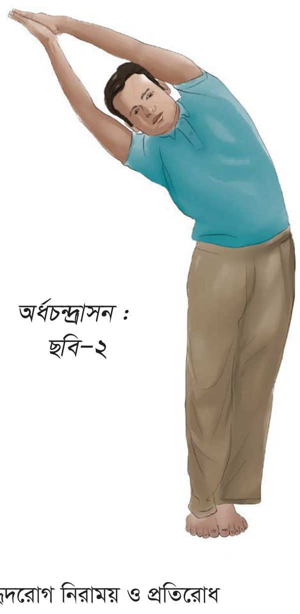

অর্ধচন্দ্রাসন : ছবি–২

অর্ধচন্দ্রাসন : ছবি–৩

ত্রিকোণাসন

পদ্ধতি : প্রথমে শরীর সোজা রেখে দাঁড়ান। এবার দুই পা আড়াই থেকে তিন ফুট পরিমাণ ফাঁক করুন। এরপর হাত দুটো শরীরের দুপাশে কাঁধ বরাবর উঁচু করুন। হাতের তালু নিম্নমুখী করে রাখুন। (১নং ছবির মতো)

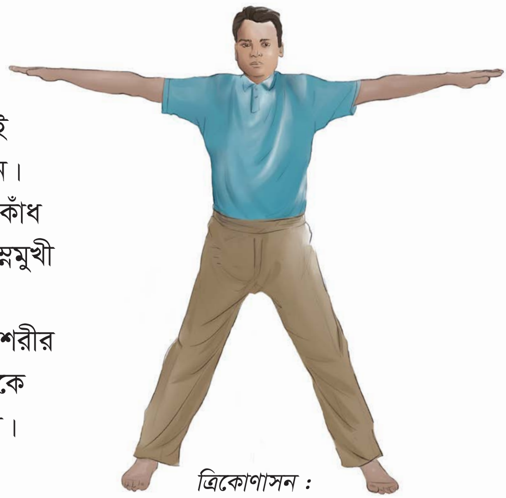

ত্রিকোণাসন : ছবি–১

এবার পা থেকে কোমর পর্যন্ত শরীর সোজা রেখে সামনে/ পেছনে না ঝুঁকে আস্তে আস্তে ডান দিকে বাঁকা করুন। খেয়াল রাখুন যেন হাঁটু না ভাঙে। এবার আস্তে আস্তে ডান দিকে বাঁকিয়ে ডান পায়ের পাতা স্পর্শ করতে চেষ্টা করুন। সহজভাবে যতটুকু হাত যায় ততটুকুই রাখুন। কিছুদিন অভ্যাস করলে আসনটি সঠিক ভঙ্গিমায় করতে পারবেন। এভাবে প্রথমে ডান দিকে, পরে বাম দিকে করুন। একবার ডানে আর একবার বামে মিলে হয় এক প্রস্থ। এভাবে ৩ থেকে ৫ প্রস্থ করতে পারেন।

প্রত্যেক পাশে অবস্থানে সময় নিন ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড। দম স্বাভাবিক রাখুন। যেদিকে বাঁকাবেন সেদিকের হাত নিচে ও অপর হাত মাথার ওপরে তুলে রাখুন। দৃষ্টি থাকবে ওপরের হাতের আঙুলে। (২নং ছবির মতো)

ত্রিকোণাসন : ছবি–২

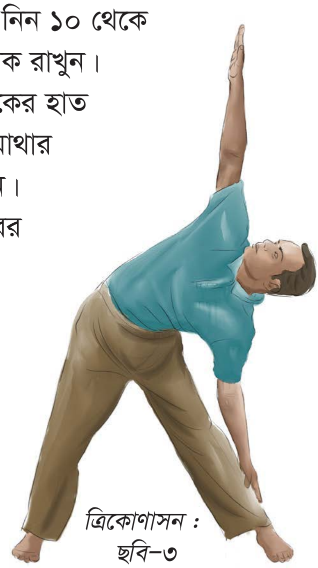

ত্রিকোণাসন : ছবি–৩

বৃক্ষাসন

বৃক্ষাসন :
ছবি–১

বৃক্ষাসন :
ছবি–২

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দুই পা সোজা করে মাটিতে দাঁড়ান। এবার (১নং ছবির মতো) প্রথমে ডান পা তুলে বাম পায়ের ঊরুর একেবারে শেষ প্রান্তে নিয়ে রাখুন। ডান পায়ের পাতা বাম ঊরুর সাথে লেগে থাকবে। এবার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে হাত দুটো কাঁধের দুপাশে রাখুন। এবার এ অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে হাত মাথার ওপরে নিয়ে দুহাতের তালু (২নং ছবির মতো) একত্রে জোড় করে রাখুন। এ অবস্থায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। আবার বাম পা তুলে একইভাবে ডান পায়ের ঊরুর সাথে লাগিয়ে মাথার ওপর দুহাত জোড় করে রাখুন। এ ভঙ্গিমায় গিয়ে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। দম স্বাভাবিক থাকবে। এভাবে ডানে ও বামে মিলে এক প্রস্থ হয়। এ আসন তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন।

তুলাসন বা
উৎকট আসন

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দুই পা একফুট পরিমাণে কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম ফাঁক রেখে দাঁড়ান। হাত দুটো সামনের দিকে (ছবির মতো) ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে বসার ভঙ্গিমায় বসুন। হাতের তালু নিচের দিকে মাটি থেকে সমান্তরাল অবস্থায় থাকবে। দম স্বাভাবিক থাকবে। এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, প্রথমদিকে যেটুকু সময় পারেন ততটুকুই করবেন। অভ্যস্ত হলে পরে নির্ধারিত সময় নিয়ে করতে পারবেন।

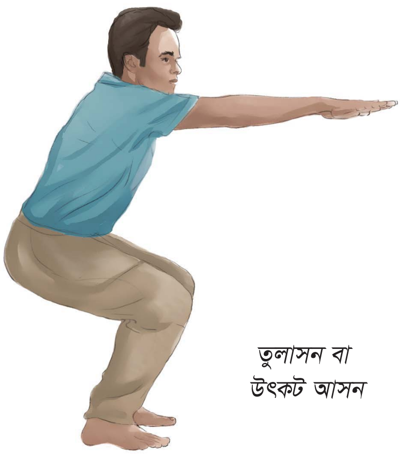

*তুলাসন বা
উৎকট আসন*

ভুজঙ্গাসন

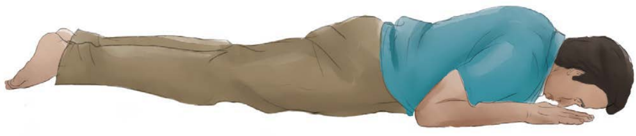

ভুজঙ্গাসন :
ছবি–১

ভুজঙ্গাসন :
ছবি–২

পদ্ধতি : প্রথমে উপুড় হয়ে দুই পা জোড় করে সোজা রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। মাথাটা বামে অথবা ডানে—যেদিকে ইচ্ছে কাত করে রাখুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে ও হাতের পাতা মাটিতে লেগে থাকবে।

এবার (১নং ছবির মতো) হাত দুটো টেনে নিয়ে এসে দুবাহু বরাবর উপুড় করে রাখুন। হাতের ওপর ভর করে মাথা ওপরে তুলুন। বুক মাটি থেকে ওপরে উঠবে। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পা জোড় অবস্থায় সোজা থাকবে। নাভি মেঝেতে লেগে থাকবে। দম থাকবে স্বাভাবিক। (২নং ছবির মতো) এভাবে পূর্ণ ভঙ্গিমায় এসে ১০/১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন। ভুজঙ্গ অর্থ সাপ। সাপের ফনার মতো দেখতে লাগে বলে আসনটির নাম ভুজঙ্গাসন।

প্রথমদিকে পা জোড় অবস্থায় আসনটি না করতে পারলে পা দুটো সুবিধামতো ফাঁক করে অভ্যাস করতে পারেন। ধীরে ধীরে শরীর নমনীয় হয়ে এলে পরে সঠিক ভঙ্গিমায় আসনটি করতে পারবেন। জোর করে একবারে করতে যাবেন না।

অর্ধশলভাসন ও শলভাসন

পদ্ধতি : প্রথমে উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের সাথে দুপাশে লাগিয়ে রাখুন। এবার মেঝেতে হাতের তালু লাগিয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ করুন। থুতনি মেঝেতে লেগে থাকবে।

এবার দম স্বাভাবিক রেখে প্রথমে ডান পা সোজা রেখে হাঁটু না ভেঙে ওপরের দিকে তুলুন। বাম পা মাটিতে লেগে থাকবে। খেয়াল রাখুন পা যেন ডানে/ বামে বেঁকে না যায়। সোজা ওপরে তুলতে হবে। এ ভঙ্গিমায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। একই পদ্ধতিতে এরপর বাম পা তুলে ডান পা মাটিতে রাখুন। একবার ডান পা ও একবার বাম পা মিলে এক প্রস্থ হয়। এভাবে তিন/ পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন। একে বলে অর্ধ-শলভাসন। এভাবে আলাদা আলাদাভাবে দুই পা তুলে অভ্যাস হলে পরে একইসাথে (২নং ছবির মতো) দুই পা একত্রে জোড়া লাগিয়ে হাঁটু না ভেঙে ও মাথা না তুলে করতে পারবেন। একে বলে পূর্ণ-শলভাসন।

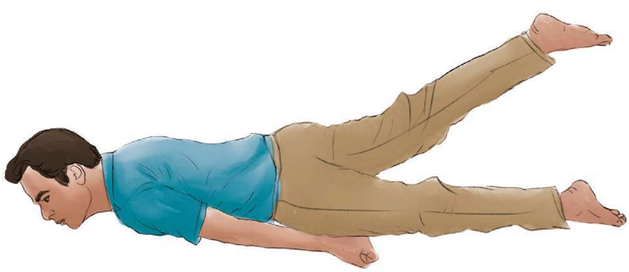

অর্ধশলভাসন : ছবি–১

শলভাসন : ছবি–২

পবনমুক্তাসন

পবনমুক্তাসন : ছবি–১

পদ্ধতি : প্রথমে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার দম স্বাভাবিক রেখে প্রথমে ডান পা তুলে হাঁটু ভাঁজ করে বুকের কাছে এনে দুহাত দিয়ে চেপে ধরুন। ঊরু পেটের সাথে লেগে থাকবে (১নং ছবির মতো)। যদি পেটে চাপ না পড়ে অর্থাৎ ঊরু সঠিকভাবে লাগতে না চায়, তাহলে একটা তোয়ালে ভাঁজ করে পেটের ওপর রেখে দিন। তাহলে সহজে চাপ লাগবে। কয়েক দিন অনুশীলন করার পর এমনিতেই হাঁটু বুকের কাছে লাগবে।

এভাবে (১নং ছবির মতো) প্রথমে ডান পা বুকের সাথে লাগিয়ে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তারপর বাম পা ভাঁজ করে বুকের সাথে লাগান। তারপর দুই পা সোজা করে মাটিতে রাখুন। এবার একত্রে দুই পা ভাঁজ করে বুকের কাছে নিয়ে এসে চেপে ধরুন (২নং ছবির মতো)।

পবনমুক্তাসন : ছবি–২

এভাবে প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা, তারপর দুই পা একত্রে—এরকম তিন ধাপ মিলে এক প্রস্থ হবে। এভাবে তিন থেকে পাঁচ প্রস্থ করতে পারেন।

***বি.দ্র. :** এ আসন করলে পেটের মধ্যে বায়ু জমতে পারে না কিংবা কোনো কারণে বায়ু হলে তা নির্গমন হয়। তবে এ আসনটি করার সময় অবশ্যই প্রথমে ডান পা তুলে করবেন। কারণ যদি প্রথমে বাম পা তুলে করেন, তাহলে পেটের মধ্য-কোলনে যে বায়ু জমে আছে তা বের না হয়ে অবরোহী কোলন থেকে আরোহী কোলনে প্রবেশ করবে। ফলে বায়ুর বহির্গমন হবে না। তাই প্রথমে ডান পা তুলে করতে হবে।*

গোমুখাসন

গোমুখাসন : ছবি–১

গোমুখাসন : ছবি–২

পদ্ধতি : প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা করে দুই পা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসুন। এবার বাম পায়ের হাঁটু ভেঙে ডান পায়ের নিচ দিয়ে নিয়ে এসে ডান নিতম্বের কাছে নিয়ে রাখুন। বাম পায়ের গোড়ালি ডান নিতম্বের সাথে লেগে থাকবে। তবে যদি না লাগাতে পারেন জোর করে লাগাতে যাবেন না। আস্তে আস্তে অভ্যাস হলে লেগে যাবে।

এবার ডান পা হাঁটু ভেঙে বাম উরুর ওপর দিয়ে এনে এমনভাবে রাখুন যাতে বাম নিতম্বের সাথে ডান পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করে। পায়ের পাতার পিঠ মাটিতে বিছানো থাকবে (১নং ছবি দেখুন)। এবার ডান হাত ডান কাঁধের ওপর নিয়ে এসে যতদূর পারেন পিঠের ওপর রাখুন। হাতের পাতা উপুড় অবস্থায় পিঠের ওপর থাকবে। এবার বাম হাত কোমরের কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে পিঠের ওপর রাখা ডান হাতটি ধরতে চেষ্টা করুন (২নং ছবির মতো)। ডান হাত দিয়ে বাম হাত আটকে ধরুন।

এ আসনে যেদিকের পা ওপরে থাকবে সেদিকের হাত কাঁধের ওপরে থাকবে, হাত কানের সাথে লেগে থাকবে। অর্থাৎ বাম পা ওপরে থাকলে বাম হাত কাঁধের ওপর থাকবে। ডান পা ওপরে থাকলে ডান হাত কাঁধের ওপরে থাকবে। মেরুদণ্ড ও শরীর সবসময় সোজা থাকবে। সামনে বা পেছনে, ডানে

বা বামে যেন বেঁকে না যায়। দম স্বাভাবিক রেখে ডান পা ওপরে রাখা অবস্থায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করুন। আবার বাম পা ওপরে রাখা অবস্থায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড অবস্থান করুন। এভাবে ডানে-বামে মিলে এক প্রস্থ হবে।

এভাবে ৩ থেকে ৫ প্রস্থ করতে পারেন। পরে অভ্যাস হলে একবারেই এক পাশে ১ থেকে ৩ মিনিট করতে পারেন। আর যদি ২০ সেকেন্ডও হাত ধরে রাখতে না পারেন অসুবিধে নেই। যতটুকু সহজভাবে পারেন করুন। তাতেও ফল হবে। নিয়মিত চর্চা করলে সঠিক ভঙ্গিমায় আসনটি অনেকক্ষণ করতে পারবেন। এক হাঁটুর ওপর অন্য হাঁটু এমনভাবে থাকে—দেখতে গরুর মুখের মতো দেখায়। তাই এ আসনের নাম গোমুখাসন।

উষ্ট্রাসন

উষ্ট্রাসন : ছবি–১

উষ্ট্রাসন : ছবি–২

পদ্ধতি : প্রথমে দুই হাঁটুর ওপর ভর করে (১নং ছবির মতো) দাঁড়ান। দুই হাঁটুসহ দুই পা লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাটির সঙ্গে লেগে থাকবে। এবার দম স্বাভাবিক রেখে দুহাত দিয়ে দুপায়ের গোড়ালি ধরুন। বুক ও পেট যতটা সম্ভব সামনের দিকে এবং ঘাড় ও মাথা পেছন দিকে বাঁকিয়ে ধনুকের মতো করুন। এ অবস্থায় ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অবস্থান করুন। তারপর আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসুন। এভাবে তিন থেকে পাঁচ বার করতে পারেন।

তবে মনে রাখবেন—যদি প্রথম অবস্থায় পা জোড়া লাগিয়ে না করতে পারেন তাহলে দুই হাঁটু, পা ফাঁকা করে করলে সহজে করতে পারবেন। দুহাত একত্রে গোড়ালির ওপর না রাখতে পারলে একহাত দিয়ে ধরুন, অন্য হাত দিয়ে খাটের পাশে করলে খাট ধরুন কিংবা দেয়াল ধরে করুন। এভাবে হাত পাল্টে একবার ডান হাত দিয়ে ডান পা আবার বাম হাত দিয়ে বাম পা ধরতে চেষ্টা করুন। এভাবে কিছুদিন অভ্যাস করলে সঠিক ভঙ্গিমায় আসনটি করতে পারবেন। এ আসনটিতে শরীরের মধ্যভাগ উটের মতো উঁচু হয়ে থাকে বলে একে উষ্ট্রাসন বলা হয়।

পদ্মাসন

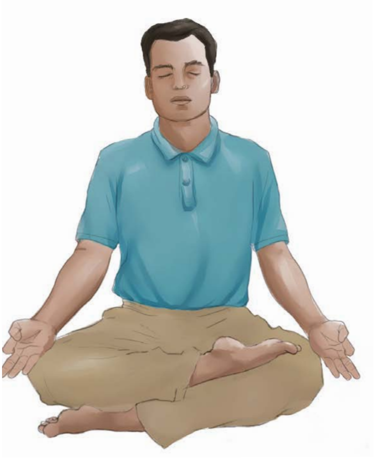

সহজ পদ্মাসন : ছবি–১

পদ্ধতি : প্রথমে দুই পা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসুন। এবার হাত দিয়ে ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ করে বাম পায়ের উরুর ওপর রাখুন। তারপর বাম পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে একই নিয়মে ডান উরুর ওপর রাখুন এবং দুই পায়ের গোড়ালি দুটো যেন নিচের পেট স্পর্শ করে (২নং ছবির মতো)। হাত দুটো দুই হাঁটুর ওপর রাখুন। হাতের তালু ওপরের দিকে থাকবে এবং হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী (ছবির মতো) ধরে রাখুন।

মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। (২নং ছবির মতো) সঠিক অবস্থায় বসে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম নিন (বুক ফুলিয়ে)। এরপর দম ৫/৭ সেকেন্ড ধরে ছাড়ুন। ছাড়ার সময় আপনার পেট ভেতরের দিকে বসে যাবে। অর্থাৎ দম নিন বুকে, ছাড়ুন সম্পূর্ণরূপে এবং দম নেয়ার চেয়ে ছাড়ার সময় একটু বেশি নিন।

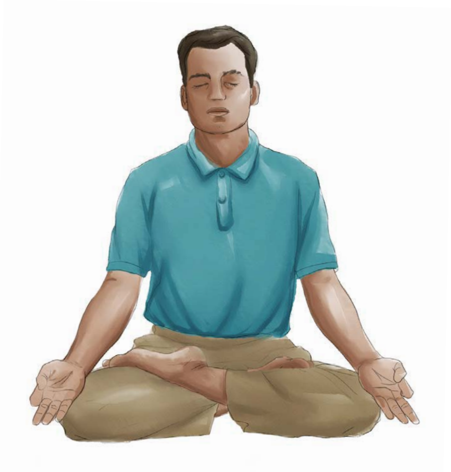

পদ্মাসন : ছবি–২

এভাবে এক থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত পদ্মাসনে বসে প্রাণায়াম করতে পারেন। প্রয়োজনে পা অদলবদল করে নিতে পারেন। যতদিন অভ্যস্ত না হন ততদিন প্রথমে সহজ পদ্মাসনে অর্থাৎ এক পায়ে করে অভ্যাস করুন (১নং ছবির মতো)। মনে রাখবেন—অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো আসন জোর করে করবেন না। নিয়মিত করলে ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে এবং সঠিক ভঙ্গিমায় করতে পারবেন।

বঙ্গাসন

বঙ্গাসন

পদ্ধতি : দুই পায়ের মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে এমনভাবে দাঁড়ান যেন দেহের ভর সমান থাকে। এরপর হাঁটু ভেঙে সহজভাবে বসুন যাতে নিতম্ব মেঝের সাথে না লাগে এবং গোড়ালির কাছাকাছি থাকে। দুই গোড়ালির মধ্যে কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি বা আরামদায়ক দূরত্ব বজায় রাখুন। এবার দুই হাত হাঁটুর ওপরে রাখুন। চাইলে দুই হাতের আঙুল পরস্পরের খাঁজে ঢুকিয়ে রাখুন। মেরুদণ্ড সোজা রাখার চেষ্টা করুন। দম স্বাভাবিক রেখে কয়েক মিনিট বসুন। অভ্যাস হলে ধীরে ধীরে ১৫-৩০ মিনিট করুন।

উপকারিতা :

- পায়ের পেশি পাঁচ গুণ বেশি তৎপর থাকে ও মজবুত হয়। দাঁড়িয়ে থাকার সমান ক্যালরি খরচ হয়।
- বাড়তি মেদ ঝরে যায়। কোলেস্টেরল কমে।
- পরিপাকতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ে। হজম ভালো হয়। আইবিএস-এর মতো হজমজনিত ভোগান্তি দূর হয়।
- হাঁটু কোমর গোড়ালির জয়েন্টের জড়তা দূর হয়। এসব অংশের হাড় ও পেশি দীর্ঘদিন কর্মক্ষম থাকে। হাঁটাচলা ও প্রয়োজনমতো নড়াচড়ার সক্ষমতা বাড়ে।
- পুরুষদের প্রোস্টেট ও ব্লাডার এবং মহিলাদের জরায়ু নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুগুলো সুরক্ষিত থাকে।
- হার্নিয়া, ডাইভার্টিকুলোসিস ইত্যাদি রোগ ও পেলভিক অর্গানগুলোর স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা কমে।

- শরীরের নিম্নাংশে রক্তপ্রবাহ ও লসিকাপ্রবাহ বাড়ে। ফলে বাড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। পায়ের পেশিতে টান লাগা (মাসল ক্র্যাম্প/ মাসল পুল) প্রতিরোধ হয়।
- গর্ভধারণের শুরু থেকেই নিয়মিত বজ্রাসন চর্চায় সন্তানসম্ভবা নারীদের স্বাভাবিক প্রসবের সম্ভাবনা বাড়ে।

দণ্ডাসন

পদ্ধতি : সমান জায়গায় দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ান। দুই পায়ের মাঝে সামান্য ফাঁক থাকবে। দুই হাত দেহের দুপাশে শিথিলভাবে থাকবে। হাঁটু সোজা থাকবে। পায়ের পাতা মাটির সাথে লেগে থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। দম স্বাভাবিক রেখে কয়েক মিনিট অবস্থান করুন। অভ্যস্ত হলে দীর্ঘসময় থাকতে পারবেন।

উপকারিতা :

- গোড়ালি, হাঁটু এবং ঊরুর পেশি শক্তিশালী হয়।
- শরীরের ক্লান্তি দূর হয়।
- মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়।
- সায়াটিকার ব্যথা দূর করে।
- স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে।
- সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে ভালো রাখে।
- ফ্ল্যাটফুট-এর সমস্যা দূর করে।
- দেহের ভারসাম্য বৃদ্ধি পায়।
- সঠিকভাবে দাঁড়ানোর কৌশল আয়ত্ত করা সহজ হয়।

দণ্ডাসন

বজ্রাসন

পদ্ধতি : দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়ান। মেরুদণ্ড সোজা রেখে এমনভাবে বসুন যাতে নিতম্ব গোড়ালির সাথে লেগে থাকে। পায়ের পাতা ছড়িয়ে দিন। দুই গোড়ালির মধ্যে একটু ফাঁকা থাকতে পারে। দুই হাঁটু জোড়া লেগে থাকবে। এরপর দুই হাত, হাঁটুর ওপর টান টান করে রাখুন। প্রথমদিকে যতক্ষণ পারেন করুন। ধীরে ধীরে ১০ থেকে ৩০ মিনিট করুন।

বজ্রাসন

উপকারিতা :

- তিন বেলা খাবারের পর বজ্রাসনে বসলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়।
- সায়াটিকা বাত, হাঁটুর বাতব্যথা দূর করে পা-কে সুস্থ রাখে।
- দেহের নিচের অংশকে বজ্রের মতো সুদৃঢ় করে।
- নিয়মিত অভ্যাসে পায়ের পেশি ও স্নায়ু সবল হয়।

শবাসন

শবাসন

সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন ব্যায়ামের পূর্বে এবং ব্যায়ামের পরে পাঁচ থেকে ১০ মিনিট করতে পারেন। শব অর্থ লাশ। মৃতদেহ বা লাশের মতো পড়ে থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে শরীর পুরোপুরি শিথিল বা নরম করে দিয়ে হাত-পা পুরোপুরি ছেড়ে দিলে যেমন লাগে, সেভাবে আপনি চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিন। তবে দুই পায়ের মাঝে একহাত পরিমাণ ফাঁক রাখলে ভালো।

হাত দুটো শরীরের দুপাশে ও হাতের তালু ওপরের দিকে রাখুন। এরপর চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে ৩/৪ বার লম্বা দম নিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। তারপর স্বাভাবিকভাবে দম নিতে নিতে ভাবুন, আপনার শরীর পুরোপুরি শিথিল অর্থাৎ নিস্তেজ হয়ে আসছে, বেশ আরাম লাগছে।

এবার কল্পনা করুন, আপনি একটি সুন্দর মনোরম ফুলের বাগানে সবুজ নরম ঘাসের ওপর শুয়ে আছেন। গ্রীষ্মকাল হলে ভাবুন, দখিনা বাতাস আপনার শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে আর শীতকাল হলে ভাবুন, ঈষদুষ্ণ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। বেশ আরাম আরাম লাগছে। এসময় মন থেকে সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিন। কল্পনার রাজ্যে কিছুক্ষণ বিচরণ করুন। শবাসন করার সময় বিশ্বাসের সাথে ভাবুন—আপনার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনার খুব আরাম লাগছে। এভাবে ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেলেও ক্ষতি নেই।

সহজ শিথিলায়ন বা শবাসন উপুড় হয়ে শুয়েও করতে পারেন। তবে ব্যায়াম চলাকালে উপুড় হয়ে ব্যায়াম করার সময় যদি একটু বিশ্রাম নিতে চান, তখন উপুড় হয়ে এক মিনিট শবাসন করে নিতে পারেন। সাধারণভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে শবাসন বা সহজ শিথিলায়ন করবেন।

ধূমপান ॥ নীরবে বাড়িয়ে চলে হৃদরোগের ঝুঁকি

নিকোটিন ॥ হার্ট অ্যাটাকের কারণ । ২০১

ধূমপানের বদভ্যাস থেকে মুক্ত হোন । ২০৩

মেডিটেশন ॥ ধূমপান বর্জন । ২০৫

ধূমপান, কোমল পানীয় বা এনার্জি ড্রিংকস পান নেশার প্রথম স্তর। এর দ্বিতীয় স্তরই হচ্ছে ড্রাগ ও এলকোহল আসক্তি।

ধূমপান ॥ নীরবে বাড়িয়ে চলে হৃদরোগের ঝুঁকি

বলা হয়ে থাকে, একটি সিগারেটের একপ্রান্তে থাকে আগুন আর অন্যপ্রান্তে থাকে একজন আহাম্মক। যদিও ধূমপান নিয়ে এটি নিছকই একটি কৌতুক, কিন্তু জেনে রাখুন, ধূমপান নীরবে বাড়িয়ে চলেছে আপনার করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি। বিষয়টি যখন আপনার কাছে আরো দৃশ্যমান আর স্পষ্ট হয়ে উঠবে, ততদিনে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে। সচেতন হওয়ার সময় আপনি আর না-ও পেতে পারেন।

ধূমপানকে একসময় পৌরুষের প্রতীক মনে করা হলেও, গত শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা এবং বাংলাদেশে প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে ধূমপানবিরোধী আন্দোলন 'আধূনিক' শুরু হওয়ার পর থেকে ধূমপায়ীকে মনে করা হয় সমাজের একজন অসচেতন ব্যক্তি। পৌরুষ তো নয়ই, বরং ধূমপানকে এখন একটি গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নিকোটিন ॥ হার্ট অ্যাটাকের কারণ

সিগারেটে 'সুখটান' দেয়া ধূমপায়ীরা কি জানেন, তারা কী পান করছেন? ধূমপানের সঙ্গে তারা প্রায় ৭,০০০ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিজের ভেতরে টেনে নিচ্ছেন, যার সবই শরীরের জন্যে বিষ।

এসব বিষের একটি হলো নিকোটিন। সবচেয়ে ভয়ের কথাটি হলো, এই নিকোটিন হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীর দেয়ালে অযাচিত সংকোচন ঘটায় (Coronary artery spasm), ফলে ধমনী-পথে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই বাড়ে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি। গবেষণায় দেখা গেছে, অন্য যে-কারো চেয়ে একজন ধূমপায়ীর হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা ছয় গুণেরও বেশি!

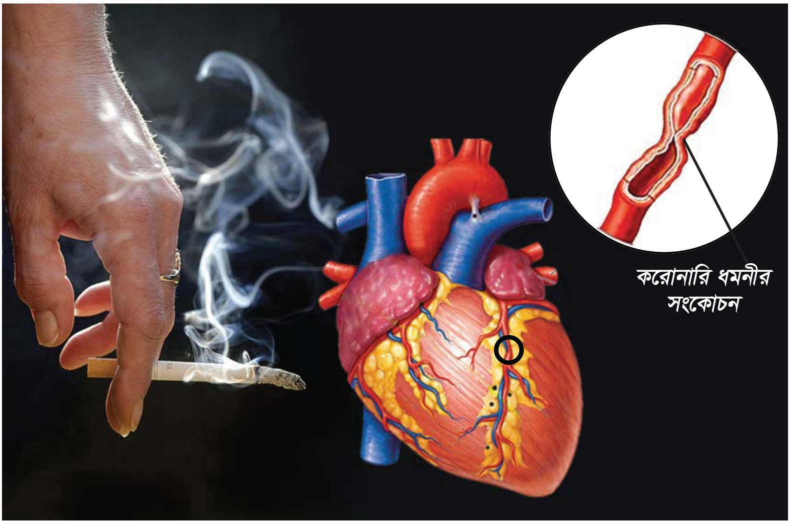

ধূমপান করোনারি ধমনীর অযাচিত সংকোচন ঘটায় (Coronary artery spasm)

জানা প্রয়োজন, ইতোমধ্যে করোনারি হৃদরোগে ভুগছেন যারা, তাদের জন্যে অনেক সময় একটি সিগারেটও হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনায় আপনি এমনিতেই ভেঙে পড়েছেন, মুষড়ে পড়েছেন, ভুগছেন মারাত্মক দুশ্চিন্তা ও স্ট্রেসে। আমরা আগেই জেনেছি, স্ট্রেস হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীকে সংকুচিত করে। উপরন্তু আপনি টেনশন মুক্তির তথাকথিত উপায় হিসেবে সিগারেট ফুঁকছেন আর পায়চারি করছেন। এদিকে দুয়ে মিলে ধমনীর সংকোচন হঠাৎ আরো বেড়ে যেতে পারে এবং যে-কোনো সময় ঘটে যেতে পারে হার্ট অ্যাটাকের মতো দুর্ঘটনা।

শুধু তা-ই নয়, ধূমপান নানাভাবে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। যেমন, ধূমপানের ফলে শরীরের জন্যে উপকারী কোলেস্টেরল এইচডিএলের পরিমাণ কমে যায় এবং বাড়ে ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ।

এ-ছাড়াও ধূমপান যে ক্যান্সারের কারণ, এটি এখন আর কারো অজানা নয়। সেইসাথে অন্যান্য রোগঝুঁকি তো আছেই। গবেষণায় দেখা গেছে, সাধারণভাবে ধূমপায়ীরা অধূমপায়ীদের চেয়ে ২২ বছর আগে মারা যেতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃথিবীতে প্রতিবছর প্রায় ৫০ লক্ষ প্রাণহানি ঘটে কেবল ধূমপানজনিত রোগের কারণেই।

একজন ধূমপায়ী শুধু যে নিজের ক্ষতিই করেন তা নয়; চরম অসচেতনতার পরিচয় দিয়ে তিনি নির্বিকারে তার চারপাশের মানুষ ও পরিবেশের ক্ষতিও করে যাচ্ছেন। বলা হয়, প্রত্যক্ষ ধূমপানের চেয়ে পরোক্ষ ধূমপান (Passive smoking) কোনো অংশে কম ক্ষতিকর নয়। অর্থাৎ একজন ধূমপায়ীর সিগারেটের ধোঁয়া থেকে তার স্বামী/ স্ত্রী সন্তানসহ পরিবারের সদস্য এবং সহকর্মী প্রিয়জন কেউই ঝুঁকিমুক্ত নন।

তাই হৃদযন্ত্রের সুস্থতা তো বটেই, সেইসাথে নিজের ও প্রিয়জনদের সার্বিক সুস্থতা এবং সুস্বাস্থ্যের জন্যেই আমাদের প্রয়োজন ধূমপানমুক্ত সুস্থ সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা।

ধূমপানের বদভ্যাস থেকে মুক্ত হোন

ধূমপান বর্জনের জন্যে আপনি একটি কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। গত তিন দশকে অসংখ্য মানুষ এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করে এ বদভ্যাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়েছেন।

১. ধূমপান ছাড়ার জন্যে বাস্তবে কোনো দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন নেই। এজন্যে নিজের ইচ্ছা আর সিদ্ধান্তটাই যথেষ্ট।

২. অনেকেই সিগারেট ছাড়ার কথা ভেবে পকেটে সিগারেট রাখেন না। ভাবেন, পকেটে থাকলেই খেতে ইচ্ছে করবে। তারা বুঝতে পারেন না যে, সাথে না থাকলে ধূমপানের ইচ্ছেটা আরো বেশি হবে। পকেটে সিগারেট না রাখলে দেখা যাবে, আপনি অন্যের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিচ্ছেন। তাই সিগারেট ও ম্যাচ পকেটেই রাখুন।

৩. আপনি শুধু খেয়াল রাখুন, কখন আপনি সিগারেট ধরান। ধূমপানের ইচ্ছা একেকজনের মধ্যে একেক সময়ে জাগে। কেউ টেলিফোনে আলাপ করতে করতে, কেউ কোনো আলোচনার শুরুতে, কেউ টিভি দেখার সময়, কেউ খাবারের পর পর, কেউ-বা আবার চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সিগারেট ধরান। এ সময়গুলোতে তিনি অনেকটা নিজের অজান্তেই সিগারেট ধরিয়ে ফেলেন।

আজ থেকে আপনি শুধু অন্য কাজ করার সময় ধূমপান করা থেকে বিরত থাকুন। যদি সিগারেট ধরিয়ে ফেলার পর খেয়াল হয় যে, আপনি সিগারেট

ধরিয়ে ফেলেছেন, তাহলে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি এখন সত্যি সত্যি ধূমপান করতে চান কিনা।

৪. যদি সত্যি সত্যিই সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহলে অন্য সব কাজ বাদ দিয়ে আরাম করে বসুন। চুপচাপ বসে সিগারেট খান। মনোযোগ দিয়ে সিগারেট খান।

৫. সিগারেট খাওয়ার সময় শরীরের প্রতি মনোযোগ দিন। চোখ বন্ধ করে সিগারেটে টান দিয়ে অবলোকন করুন, সিগারেটের ধোঁয়া নাক দিয়ে ভেতরে যাচ্ছে। যেতে যেতে তা একটা গোখরা সাপের আকার ধারণ করছে। ফুসফুসে গিয়েই ফণা তুলে ছোবল মারছে। ঢেলে দিচ্ছে নিকোটিন নামের বিষ। বিষাক্ত সাপ ছোবল মারলে আপনার দেহ-মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি হতো, ক্ষণিকের জন্যে সে অনুভূতি সৃষ্টি করুন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অনুভূতি না এলে সে অনুভূতির অভিনয় করুন। (মনে করুন, মঞ্চে নাটক করছেন। আপনাকে অভিনয় করতে হচ্ছে সাপে আক্রান্ত পথিকের ভূমিকায়। সত্যি সত্যি সাপের ছোবলে আপনার যে মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া হতো, তা-ই করুন।) মনের চোখে আপনার নাক মুখ গলা হৃৎপিণ্ড পাকস্থলীর প্রতিক্রিয়া অবলোকন করুন।

৬. পুনরায় সিগারেটে টান দিন। অবলোকন করুন, আরেকটা গোখরা সাপ ফুসফুসের দিকে যাচ্ছে। পূর্বের প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করুন।

৭. এ পদ্ধতিতে পুরো সিগারেট শেষ করুন। এই পুরো প্রক্রিয়ায় আপনার যে অনুভূতি হলো তা একটি কাগজ বা ডায়েরিতে লিখে রাখুন।

৮. শুধু মনে রাখুন, অন্যের সামনে বা অন্য কোনো কাজ করতে করতে সিগারেট খাবেন না। যখন সিগারেট খেতে ইচ্ছে করবে অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে নিরিবিলি বসে এ প্রক্রিয়ায় সিগারেট খাবেন।

এ প্রক্রিয়া কয়েকদিন অব্যাহত রাখলে অচিরেই দেখবেন, আপনার দেহ-মন নিজ থেকেই সিগারেট প্রত্যাখ্যান করছে। সিগারেটে টান দিতেই কাশি চলে আসছে। বিস্বাদ লাগছে। সিগারেটের ধোঁয়া গন্ধ লাগতে শুরু করেছে। এভাবে খুব সহজেই ধূমপানের বদভ্যাস থেকে আপনি পুরোপুরি মুক্ত হতে পারবেন।

মেডিটেশন ॥ ধূমপান বর্জন

১. নিয়মমাফিক মনের বাড়ির দরবার কক্ষে গিয়ে বসুন।

২. এবার ৩-২-১-০ গণনা করে হিলিং সেন্টারে প্রবেশ করুন। আরাম করে বসুন আপনার হিলিং চেয়ারে।

৩. এবার আপনার ধূমপান-সংক্রান্ত চিত্র পর্যালোচনা করুন। একে একে দেখুন, ধূমপানের ফলে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দিক থেকে আপনি কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। দৈহিক ও মানসিক ক্ষতিপূরণের জন্যে যা করতে হবে, তা নিজেকে বলুন। ধূমপান কীভাবে আপনার হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি করছে, করোনারি ধমনীকে সংকুচিত করে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত করছে তা অবলোকন করুন। ধূমপানের অন্যান্য শারীরিক ক্ষতিগুলোও দেখতে চেষ্টা করুন। পুরো বিষয়টি বার বার ভিজুয়ালাইজ করুন। (ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো মনকে পুরোপুরি বোঝাতে যে ধরনের কল্পনা বা ছবি ব্যবহার করা প্রয়োজন মনে করেন, সেভাবে নিজের ইচ্ছেমতো ছবি বা প্রতীক ব্যবহার করুন।)

তারপর দেখুন, এসব জীবননাশী ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে আপনি ধূমপান ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। ছেড়ে দেয়ার ফলে আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কোনো ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় নি। বরং আপনি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। নিকোটিনের প্রভাব কেটে যাওয়ায় আপনার প্রাণপ্রাচুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে, চেহারায় এসেছে একটা আলাদা ঔজ্জ্বল্য। সিগারেটের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করায় আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। বাস্তবে এ ঘটনা ঘটলে যে আনন্দ-অনুভূতি হতো, সবগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে আপনি তা অনুভব করুন। পূর্ণ আবেগ দিয়ে আপনার ধূমপানমুক্ত সত্তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন।

৪. নিয়মমাফিক হিলিং সেন্টার ও মনের বাড়ি থেকে স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

একনাগাড়ে ৪০ দিন এ অনুশীলন করে যান। এ পর্যন্ত যারাই এটি অনুশীলন করেছেন—দেখা গেছে, ধূমপানের প্রতি তাদের আগ্রহ কয়েকদিনের মধ্যেই কমতে শুরু করেছে।

এ-ছাড়াও ধোঁয়া জাতীয় ড্রাগে কারো আসক্তি থাকলে তারাও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারেন। একই ছবি অবলোকন করুন। আপনার শরীরই একসময় ড্রাগ প্রত্যাখ্যান করবে।

শোকরগোজার হোন ॥ আপনি হবেন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের অধিকারী

শুকরিয়া ॥ সঠিক জীবনদৃষ্টির উৎস	২০৮
সবসময় বলুন, বেশ ভালো আছি	২০৮
যেখানে আছেন সেখান থেকেই শুরু করুন	২০৮
শোকরগোজার হোন ॥ আপনি সুস্থ থাকবেন	২০৯
হাসুন, প্রাণখুলে হাসুন	২০৯
প্রার্থনায় লীন হোন	২১০
আত্মনিমগ্নতায় সৃষ্টি হোক শুকরিয়া ও আনন্দের প্লাবন	২১০
মেডিটেশন ॥ শুকরিয়া	২১১

শোকরগোজার হোন।
আপনাকে কী দেয়া হয়েছে তা নিয়ে ভাবুন।
তাহলেই দেখবেন কী পান নি বা কী নেই তা নিয়ে
দুঃখ করার সময় আপনার থাকবে না।

শোকরগোজার হোন ॥

আপনি হবেন—সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের অধিকারী

ইতোমধ্যেই আমরা বুঝতে পেরেছি, ভুল জীবনাচারের কারণে যেমন হৃদরোগ হতে পারে, তেমনি আপনার অতৃপ্ত অশান্ত মনের প্রভাবও পড়তে পারে হৃদযন্ত্রে। এ রোগের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের মন এবং দৃষ্টিভঙ্গি। আধুনিক ধারার চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের ভাষায় তাই হৃদরোগ একটি সাইকোসোমাটিক ডিজিজ বা মনোদৈহিক রোগ। একটু গভীরে তাকালে আমরা দেখব, মনোদৈহিক রোগব্যাধির আসল বিষফোঁড়াটা লুকিয়ে আছে জীবন সম্পর্কে আমাদের ভুল ও অবিদ্যাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গিতেই।

অধিকাংশ মানুষ আজ ঘুরপাক খাচ্ছে না-শুকরিয়া আর ভুল জীবনাচারের বৃত্তে। ঘুরেফিরে সবখানেই একই হাহাকার—নাই নাই খাই খাই পাই পাই। এত পাই তবুও চাই, আরো চাই। শুধু চাই আর চাই।

এই নিদ্রাহীন চাওয়ার যেন কোনো শেষ নেই। জীবনের প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই আমরা বলতে পারছি না—প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ! তুমি অনেক দিয়েছ। আমি কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ কৃতজ্ঞচিত্ততা বা শুকরিয়ার অভাব ঘটেছে আমাদের জীবনে। আর এই না-শুকরিয়ার কারণ হলো নেতিবাচকতা, ক্রমাগত অন্যের সাথে তুলনা, বস্তুর মাঝে সুখ খুঁজে ফেরা ইত্যাদি। না-শুকরিয়ার পরিণতিতে অশান্তি হতাশা অস্থিরতা ভয় বিষণ্নতা মানুষের জীবনকে নানা দিক থেকে আঁকড়ে ধরে। জীবন একসময় হয়ে ওঠে দুঃসহ, ক্লান্তিকর এবং রোগগ্রস্ত। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পড়ে হৃদযন্ত্রেও।

তাই একটি সুস্থ সুন্দর ও আনন্দময় জীবনের জন্যে দরকার শুকরিয়া ও ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি। শুকরিয়া আমাদের জীবন থেকে নেতিবাচকতার বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করে, চিরতরে দূর করে অশান্তির সমস্ত জঞ্জাল।

শুকরিয়া ॥ সঠিক জীবনদৃষ্টির উৎস

চারপাশে যত সফল মানুষ আমরা দেখি, তাদের সাফল্যের রহস্য খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, তারা শোকরগোজার বা ইতিবাচক জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। কেউ তা অনুসরণ করছেন সচেতনভাবে কিংবা কারো জীবনের সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই এটি। সর্বাবস্থায় শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞচিত্ততার বোধই একটু একটু করে তাদেরকে নিয়ে যায় সাফল্য ও নিরাময়ের পথে।

কারণ একজন শোকরগোজার মানুষের দৃষ্টি সবসময় 'কী আছে', সেদিকে। ফলে তার শক্তি, ক্ষমতা আর উপকরণ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সজাগ ও সচেতন। জীবনের যে-কোনো পর্যায় থেকে তিনি শুরু করতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন কর্মোদ্যমী ও সফল। তার সাফল্যের আনন্দ-অনুরণনই তাকে যাবতীয় কষ্ট দুঃখ বিষণ্নতা ও স্ট্রেস থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সুখী জীবনের পথে তিনি পায়ে পায়ে এগিয়ে যান।

সবসময় বলুন, বেশ ভালো আছি

আপনার জীবনের সব ধরনের প্রাপ্তি ও সাফল্য এবং আপনার যা আছে তার সবকিছুর জন্যেই আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ হোন। ধন্যবাদ জানান স্রষ্টাকে। গভীরভাবে তাকান নিজের দিকে। একটু ভাবলেই আপনি আপনার জীবনে পেয়ে যাবেন এমন অসংখ্য উপলক্ষ, যার জন্যে আপনিও অনুভব করবেন—অন্য অনেকের চেয়ে আপনি অনেক ভালো আছেন।

তাই প্রতিদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই বলুন : 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ/ হরি ওম/ প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ/ থ্যাংকস গড, একটি নতুন দিনের জন্যে।' ভেতর থেকে অনুভব করুন শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞচিত্ততা। কুশল বিনিময়কালে এবং দিনে যখনই সময় পান, বলুন, 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ! বেশ ভালো আছি।' আপনি সত্যিই ভালো থাকবেন।

যেখানে আছেন সেখান থেকেই শুরু করুন

শুকরিয়ার প্রকাশ হলো, যা আছে যতটুকু আছে সেখান থেকেই শুরু করা। পথে নামলে পথই আসলে পথ দেখায়। শোকরগোজার মানুষ যা আছে তা নিয়েই শুরু করে দিতে পারেন, পথে নামতে পারেন, তিনি পথ পেয়েও যান।

তাই নিরাময় বা সাফল্য—যে পথেই এগোতে চান—যা আছে তা নিয়েই নেমে পড়ুন, যেখানে আছেন সেখান থেকেই শুরু করুন। কারণ যে উদ্যোগ নেয়, সচেতন প্রচেষ্টা চালায়, স্রষ্টার রহমত সবসময় তার সাথেই থাকে।

শোকরগোজার হোন ॥ আপনি সুস্থ থাকবেন

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা স্রষ্টার করুণাধারায় সিক্ত। বেঁচে থাকার কত অসংখ্য জীবন-উপকরণ আমরা আপনা-আপনিই পেয়ে যাচ্ছি, উপভোগ করছি। শুধু অক্সিজেনের কথাই যদি ধরি, দিনে কত হাজার বার দম নিচ্ছি, কত লক্ষ-কোটি অক্সিজেন অণু আমাদের বেঁচে থাকায় ভূমিকা রেখে চলেছে। এভাবে যদি হিসাব করি, দিন মাস বছর যুগ মিলিয়ে পুরো জীবন এমনি কতভাবে আমরা প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট! কিন্তু আমরা কজনই-বা এজন্যে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই?

আপনি দম নিতে পারছেন, এখনো বেঁচে আছেন—এটাই তো হওয়া উচিত শুকরিয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। আপনি বেঁচে আছেন মানে হলো, আপনার সামনে রয়েছে এক অপার সম্ভাবনার জগৎ।

আপনি যখন ভেতর থেকে শুকরিয়া জানাতে পারবেন, কৃতজ্ঞচিত্ত হতে পারবেন, তখন আপনার ভেতরের টেনশন অশান্তি অস্থিরতা ভয় দূর হতে শুরু করবে। কমতে থাকবে স্ট্রেস সৃষ্টিকারী ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স। আপনার হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাসুন, প্রাণখুলে হাসুন

প্রতিদিন অন্তত কয়েকবার নির্মল আনন্দে প্রাণখুলে হেসে উঠুন। হাসি দিয়েই পৃথিবীর সব সুখ আর আনন্দের শুরু। হাসি সত্যিই আপনার শুকরিয়ার প্রকাশ ঘটায়। হাসির নিরাময় ক্ষমতা এখন অসংখ্য গবেষণায় বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। দেখা গেছে, সবসময় হাসিখুশি থাকেন যারা—তাদের রক্তে স্ট্রেস হরমোনের পরিমাণ কম থাকে।

লাফ আফটার লাফ : দ্য হিলিং পাওয়ার অব হিউমার বইটির লেখক ডা. রেমন্ড মুদি বলেন, আমার পেশাগত জীবনে এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি, যেখানে রোগীরা হাসি দিয়েই সুস্থতা অর্জন করেছেন। হাসি সত্যিই

ব্যথানাশক এবং দীর্ঘায়ু ত্বরান্বিত করে। এ-ছাড়াও টেনশনের ফলে শরীরের স্নায়ু ও পেশিতে যে সংকোচন সৃষ্টি হয়, প্রাণবন্ত হাসিতে তা দূর হয়।

হাসি আপনাকে স্ট্রেস থেকে মুক্তি দেয়। ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডা. উইলিয়াম ফ্রাই-এর মতে, এক মিনিট প্রাণখোলা হাসি কয়েক মিনিট গভীর শিথিলায়নের মতোই উপকারী। তাই একটি নির্মল আনন্দপূর্ণ হাসি দিয়ে শুরু হোক আপনার দিন।

প্রার্থনায় লীন হোন

আপনি যে ধর্মের অনুসারীই হোন, নিরাময় ও সুস্থতার জন্যে নিয়মিত প্রার্থনা করুন। আপনার কৃতজ্ঞতা আর হৃদয়ের আকুতি জানান স্রষ্টাকে। প্রার্থনা আপনার রোগমুক্তিতে সাহায্য করে। বাড়িয়ে তোলে সুস্বাস্থ্যের সম্ভাবনা।

খোদ পাশ্চাত্যেই একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, প্রার্থনা রোগমুক্তিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। দেখা গেছে, একই ধরনের অসুস্থতায় ভুগছেন—এমন রোগীদের মধ্যে যারা প্রার্থনা করেছেন কিংবা যাদের জন্যে প্রার্থনা করা হয়েছে, তারা তুলনামূলক দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

আমেরিকায় মেডিকেল কলেজগুলোতে হবু ডাক্তারদের পড়ানো হচ্ছে রোগ নিরাময়ে প্রার্থনার গুরুত্ব। শুধু তা-ই নয়, কীভাবে রোগীদের জন্যে প্রার্থনা করতে হবে, সেটিও শেখানো হচ্ছে তাদের। বিষয়টি এখন আমেরিকায় মেডিকেল কারিকুলামের অন্যতম অনুষঙ্গ। আপনিও তাই সুস্থতা ও রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনায় লীন হোন। নবীজী (স) বলেন, 'প্রতিটি রোগেরই নিরাময় রয়েছে। আল্লাহ পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ পাঠান নি, যার নিরাময় তিনি দেন নি।'

আত্মনিমগ্নতায় সৃষ্টি হোক শুকরিয়া ও আনন্দের প্লাবন

দিনের কিছুটা সময় নীরবে কাটান। মেডিটেশন করুন, ধ্যানমগ্ন হোন। ডুব দিন নিজের ভেতর। সুখময় ভাবনার টলটলে স্বচ্ছ জলে ভাসিয়ে দিন নিজেকে। অযাচিত রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ, বিষাদ আপনাকে ছেড়ে যাবে। আপনি ভারমুক্ত হবেন। সুস্থতা ও নিরাময়ের জন্যেই এটি দরকার।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, নিয়মিত মেডিটেশন করেন যারা, তাদের মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স দারুণভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আর মস্তিষ্কের এ অংশটি থেকেই উৎসারিত হয় আমাদের সুখ-আনন্দের মতো ইতিবাচক আবেগগুলো। মেডিটেশনকালে ব্রেন থেকে নিঃসরিত হয় আনন্দবর্ধক সেরোটনিন ও এন্ডোরফিন নামক রাসায়নিক পদার্থ, যা দেহ-মনে চমৎকার সুখানুভূতি সৃষ্টি করে।

নিয়মিত মেডিটেশন আপনার শুকরিয়ার অনুভূতি বাড়িয়ে দেবে। গভীর আত্মনিমগ্নতায় আপনি লাভ করবেন শুকরিয়ার নতুন উপলব্ধি। হয়ে উঠবেন প্রশান্ত পরিতৃপ্ত এক সুখী মানুষ।

মেডিটেশন ॥ শুকরিয়া

১. নিয়মমাফিক মনের বাড়ির দরবার কক্ষে গিয়ে বসুন।

২. আপনি জানেন, শুকরিয়া মনকে প্রশান্ত করে। মুহূর্তে আপনার চিন্তার জগতকে বদলে দেয়। আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন বর্তমান উপকরণ সম্পর্কে। ভাবতে পারেন পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে।

এবার এক এক করে তালিকা করুন—কী কী আছে আপনার? কোন কোন বিষয়ের জন্যে আপনি শোকরগোজার হবেন? আপনি কী কী পারেন? আপনার বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

নিজের দিকে না তাকিয়ে অন্যের দিকে তাকাই আমরা। কিন্তু আপনি জানেন, অন্যের দিকে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই। আপনাকে তাকাতে হবে নিজের দিকে। যত নিজের দিকে তাকাবেন তত বিস্মিত হবেন। তত দেখবেন যাদের সাফল্য আপনাকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে, তাদের প্রাপ্তির পেছনের সকল উপকরণ আপনারও আছে। যা দিয়ে আপনি অনায়াসে শুরু করতে পারেন।

৩. আজ যে আপনি সুস্থ দেহে ঘুম থেকে উঠেছেন সেজন্যে শুকরিয়া আদায় করুন। গতকাল কয়েক লক্ষ মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। আপনি বেঁচে আছেন। কাজ

করার, জীবনকে উপভোগ করার আরো একটি দিন পেয়েছেন। আপনার শোকরগোজার হওয়ার জন্যে এটাই যথেষ্ট।

আপনার ঘরে পরের বেলার খাবার আছে, পরনে কাপড় আছে, রাতে ঘুমাবার একটা জায়গা আছে। আপনার সৌভাগ্যের জন্যে অভিনন্দন। কারণ আপনি পৃথিবীর বহু মানুষের চেয়ে বিত্তবান। আপনি এখনো দম নিতে পারছেন। ভাবুন, হাসপাতালের সেই অসহায় রোগীটির কথা যিনি দমও নিতে পারছেন না, যাকে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে।

দেহের কথাই ভাবুন। দেহে আছে পাঁচ শতাধিক মাংসপেশি, দুই শতাধিক হাড়, ৭০ থেকে ১০০ ট্রিলিয়ন দেহকোষ। প্রতিটি কোষে অক্সিজেন পৌঁছে যাচ্ছে শিরা ও ধমনীর ৬০ হাজার মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন দিয়ে। রয়েছে ফুসফুসের মতো রক্ত শোধনাগার।

আপনার হার্ট কোনোরকম ক্লান্তি ছাড়াই প্রতিদিন প্রায় লক্ষবার স্পন্দনের মাধ্যমে ১৬শ গ্যালনের চেয়েও বেশি রক্ত পাম্প করে দেহকে সচল রাখছে। রয়েছে একজোড়া ছোট চোখ, যা দিয়ে বিশাল পৃথিবীকে দেখছেন আপনি। আপনার মস্তিষ্ক যে-কোনো কম্পিউটারের চেয়েও কমপক্ষে ১০ লক্ষ গুণ শক্তিশালী। কম্পিউটারের দামের অনুপাতে আপনার মস্তিষ্কের মূল্য কমপক্ষে পাঁচ হাজার কোটি টাকা।

৪. বিশ্বের প্রায় সাতশ কোটি মানুষের মধ্যে আপনি অনন্য। আপনার মতো হুবহু কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্রষ্টা আপনার মতো আর কাউকেই সৃষ্টি করেন নি। আপনাকে এমন কিছু মেধা দিয়েছেন, যা আর কাউকে দেন নি। যত নিজের দিকে তাকাবেন তত দেখবেন আপনার সাফল্যের জন্যে যে যে উপকরণ প্রয়োজন, তার সবই আপনার রয়েছে।

এ উপকরণগুলো ব্যবহার করেই আপনি নির্মাণ করতে পারেন আপনার সাফল্যের পৃথিবী। আপনার জীবন শুরু করতে হবে আপনার যা আছে তা নিয়ে। প্রতিটি সফল মানুষ তার যা ছিল, তা নিয়েই জীবন শুরু করেছেন। অতএব আপনিও শুরু করুন যা আছে তা নিয়ে।

৫. এবার অবলোকন করুন, কী আছে আপনার যা দিয়ে আপনি শুরু করবেন? বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যা আছে তার জন্যে। ভাবুন,

শুকরিয়ার প্লাবন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আপনার অতৃপ্তি অস্থিরতা বিরক্তি ক্ষোভ সন্দেহ আশঙ্কা শূন্যতা হাহাকার আর বিষণ্নতাকে। শুকরিয়ার সাগরে আপনার অতৃপ্তি-অস্থিরতাগুলোকে ছোট ছোট দ্বীপ হিসেবে কল্পনা করুন।

অবলোকন করুন, শুকরিয়ার প্লাবন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই দ্বীপগুলোকে। অস্থিরতা অশান্তি আশঙ্কা সন্দেহ ক্ষোভ সব ভেসে যাচ্ছে আপনার থেকে অনেক অনেক দূরে। আপনার মনে সৃষ্টি হয়েছে এক অভূতপূর্ব আনন্দ-অনুরণন। শুকরিয়ার প্লাবনে আপনি অনুভব করছেন কল্যাণশক্তির জাগরণ যা সকল অশান্তিকে প্রশান্তিতে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, রোগকে সুস্থতায় রূপান্তরিত করছে।

৬. জীবনে শুকরিয়ার গুরুত্বকে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন আপনি। শোকরগোজার মনই প্রশান্ত মন। প্রশান্ত মন সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে। সহজেই সংযুক্ত হয়ে যায় শক্তির মূল উৎসের সাথে। শক্তির মূল উৎস থেকেই উৎসারিত হয় সাফল্যের ফল্গুধারা। সেজন্যে পৃথিবীর সকল ধর্মে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

তাই সবসময় বলুন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! ভোরে ঘুম ভাঙতে বলুন, 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ/ হরি ওম/ প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ/ থ্যাংকস গড! বেশ ভালো আছি। প্রতিদিন আমি সবদিক দিয়ে ভালো হচ্ছি, সফল হচ্ছি, সুখী হচ্ছি।' সবসময় শোকরগোজার মানুষদের সংস্পর্শে থাকুন, সৎসঙ্ঘে থাকুন যা আপনাকে সবসময় প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত রাখবে।

৭. এবার ০ থেকে ৭ গণনা করে স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসুন।

কার্যকর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও দীর্ঘজীবনের রহস্য

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাই আমাদের সুস্থ রাখে । ২১৫

দীর্ঘজীবনের রহস্য । ২১৬

সূর্যস্নান ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে । ২২১

নেতিবাচক চিন্তার প্রভাবে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
দুর্বল হয়ে পড়লেই আমরা অসুস্থ হই।
সুস্থতার জন্যে সবসময় প্রয়োজন ইতিবাচক চিন্তা।

কার্যকর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও দীর্ঘজীবনের রহস্য

বিজ্ঞান যখন আজকের মতো ব্যুৎপত্তি লাভ করে নি, অর্থাৎ সেই সুদূর অতীতে কেউ অসুস্থ হলে মনে করা হতো—এটা নিশ্চয়ই তার কোনো অন্যায় বা পাপের ফল অথবা তার গায়ে কোনো মন্দ বাতাস লেগেছে কিংবা হয়তো দেবতার অভিশাপ লেগেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে এখন অনেক দুরারোগ্য রোগের কারণ আমরা জানতে পারছি। কিন্তু এরপরও অনেক রোগ আছে, যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান এখনো দিতে পারে নি। টাইপ-১ ডায়াবেটিসের কারণ কী? কেন এত ক্যান্সার? অ্যাজমা বা মাইগ্রেনের মূল কারণই-বা কী? এভাবে আরো অনেক রোগ আছে, যার কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞান আজও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি।

শুধু কি তা-ই? প্রায় প্রতিমুহূর্তে আমাদের শরীরে কত ধরনের জীবাণু প্রবেশ করছে, কিন্তু তাই বলে কি আমরা প্রতিদিন অসুস্থ হচ্ছি? আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম আমাদেরকে রোগগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করছে। অর্থাৎ আমাদের সুস্থতার মূল শক্তিটি হলো একটি কার্যকর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

তাই শরীরকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখতে ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করা জরুরি। এর জন্যে প্রয়োজন সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবনাচার।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাই আমাদের সুস্থ রাখে

বাইরের ও ভেতরের শত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে। আমাদের দেহ-সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যেও স্রষ্টা তেমনি একটি সুসংহত ও কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর সেটাই হচ্ছে ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেমের মূল উপাদানগুলো হলো থাইমাস, লিম্ফনোড, প্লীহা বা স্প্লীন, অস্থিমজ্জা বা বোন ম্যারো, এন্টিবডি, পরিপাকতন্ত্রের পেয়ার্স প্যাচ এবং শ্বেতকণিকা। শ্বেতকণিকাগুলোই সরাসরি প্রতিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিয়ে বিভিন্ন রোগজীবাণুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করছে। যে-সব শ্বেতকণিকা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অংশ নেয় সেগুলো হলো নিউট্রোফিল, মনোসাইট, ম্যাক্রোফেজ, ন্যাচারাল কিলার সেল, বি-লিম্ফোসাইট ও টি-লিম্ফোসাইট। শরীরে কোনো জীবাণু প্রবেশ করার সাথে সাথে এরা তাকে বিভিন্ন উপায়ে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়।

নিউট্রোফিল

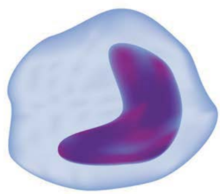
মনোসাইট

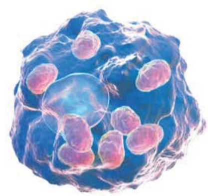
ম্যাক্রোফেজ

ন্যাচারাল কিলার সেল

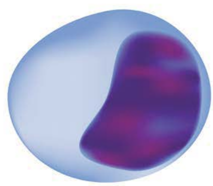
বি-লিম্ফোসাইট

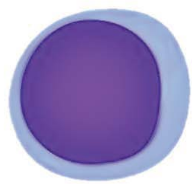
টি-লিম্ফোসাইট

দীর্ঘজীবনের রহস্য

বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচারক ত্রয়োদশ শতকের সুফিসাধক হযরত শাহজালাল (র) বেঁচে ছিলেন ১৫০ বছর। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের হিন্দু ধর্মগুরু বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী ১৬০ বছর বেঁচে ছিলেন। এমনকি চিকিৎসাবিজ্ঞানের অত্যাধুনিক যন্ত্রানুষঙ্গ ও সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই পাকিস্তানের হুনজা উপত্যকা, জাপানের ওকিনাওয়া, ইতালির সার্ডিনিয়া, কোস্টারিকার নিকোয়া পেনিনসুলা বা গ্রিসের ইকারিয়া দ্বীপের মানুষেরা এখনো শত বছরই বাঁচেন। তাদের মধ্যে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার প্রায় অনুপস্থিত।

এই মানুষগুলোর শতবর্ষী হওয়ার নেপথ্য কারণ কী? বিজ্ঞানীরা বলছেন, একজন মানুষ কত বছর বাঁচবে তা নির্ভর করে তার টেলোমেয়ারের দৈর্ঘ্যের ওপর। উল্লেখ্য, ক্রোমোজমের দুই মাথায় অবস্থিত টুপির মতো অংশটির নাম টেলোমেয়ার। আমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত কোষ বিভাজন হচ্ছে। প্রতিবার কোষ বিভাজনের সময় এই টেলোমেয়ারের কিছু অংশ ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে জন্মের সময় প্রতিটি মানুষের টেলোমেয়ারের যে দৈর্ঘ্য থাকে, সময়ের সাথে সাথে তা ছোট হতে থাকে। ছোট হতে হতে টেলোমেয়ার যখন পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে।

জিনবিজ্ঞানীদের মতে, ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি ও ভুল জীবনাচার অর্থাৎ অস্থিরতা, অশান্তি, অতৃপ্তি, ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, স্থূলতা ইত্যাদি টেলোমেয়ারের ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াকে দ্রুততর করে।

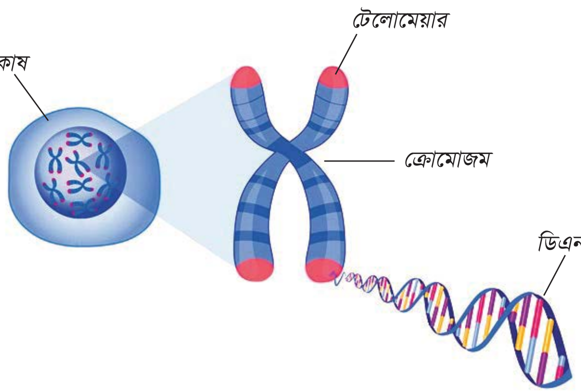

ডা. ডিন অরনিশ এবং নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ড. এলিজাবেথ ব্ল্যাকবার্ন গবেষণায় দেখেন, কেউ যদি একটানা তিন মাস ভেগান ডায়েটে (হোল ফুড, প্ল্যান্ট বেইজড ডায়েট) অভ্যস্ত হন, তবে তার দেহে টেলোমারেজ নামক এনজাইমের পরিমাণ বেড়ে যায়, যা টেলোমেয়ারের ক্ষয় রোধ করে; এমনকি টেলোমেয়ারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়।

ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে রোগমুক্ত দীর্ঘজীবন অর্জনের উপায় নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরেই গবেষণা করে আসছেন। তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে মেডিকেল জার্নাল এবং মূলধারার সাময়িকী ও পত্রিকাতে। ২০১৫ সালে সর্বশেষ গবেষণার আলোকে বিশ্বখ্যাত

টাইম সাময়িকী একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে, যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি ছিল This baby could live to be 142 years old. অর্থাৎ আজ যে শিশুর বয়স দেড়-দুবছর, সে চাইলে বাঁচতে পারে ১৪২ বছর পর্যন্ত!

এ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে এ নিয়ে যত গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, তার সার-সংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হলো—

- ☐ **ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি :** জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচকতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইতিবাচক মানুষই প্রশান্ত মানুষ। শোকরগোজার মানুষ। তিনি জীবনের সবকিছুকেই দেখার চেষ্টা করেন সহজ ও ইতিবাচকভাবে। ক্রমাগত নেতিবাচকতা একজন মানুষের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তোলে। তাই সবসময় শোকরগোজার থাকুন।

- ☐ **মেডিটেশন :** যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস মেডিকেল স্কুলের ইমেরিটাস প্রফেসর ডা. জন কাবাত-জিন এবং ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন-ম্যাডিসনের সাইকোলজি এন্ড সাইকিয়াট্রির প্রফেসর রিচার্ড ডেভিডসন এক গবেষণায় দেখেছেন, যারা মেডিটেশন করেন তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে বেশি। মেডিটেশন করেন না এবং নতুন মেডিটেশন শিখেছেন—এমন দুই শ্রেণির লোকের মধ্যে ফ্লু-র জীবাণু সংক্রমিত করে দেখা গেছে, যারা মেডিটেশন করেছেন

তাদের রক্তে এ সংক্রমণের ৪ সপ্তাহ—এমনকি ৮ সপ্তাহ পরেও এন্টিবডির মাত্রা ছিল তুলনামূলক বেশি। এ-ছাড়াও দেখা গেছে, যারা মেডিটেশন করেন না তারা অসুস্থ হয়ে বছরে যতবার ডাক্তারের কাছে যান, যারা মেডিটেশন করেন তারা যান তার অর্ধেক। তাই প্রতিদিন দুবেলা ৩০ মিনিট করে মেডিটেশন করুন।

- ☐ **ব্যায়াম :** ইমিউন সিস্টেমকে চাঙ্গা রাখার জন্যে প্রতিদিন কমপক্ষে একঘণ্টা ব্যায়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে পাঁচ দিন প্রতিদিন একঘণ্টা ব্যায়াম সুস্থ, নীরোগ ও কর্মময় দীর্ঘজীবনের পূর্বশর্ত। তাই প্রতিদিন ২০-৩০ মিনিট কোয়ান্টাম ইয়োগা করুন এবং কমপক্ষে ৩০ মিনিট ঘণ্টায় ৪ মাইল বেগে হাঁটুন। সম্ভব হলে এর সাথে ১০-১৫ মিনিট জগিং করতে পারেন।
- ☐ **প্রাণায়াম :** কর্মময় প্রাণোচ্ছল দীর্ঘজীবনের জন্যে প্রতিদিন দুধরনের প্রাণায়াম করুন। সহজ উজ্জীবন করুন দিনে পাঁচ দফা (প্রতি দফায় ১৯ বার) এবং নাসায়ন করুন দিনে পাঁচ দফা (প্রতি দফায় ৬-১০ বার)। নিয়মিত প্রাণায়াম আপনার এনার্জি ফিটনেস বাড়াবে। আপনি ক্লান্তিহীন কাজ করতে পারবেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।
- ☐ **কাঙ্ক্ষিত ওজন বজায় রাখুন :** উচ্চতা অনুযায়ী আপনার কাঙ্ক্ষিত ওজন জেনে নিন এবং সেভাবেই ওজন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন।
- ☐ প্রতিদিন ৩-৪ ধরনের মৌসুমি ফল, ৩-৪ ধরনের কাঁচা সালাদ, ৩-৪ ধরনের কাঁচা সবুজ পাতা এবং পর্যাপ্ত শাকসবজি (অর্ধসেদ্ধ) খান। সুস্থ কর্মময় দীর্ঘজীবনের জন্যে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব খাবারে রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন, মিনারেল ও ফাইটোকেমিক্যাল—যা দীর্ঘায়ুর জন্যে অত্যাবশ্যকীয়।
- ☐ **প্রাণিজ আমিষের পরিমাণ সীমিত করুন এবং উদ্ভিজ্জ আমিষের পরিমাণ বাড়ান :**
    - ○ গরু-খাসি-পাঁঠার মাংস বর্জন করুন। সপ্তাহে ২ দিন ছোট মাছ, ২ দিন বড় মাছ (সামুদ্রিক মাছ হলে ভালো) এবং একদিন মাংস খান (মুরগির মাংস)। মাছ-মাংসের পরিমাণ সীমিত রাখুন। ২ দিন শুধুই নিরামিষ খান—মাছ-মাংস নয়। প্রতিদিন একটি ডিম খান।

- ○ উদ্ভিজ্জ আমিষ হিসেবে ডাল মটরশুঁটি শিম বাদাম মাশরুম সয়াদুধ স্পিরুলিনা (সামুদ্রিক শৈবাল), বিভিন্ন প্রকার বীজ (তিসি চিয়া তিল সূর্যমুখী তরমুজ ও মিষ্টিকুমড়া) এবং বিন খান।

- ☐ পূর্ণ শস্যদানা অর্থাৎ লাল চালের ভাত ও লাল আটার রুটি খান।
- ☐ চিনি ও চিনি দিয়ে তৈরি সকল খাবার পরিহার করুন।
- ☐ রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট (সাদা চাল ও সাদা ময়দা) বর্জন করুন।
- ☐ **প্রতিদিন অল্প অল্প করে নিয়মিত খান :**
  - ○ সকালে খালিপেটে এক গ্লাস হালকা গরম পানিতে একটি লেবু
  - ○ এক চা চামচ মধু
  - ○ কালোজিরা (২০-৩০ দানা)
  - ○ এক-দুই কোষ কাঁচা রসুন
  - ○ ভিজানো কাঁচা ছোলা
  - ○ কাঁচা আদা
- ☐ প্রতিদিন পর্যাপ্ত ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ সাইট্রাস ফল খান। ভিটামিন-সি ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে। তাই প্রতিদিন তিন-চার ধরনের সাইট্রাস ফল খান। যেমন : লেবু কমলালেবু জাম্বুরা মাল্টা পেঁপে আনারস লিচু পেয়ারা জাম বরই এবং কাঁচামরিচ ইত্যাদি।
- ☐ প্রতিদিন এক কাপ টক দই খান।
- ☐ প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। (কমপক্ষে দুই লিটার)
- ☐ সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিন।
- ☐ সুযোগ পেলেই মাসে এক/ দুই/ তিন দিন রোজা রাখুন বা উপবাস করুন। এটি শরীরের ভেতরে জমাকৃত টক্সিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্য অটোফেজি প্রক্রিয়ায় দূরীভূত করে। এ-ছাড়া শরীরের বাড়তি চর্বিকে পুড়িয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। এ কারণেই সুস্থ কর্মময় দীর্ঘজীবনের জন্যে মাঝে মাঝে রোজা/ উপবাস/ ফাস্টিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- ☐ রাতে নিরিবিলি অন্ধকার কক্ষে ঘুমান এবং তা হতে হবে কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা। গভীর নিদ্রা শরীরে জমাকৃত টক্সিন দূর করে শরীরকে ঝরঝরে করে তোলে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

সূর্যস্নান ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে

সূর্য নামের জ্বলন্ত গ্রহটি রয়েছে এই জানা গ্যালাক্সির কেন্দ্রে। সূর্যের চারপাশে রয়েছে নানান গ্রহ এবং উপগ্রহ। এর একটি পৃথিবী। এখানেই শুধু রয়েছে প্রাণের অস্তিত্ব। আর এই 'প্রাণ'-এর নেপথ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সূর্য। সূর্যরশ্মির কারণেই উদ্ভিদ বেঁচে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকার ফলফলাদি, শাকসবজি উৎপন্ন হয়। সূর্যরশ্মির প্রভাবেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। সূর্যরশ্মির কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাসযোগ্য হয়েছে, না থাকলে সবকিছু বরফে ঢেকে যেত। এরকম কত কিছুর পেছনে রয়েছে সূর্যের ভূমিকা তার ইয়ত্তা নেই।

আমাদের সুস্থতার ক্ষেত্রেও রয়েছে সূর্যের অবদান। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভিটামিন ডি, যা আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই ভিটামিন ডি তৈরিতে রয়েছে সূর্যরশ্মির সরাসরি ভূমিকা।

ভিটামিন ডি-এর অপর নাম Sunshine Vitamin. সূর্যরশ্মি শরীরে ভিটামিন ডি তৈরির প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে এবং এর ফলে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি তৈরি হয় শরীরে। এই ভিটামিন ডি-র অভাব হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। শরীরজুড়ে বাড়ে প্রদাহের সম্ভাবনা। টাইপ-১ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের মাত্রা বাড়ে। রক্তচাপ বাড়ে। হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে এবং হাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

তাই প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি তৈরির লক্ষ্যে সকালের নরম রোদে ১৫-২০ মিনিট কাটান। এ-ছাড়া প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিন ডি-র জন্যে আপনার খাদ্যতালিকায় পরিমিত পরিমাণে যোগ করুন : ডিম, গরুর কলিজা, কড মাছের তেল, ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার।

এ-ছাড়াও রক্তের ভিটামিন ডি-র মাত্রা পরিমাপ করে প্রয়োজনে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শমতো ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করুন।

উচ্চ রক্তচাপ ॥
ওষুধ ছাড়াই নিরাময়

রক্তচাপ কী? স্বাভাবিক রক্তচাপ । ২২৩
উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ । ২২৪
উচ্চ রক্তচাপের ধরন । ২২৪
প্রাইমারি হাইপারটেনশনের কারণ । ২২৪
উচ্চ রক্তচাপের ক্ষতিকর প্রভাব । ২২৫
প্রাইমারি হাইপারটেনশনের প্রচলিত চিকিৎসা ও সীমাবদ্ধতা । ২২৫
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে প্রচলিত বিশ্বাস । ২২৬
উচ্চ রক্তচাপ নিরাময়ে আধুনিক গবেষণা । ২২৬
উচ্চ রক্তচাপ নিরাময়ে করণীয় । ২২৭

সচেতন সামর্থ্য বা বিশ্বাসের অভাবে মানুষ তার সহজাত
নিরাময় ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়।

উচ্চ রক্তচাপ ॥
ওষুধ ছাড়াই নিরাময়

কয়েক দশক ধরেই বিশ্বজুড়ে অন্যতম ঘাতক ব্যাধি—উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন), যা দীর্ঘমেয়াদে হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনি জটিলতাসহ জীবনঘাতী নানা রোগের সূত্রপাত করে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি তিন জনে একজন উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত। বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এ সংখ্যা প্রতি পাঁচ জনে একজন।

রক্তচাপ : আমাদের দেহে ছড়িয়ে আছে জালিকার মতো অসংখ্য রক্তনালী—শিরা ধমনী মিলিয়ে যার দৈর্ঘ্য ৬০ হাজার মাইল। রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় এই সকল রক্তনালীর গায়ে যে চাপ পড়ে, তা-ই রক্তচাপ। এই চাপ নির্ভর করে হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা এবং রক্তনালীর প্রতিরোধের ওপর।

রক্তচাপ মাপার পূর্বে করণীয় : কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চা-কফি না খাওয়া, ধূমপান না করা, হেঁটে বা দৌড়ে না আসা, মাপার সময় কথা না বলা, ২ মিনিট ব্যবধানে দুই হাতে দুই বার রক্তচাপ মাপা। এ-ছাড়া ভরপেট খাওয়ার পর না মাপা।

রক্তচাপের শ্রেণিবিভাগ	সিস্টোলিক	ডায়াস্টোলিক
আদর্শ	১২০-এর নিচে	৮০-র নিচে
স্বাভাবিক	১৩০-এর নিচে	৮৫-র নিচে
স্বাভাবিক, তবে বেশি	১৩০-১৩৯	৮৫-৮৯
স্টেজ-১ উচ্চ রক্তচাপ	১৪০-১৫৯	৯০-৯৯
স্টেজ-২ উচ্চ রক্তচাপ	১৬০-১৭৯	১০০-১০৯
স্টেজ-৩ উচ্চ রক্তচাপ	১৮০+	১১০+

যদি কখনো কারো প্রথম চেক-আপে রক্তচাপ বেশি পাওয়া যায়, তবে তা আসলেই উচ্চ রক্তচাপ কিনা, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কমপক্ষে বিভিন্ন সময়ে তিন বার (সম্ভব হলে ছয় বার) রক্তচাপ মেপে দেখতে হবে। যদি রক্তচাপ প্রতিবারই বেশি থাকে, তবে তা নিশ্চিতই উচ্চ রক্তচাপ।

উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ রোগী অনুভব করে না। চেক-আপ বা অন্য রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ে। তবে যে-সব উপসর্গ হতে পারে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : মাথাব্যথা, ঘাড়ব্যথা, কাঁধব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, ক্লান্তি বোধ, অবসন্নতা, অতিরিক্ত ঘাম, অনিদ্রা, দমের সমস্যা, চোখ-মুখ অতিরিক্ত জ্বালাপোড়া করা।

উচ্চ রক্তচাপের ধরন

উচ্চ রক্তচাপ মূলত দুই প্রকার :

- *প্রাইমারি হাইপারটেনশন (৯৫%)*
  এটি সরাসরি জীবনাচারের সাথে সম্পর্কযুক্ত
- *সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন (৫%)*
  অন্য কোনো রোগের কারণে এটি হয়ে থাকে

প্রাইমারি হাইপারটেনশনের কারণ

- স্থূলতা
- টাইপ-২ ডায়াবেটিস
- অতিরিক্ত প্রাণিজ আমিষ খাবার গ্রহণ
- তৈলাক্ত-চর্বিযুক্ত ও ভাজাপোড়া খাবার গ্রহণ
- রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ (চিনি, সাদা চাল, সাদা ময়দা)
- রান্নায় অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার এবং লবণযুক্ত অন্যান্য খাবার গ্রহণ
- খাবারে পটাশিয়ামের ঘাটতি
- ভিটামিনের ঘাটতি
- ফাইটোকেমিক্যালের ঘাটতি

- ধূমপান
- অতিরিক্ত মদ্যপান
- ক্রমাগত মানসিক চাপ বা স্ট্রেস
- নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ সেবন

উচ্চ রক্তচাপের ক্ষতিকর প্রভাব

হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা তিন গুণ বেড়ে যায়। হার্ট ফেইলিউরের ঝুঁকি বাড়ে চার গুণ। স্ট্রোকের ঝুঁকি সাত গুণ বেড়ে যায়। আলঝেইমার্স ডিজিজ ও ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ধমনীর ভেতর-দেয়ালকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সেখানে চর্বি জমতে সাহায্য করে (অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস)। উচ্চ রক্তচাপ ক্রনিক কিডনি ডিজিজেরও কারণ।

প্রাইমারি হাইপারটেনশনের প্রচলিত চিকিৎসা এবং সীমাবদ্ধতা

প্রাইমারি হাইপারটেনশন একটি লাইফস্টাইল ডিজিজ হলেও বিশ্বব্যাপী যে চিকিৎসা দেয়া হয় তা মূলত ড্রাগ থেরাপি। প্রতিটি ওষুধের রয়েছে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। কারো ক্ষেত্রে হয় কম, আবার কারো ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত প্রকট। শুধু ওষুধ দিয়ে যারা উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা করান, তাদের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে একটি ওষুধে কাজ হলেও কিছুদিন পর দু-তিনটি ওষুধ নেয়ার পরও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ হতে চায় না।

শুধু ওষুধ সেবন করে যে রোগী উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা করে থাকেন, তিনি তো কোনোদিনই উচ্চ রক্তচাপের হাত থেকে রেহাই পান না, উপরন্তু ধীরে ধীরে একটা সময় তিনি ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদিতে আক্রান্ত হন।

অথচ যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট ন্যাশনাল কমিটি অন দ্য প্রিভেনশন, ডিটেকশন, ইভ্যালুয়েশন এন্ড ট্রিটমেন্ট অব হাই ব্লাড প্রেশার (জেএনসিভিআই)-এর সর্বশেষ পরামর্শ হচ্ছে : স্টেজ-১ এবং স্টেজ-২ উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় ওষুধ শুরু করার আগে কমপক্ষে ৩-৬ মাস ওষুধ না দিয়ে শুধু জীবন-অভ্যাস পরিবর্তন করে চিকিৎসা করা উচিত।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে প্রচলিত বিশ্বাস

চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমরা ধরেই নিয়েছি যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে একপর্যায়ে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়বে। এরপর ডাক্তারের কাছে যাব। ডাক্তার সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওষুধ খেতে দেবেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ওষুধ খাওয়াই হচ্ছে নিয়তি। অথচ এটিই একমাত্র বাস্তবতা নয়।

গবেষকেরা ১৯২০ সালে কেনিয়ার গ্রামের কিছু মানুষের জীবনধারা নিয়ে গবেষণা করলেন। তাদের খাদ্যতালিকায় সোডিয়ামযুক্ত বা লবণাক্ত খাবার খুব কম থাকে। আর থাকে পূর্ণ শস্যদানা, পর্যাপ্ত শাকসবজি, ফল, ডাল-বীজ-বিন এবং খুব অল্প প্রাণিজ আমিষ। দেখা গেছে, ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামীণ কেনিয়ানদের রক্তচাপ থাকে সমবয়সী আমেরিকান ও ইউরোপিয়ানদের মতো ১২০/৮০ মি.মি. মার্কারি।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমেরিকান ও ইউরোপিয়ানদের রক্তচাপ বাড়তে থাকে, ৬০ বছর বয়সে তাদের রক্তচাপ হয় ১৪০/৯০-এর ওপরে। অথচ ৬০ বছর বয়সে কেনিয়ানদের রক্তচাপ বরং আগের থেকে কমে দাঁড়ায় ১১০/৭০-এ। দুবছর ধরে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, এ সময়ে ১৮০০ মানুষ নানা কারণে কেনিয়ার গ্রামের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। এদের মধ্যে একজনও উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিল না। এমনকি তাদের মধ্যে একজনেরও ধমনীতে চর্বি জমা বা হার্ট ব্লকেজের সমস্যা ছিল না।

উচ্চ রক্তচাপ নিরাময়ে আধুনিক গবেষণা

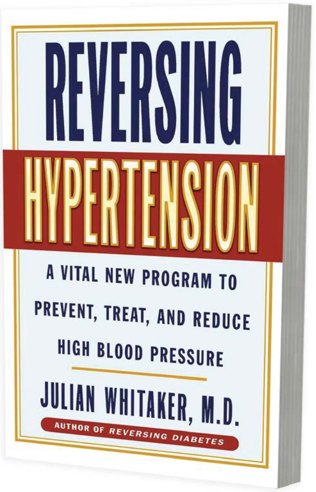

যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসক ডা. জুলিয়ান হুইটেকার ২৫ বছর ধরে উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের নিয়ে কাজ করছেন। জীবনধারা পরিবর্তন করার পর একপর্যায়ে তার রোগীরা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ ছেড়ে দিয়েছেন এবং ওষুধ ছাড়াই সুস্থ জীবনযাপন করছেন। তার এ গবেষণার ফলাফল তিনি তুলে ধরেন

রিভার্সিং হাইপারটেনশন গ্রন্থে। এ-ছাড়াও যারা হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস নিয়ে কাজ করছেন, তারাও জীবনধারা পরিবর্তন করে হৃদরোগ/ ডায়াবেটিসের পাশাপাশি তাদের রোগীদের উচ্চ রক্তচাপও নিরাময় করতে সক্ষম হন।

উচ্চ রক্তচাপ নিরাময়ে করণীয়

- স্থূলতা হ্রাস বা ওজন নিয়ন্ত্রণ
- মাছ মাংস ডিম দুধ বর্জন
- তেল ছাড়া খাবার গ্রহণ
- তেল-চর্বি-কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার বর্জন
- চিনি ও অন্যান্য রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট বর্জন
- খুব কম লবণে রান্নার অভ্যাস করা এবং লবণযুক্ত খাবার বর্জন
- পর্যাপ্ত পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ
- পর্যাপ্ত এন্টি-অক্সিডেন্ট ভিটামিন ও নাইট্রিক অক্সাইড সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ
- ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড ও কো-এনজাইম কিউ$_{১০}$ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ
- পর্যাপ্ত ফাইটোকেমিক্যাল সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ

উল্লিখিত সবকিছু পেতে প্রতিদিন খেতে হবে

- **পূর্ণ শস্যদানা :** লাল চালের ভাত বা লাল আটার রুটি। তবে ভাত বা রুটির পরিমাণ হতে হবে খুবই কম।
- **শাকসবজি সালাদ ও সবুজ পাতা :** হতে হবে পর্যাপ্ত।
- **ডাল মটরশুঁটি বিন বীজ :** পরিমিত ও নিয়মিত।
- **ফল :** টক ও কম মিষ্টি ফল—পরিমিত ও নিয়মিত।

তাই উচ্চ রক্তচাপ নিরাময়ের জন্যে এ বইয়ের ১৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রিভার্সাল ডায়েট অনুসরণ করুন এক থেকে দুই বছর (রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত)। এরপর কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করুন।

রক্তে নাইট্রিক অক্সাইডের সরবরাহ বাড়াতে প্রতিদিন খান

নাইট্রিক অক্সাইড রক্তচাপ স্বাভাবিক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই প্রতিদিন খাওয়ার অভ্যাস করুন—বিটরুট (বিট), সবুজপত্রযুক্ত সবজি : পালং শাক, বাঁধাকপি ও স্পিরুলিনা, সাইট্রাস ফল : কমলালেবু লেবু আঙুর তরমুজ বেদানা রসুন এবং বিভিন্ন ধরনের বীজ ও বাদাম।

এ-ছাড়াও যা করতে হবে

- প্রতিদিন একঘণ্টা ব্যায়াম
- প্রতিদিন দুই বেলা মেডিটেশন
- প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ দফা প্রাণায়াম
- প্রতিদিন কিছু সময় সূর্যস্নান
- সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন রোজা/ উপবাস/ ফাস্টিং

ডায়াবেটিস ॥
ওষুধ ছাড়াই নিরাময়

ডায়াবেটিস কী?	।	২৩০
ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ	।	২৩১
ডায়াবেটিস নির্ণয় করার উপায়	।	২৩১
ডায়াবেটিসের ধরন	।	২৩২
ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিন প্রতিরোধিতা	।	২৩২
টাইপ-২ ডায়াবেটিসের কারণ	।	২৩৩
ডায়াবেটিসের ক্ষতিকর প্রভাব	।	২৩৪
টাইপ-২ ডায়াবেটিসের প্রচলিত চিকিৎসা	।	২৩৪
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি	।	২৩৪
ডায়াবেটিস নিরাময়ে করণীয়	।	২৩৫

সবসময় বিশ্বাস করুন যে, আপনি সুস্থ হবেন।
সুস্থতার ব্যাপারে আশাবাদ নিরাময় প্রক্রিয়াকে বেগবান করে।

ডায়াবেটিস ॥
ওষুধ ছাড়াই নিরাময়

ডায়াবেটিস হচ্ছে বর্তমান সময়ের অন্যতম লাইফস্টাইল ডিজিজ। আমেরিকায় প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রতি ৯ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রতি ৩ জনে একজন প্রি-ডায়াবেটিক। যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে, তবে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানদের প্রতি ৩ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবে।

বাংলাদেশেও এ রোগের প্রকোপ হু হু করে বাড়ছে। এদেশে প্রতি ১০ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সপ্তম প্রধান কারণ ডায়াবেটিস। বিশ্বজুড়েই বিস্তৃত হয়েছে এর করাল থাবা। তাই ডায়াবেটিসকে এখন বলা হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর প্লেগ।

ডায়াবেটিস কী?

প্রতিটি বাহনের জন্যে প্রয়োজন জ্বালানি, যেমন : ডিজেল পেট্রোল অকটেন ইত্যাদি। শরীররূপী আমাদের এই বাহনেরও জ্বালানি প্রয়োজন। শরীরের মূল জ্বালানি হচ্ছে গ্লুকোজ। আমাদের শরীরের যত ধরনের কাজ আছে—নড়াচড়া হাঁটা দৌড়ানো চিন্তা করাসহ সকল ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয় গ্লুকোজ। শর্করা জাতীয় খাবার গ্রহণের পর হজমশেষে গ্লুকোজ ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে রক্তে প্রবেশ করে। ইনসুলিনের সাহায্যে গ্লুকোজ রক্ত থেকে কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বিপাকক্রিয়ায় অংশ নিয়ে শক্তি তৈরি করে।

কোনো কারণে রক্ত থেকে গ্লুকোজ কোষের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারলে রক্তে গ্লুকোজ জমা হতে থাকে। ফলে রক্তের গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যায়। একপর্যায়ে এই বাড়তি গ্লুকোজ কিডনি প্রস্রাবের সাথে বের করে দেয়।

রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ কিন্তু কোষের মধ্যে গ্লুকোজ স্বল্পতা, আর প্রস্রাবে গ্লুকোজের উপস্থিতি—এই অবস্থার নামই ডায়াবেটিস।

ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ

বার বার ক্ষুধা লাগা, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, অবসন্নতা, ওজন কমে যাওয়া, অপুষ্টি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে ঘটনাচক্রে অর্থাৎ অন্য কোনো রোগের চিকিৎসায় পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালে।

ডায়াবেটিস নির্ণয় করার উপায়

রক্তে স্বাভাবিক সুগারের মাত্রা

	সকালে খালি পেটে রক্তের সুগার (FBS)	নাশতার দুই ঘণ্টা পর রক্তের সুগার (PPBS)
নন-ডায়াবেটিক	৪.০-৫.৫ মিলি মোল/ লি.	৭.৮ মিলি মোল/ লি. পর্যন্ত
টাইপ-২ ডায়াবেটিক	৪.০-৭.০ মিলি মোল/ লি.	< ৮.৫ মিলি মোল/ লি.

ডায়াবেটিস নির্ণয় করা হয় যেভাবে

	সকালে খালি পেটে রক্তের সুগার (FBS)	নাশতার দুই ঘণ্টা পর রক্তের সুগার (PPBS)	HbA1c
স্বাভাবিক	< ৫.৬ মিলি মোল/লি.	< ৭.৮ মিলি মোল/লি. পর্যন্ত	
প্রি-ডায়াবেটিক	৫.৬-৬.৯ মিলি মোল/লি.	৭.৮-১১.০ মিলি মোল/লি.	৫.৭%-৬.৪%
ডায়াবেটিক	≥ ৭.০ মিলি মোল/লি.	≥ ১১.১ মিলি মোল/লি.	≥ ৬.৫%

জেনে অবাক হবেন, আমাদের রক্তে যে পরিমাণ সুগার বা চিনি থাকে তার পরিমাণ মাত্র এক চা চামচ। আমরা যদি প্রতিদিন চা/ কফি/ কোমল পানীয়/ মিষ্টান্ন/ অন্য কোনো খাবারের সাথে ২/ ৩/ ৪/ ৫ চা চামচ চিনি খাই, তখন রক্তের সুগার বেড়ে দাঁড়ায় কয়েকগুণ—যা স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের কারণ।

ডায়াবেটিসের ধরন

১. টাইপ-১ ডায়াবেটিস (১০%)

- এ-ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয় থেকে কোনো ইনসুলিন তৈরি হয় না।
- একমাত্র চিকিৎসা ইনসুলিন।
- এটি জীবনাচারের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

২. টাইপ-২ ডায়াবেটিস (৯০%)

- এ-ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন তৈরি হলেও শরীরে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিন প্রতিরোধিতা সৃষ্টির ফলে শরীর যথাযথভাবে ইনসুলিন ব্যবহার করতে পারে না।
- ভুল জীবনাচারের কারণে এটি হয়ে থাকে।

ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিন প্রতিরোধিতা

টাইপ-২ ডায়াবেটিস কীভাবে হয় তা বুঝতে হলে প্রথমেই জানতে হবে কীভাবে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়। এ ব্যাপারে দুটি তত্ত্ব আছে :

তত্ত্ব-১

আমরা যখন প্রাণিজ আমিষ এবং তৈলাক্ত-চর্বিযুক্ত খাবার খাই, তখন এই চর্বি শরীরে গিয়ে কোষে প্রবেশ করে। কোষের মাইটোকন্ড্রিয়া তখন এই চর্বিকে পুড়িয়ে শক্তি তৈরি করে। কিন্তু অতিরিক্ত তৈলাক্ত চর্বিযুক্ত খাবার, অতিরিক্ত প্রাণিজ আমিষ খাওয়া এবং শারীরিক পরিশ্রম না করার ফলে কোষের ভেতর অধিক পরিমাণে এই চর্বি প্রবেশ করে, যা মাইটোকন্ড্রিয়া পুরোপুরি বার্ন-আউট করতে পারে না। ফলে তা কোষের মধ্যে জমতে থাকে। একপর্যায়ে এই সঞ্চিত চর্বি কোষের স্বাভাবিক কাজে বাধার সৃষ্টি করে।

যদি কেউ আপনার দরজার লক-এ চুইংগাম ঢুকিয়ে দেয়, তখন আপনি যেমন দরজার লক খুলতে পারবেন না তেমনি কোষের ভেতর অতিরিক্ত চর্বি জমার ফলে ইনসুলিন তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। কেননা ইনসুলিন রিসেপ্টরের গায়ে চর্বির প্রলেপ জমে গেছে। অর্থাৎ ইনসুলিন কোষের ভেতরে গ্লুকোজ প্রবেশে সাহায্য করতে পারে না, যা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিন প্রতিরোধিতা নামে পরিচিত।

তত্ত্ব-২

রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট (চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দা) এবং চিনিসমৃদ্ধ খাবার (চা কফি জুস পিঠা পায়েস মিষ্টান্ন ও কোমল পানীয় ইত্যাদি) খেলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করে। লিভার এই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে লিভারেই জমা করে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে।

আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমাইনো এসিড (আমিষের ক্ষুদ্রতম অংশ) রক্তে প্রবেশ করলে তা লিভার কর্তৃক প্রথমে গ্লুকোজ এবং পরে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়ে লিভারেই জমা হয়। যখন লিভারে আর গ্লাইকোজেন জমা হওয়ার জায়গা থাকে না, তখন লিভার অতিরিক্ত গ্লুকোজকে চর্বি বা ফ্যাটে (ট্রাইগ্লিসারাইড) রূপান্তরিত করে।

এই রূপান্তরিত ফ্যাট লিভার থেকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে জমা হতে থাকে, বিশেষ করে মাংসপেশিতে এবং পেটের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন অঙ্গে ও এর চারপাশে। একটা পর্যায়ে এই অতিরিক্ত চর্বি লিভারেও জমা হতে থাকে। ফলাফল ফ্যাটি লিভার, যা প্রকারান্তরে তৈরি করে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হওয়ার পেছনে তত্ত্ব-১ এবং তত্ত্ব-২—এ দুটোর ভূমিকাই থাকে।

টাইপ-২ ডায়াবেটিসের কারণ

- স্থূলতা
- ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স
- অতিরিক্ত তৈলাক্ত-চর্বিযুক্ত-কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার
- রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট (চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দা)
- চিনিসমৃদ্ধ খাবার (চা কফি জুস পিঠা পায়েস মিষ্টান্ন ও কোমল পানীয়)
- প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ
- শরীরে নাইট্রিক অক্সাইডের উৎপাদন কমে যাওয়া
- শারীরিক পরিশ্রমের অভাব
- ক্রমাগত মানসিক চাপ বা স্ট্রেস

ডায়াবেটিসের ক্ষতিকর প্রভাব

দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভুগলে যে-সব রোগ হতে পারে তার মধ্যে করোনারি হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ (৭৫% ডায়াবেটিসের রোগী উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত), স্ট্রোক, অন্ধত্ব, কিডনি রোগ, গ্যাংগ্রিন, ক্যান্সার অন্যতম।

টাইপ-২ ডায়াবেটিসের প্রচলিত চিকিৎসা

বিশ্বব্যাপী যত ডায়াবেটিস রোগী আছে তার ৯০ শতাংশই আক্রান্ত টাইপ-২ ডায়াবেটিসে। প্রচলিত চিকিৎসায় বলা হয়, এ রোগ ভালো হয় না। যেহেতু ডায়াবেটিস রোগে রক্তের সুগার লেভেল সহজেই বেড়ে যায়, তাই এর চিকিৎসায় চিনি ও শর্করা জাতীয় খাবার, মিষ্টি ফল ইত্যাদি কম/ পরিমিত খেতে বলা হয় যেন রক্তের সুগার লেভেল বেড়ে যেতে না পারে। অথচ বাস্তবে দেখা গেছে, মিষ্টি জাতীয় খাবার নিয়ন্ত্রণ করার পরও ডায়াবেটিস উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। রক্তের এই বাড়তি সুগার কমানোর জন্যে তখন ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়।

এত কিছুর পরও সুগার নিয়ন্ত্রণ না হলে একপর্যায়ে ইনসুলিন দেয়া হয়। কিন্তু দেখা যায়, প্রচলিত নিয়ম মানার পরও রক্তের সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণ হয় না। ফলে ইনসুলিনের ডোজ বাড়তে থাকে। আবার ইনসুলিন নেয়ার পর শর্করা জাতীয় খাদ্যের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। কেননা একটু এদিক-ওদিক হলে রক্তের সুগার লেভেল অতিরিক্ত কমে গিয়ে বিপজ্জনক অবস্থা (হাইপোগ্লাইসেমিয়া) সৃষ্টি হতে পারে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

জীবনদৃষ্টি ও জীবনাচার পরিবর্তন করে যে ডায়াবেটিস নিরাময় করা যায়—এই বিষয়ে প্রথম গবেষণা করেন আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মেডিসিন বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ডা. নিল বার্নার্ড। এ গবেষণায় আরো এগিয়ে আসেন ডা. জোয়েল ফুরম্যানসহ অন্যান্য গবেষকরা। খাদ্যাভ্যাস ও জীবনাচারে আমূল পরিবর্তন এনে তারা ডায়াবেটিস নিরাময় করতে সক্ষম হন।

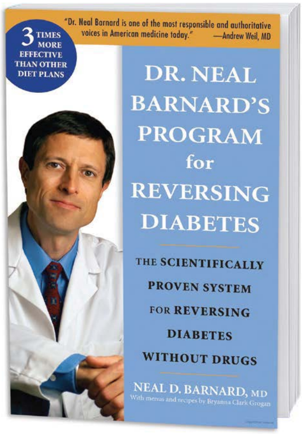

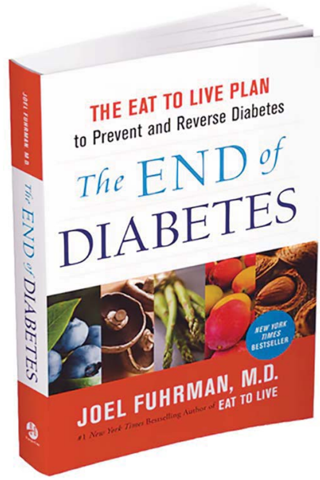

ডা. নিল বার্নার্ড এবং ডা. জোয়েল ফুরম্যান-এর প্রোগ্রাম অনুসারে ডায়াবেটিস নিরাময়ে করণীয়

বর্জন করুন (কমপক্ষে একবছর)

- মাছ মাংস ডিম দুধ
- তেল ঘি মাখন ডালডা মার্জারিন
- তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত ভাজাপোড়া খাবার
- চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দা
- প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার

প্রতিদিন খান

- পূর্ণ শস্যদানা (হোল গ্রেইন) : লাল চালের ভাত বা লাল আটার রুটি এবং এর পরিমাণ হবে খুবই কম। চাইলে ভাত বা রুটির পরিবর্তে খুব অল্প পরিমাণে লাল ওটস খেতে পারেন।
- শাকসবজি, সালাদ ও সবুজ পাতা : হতে হবে পর্যাপ্ত।
- ডাল মটরশুঁটি বিন বীজ : পরিমিত ও নিয়মিত।
- ফল : প্রতিদিন কমপক্ষে ৪ ধরনের টক ও কম মিষ্টি ফল খান এবং ওষুধ

বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বেশি মিষ্টি ফল, যেমন : খেজুর আম কাঁঠাল তরমুজ লাল আপেল ইত্যাদি বন্ধ রাখুন।

তাই ডায়াবেটিস নিরাময়ের জন্যে এ বইয়ের ১৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রিভার্সাল ডায়েট অনুসরণ করুন এক থেকে দুই বছর (ওষুধ ছাড়াই রক্তের সুগার স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত)।

এ-ছাড়াও ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে পারেন

- খুব অল্প পরিমাণ আখরোট কাঠবাদাম এবং তিসি চিয়া তিল সূর্যমুখী ও মিষ্টিকুমড়ার বীজ, সয়াদুধ।
- প্রতিদিন সকালে ১ গ্লাস করে কাঁচা করলার জুস, মেথি ভিজানো পানি ও ঢেঁড়স ভিজানো পানি এবং রাতে ৩ চা চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনেগার।
- প্রতিদিন কিছু দারুচিনি, ১ কাপ হার্বাল চা (পৃ. ৩০০) ও ৩-৪ কাপ গ্রিন টি।

এ-ছাড়াও ডায়াবেটিসের রোগীরা যা যা করবেন

- প্রতিদিন একঘণ্টা ব্যায়াম। ব্যায়াম ইনসুলিনের প্রতি শরীরের কোষগুলোর সংবেদনশীলতা বাড়ায়, ফলে ইনসুলিন রক্তের গ্লুকোজকে কোষের ভেতরে প্রবেশ করাতে সমর্থ হয়। এ-ছাড়াও ব্যায়ামের ফলে সৃষ্ট পেশিসংকোচন গ্লুকোজ পরিবহন বাড়ায়, যা ইনসুলিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। অর্থাৎ ইনসুলিনের সহযোগিতা ছাড়াই গ্লুকোজ কোষে প্রবেশ করে। তাই ব্যায়াম করলে ব্লাড সুগার লেভেল বেশ কিছুটা কমে। ফলে ডায়াবেটিস দ্রুত নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।
- প্রতিদিন দুই বেলা মেডিটেশন
- প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ দফা প্রাণায়াম
- প্রতিদিন কিছু সময় সূর্যস্নান
- সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন রোজা/ উপবাস/ ফাস্টিং

স্থূলতা ও ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ॥
কারণ, প্রতিরোধ ও নিরাময়

বিএমআই স্ট্যান্ডার্ড চার্ট । ২৩৮
উচ্চতা অনুসারে দেহের ওজন সারণি । ২৩৯
অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতার কারণ । ২৪০
অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতার নেপথ্যে
চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দার ভূমিকা । ২৪১
ফ্যাটি লিভার ডিজিজ । ২৪১
অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতা কমানোর ফলপ্রসূ উপায় । ২৪২
গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI) । ২৪৩
অটোফেজি ও ফাস্টিং । ২৪৪
রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে ফাস্টিংয়ের গুরুত্ব । ২৪৫

আগামীকাল আপনার দেহ কেমন হবে তা দেখতে চাইলে
আপনার আজকের চিন্তার প্রতি মনোযোগ দিন।

স্থূলতা ও ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ॥

কারণ, প্রতিরোধ ও নিরাময়

প্রতিটি মানুষের উচ্চতা অনুযায়ী একটি আদর্শ (কাঙ্ক্ষিত) ওজন থাকে। তার তুলনায় দেহের ওজন যখন বেশি থাকে, তখন বলা হয় অতিরিক্ত ওজন (over weight)। আর যখন আদর্শ ওজন থেকে ২০% বা তার বেশি বেড়ে যায় অথবা BMI (Body Mass Index) ৩০ কিংবা এর বেশি হয়, তখন বলা হয় স্থূল (obese)।

এ-ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক চার্ট দেখে আদর্শ ওজন বের করা যেতে পারে। (পরের পৃষ্ঠায় উচ্চতা অনুসারে পুরুষ ও মহিলাদের ওজনের সারণি দেয়া হলো)

আবার BMI (Body Mass Index) নির্ণয় করে BMI Standard Chart ব্যবহার করে ওজন ঠিক আছে কিনা দেখে নেয়া যেতে পারে।

BMI Standard Chart

BMI	Classification
< 18.5	Under weight
18.5 - 24.9	Normal weight
25.0 - 29.9	Over weight
30.0 - 34.9	Obese
35.0 - 39.9	Severe Obesity
> 40.0	Morbid Obesity

পুরুষদের জন্যে

উচ্চতা		হালকা	মাঝারি	চওড়া
ফুট	মিটার		কেজি	
৫'-১"	১.৫৬	৫১.৮	৫৫.০	৫৯.১
৫'-২"	১.৫৮	৫৩.৬	৫৬.৮	৬০.৯
৫'-৩"	১.৬১	৫৫.০	৫৭.৭	৬২.৩
৫'-৪"	১.৬৩	৫৫.৯	৫৯.৫	৬৩.৬
৫'-৫"	১.৬৬	৫৭.৩	৬০.৯	৬৭.৭
৫'-৬"	১.৬৮	৫৯.১	৬২.৩	৬৯.৫
৫'-৭"	১.৭১	৬০.৯	৬৫.০	৭১.৮
৫'-৮"	১.৭৩	৬২.৭	৬৬.৮	৭৩.২
৫'-৯"	১.৭৬	৬৪.৮	৬৮.৬	৭৫.৯
৫'-১০"	১.৭৮	৬৬.৮	৭০	৭৬.৯
৫'-১১"	১.৮১	৬৭.৮	৭২	৭৭.৯
৬'-০"	১.৮৪	–	৭৩	৭৮.৭
৬'-১"	১.৮৬	–	৭৪.৫	৮০.৪
৬'-২"	১.৮৯	–	৭৬.৬	৮২.৩
৬'-৩"	১.৯১	–	৮০.৯	৮৬.৪

মহিলাদের জন্যে

উচ্চতা		হালকা	মাঝারি	চওড়া
ফুট	মিটার		কেজি	
৪'-৮"	১.৪২	৪২.৩	৪৫	৪৯.৫
৪'-৯"	১.৪৪	৪৩.৩	৪৫.৯	৫০.৯
৪'-১০"	১.৪৭	৪৪.৫	৪৭.৭	৫২.২
৪'-১১"	১.৫০	৪৫.৯	৪৮.৬	৫৩.৬
৫'-০"	১.৫২	৪৬.৮	৪৯.৫	৫৫.০
৫'-১"	১.৫৬	৪৮.৬	৫০.৯	৫৬.৪
৫'-২"	১.৫৮	৫০.০	৫২.৭	৫৭.৭
৫'-৩"	১.৬১	৫০.৯	৫৫.০	৫৯.৫
৫'-৪"	১.৬৩	৫২.৭	৫৬.৮	৬১.৩
৫'-৫"	১.৬৬	৫৪.৬	৫৮.৬	৬৫.০
৫'-৬"	১.৬৮	৫৬.৪	৬০.৫	৬৬.৩
৫'-৭"	১.৭১	৫৮.৬	৬২.৩	৬৮.৫
৫'-৮"	১.৭৩	৬০.৫	৬৪.১	৭০.৮
৫'-৯"	১.৭৬	৬১.৭	৬৫.৯	৭২.৬
৫'-১০"	১.৭৮	৬৩.১	৬৭.৭	৭৩.৬
৫'-১১"	১.৮১	৬৪.১	৬৮.৭	৭৪.৬

Body Mass Index (BMI) = Weight (kg)/ Height^2 (m^2)

উদাহরণ : কারো উচ্চতা যদি ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি (১.৭২ মিটার) হয় এবং ওজন যদি ৭৫ কেজি হয় তবে, তার BMI হবে :

BMI = Weight (kg)/ Height^2 (m^2)

= 75/(1.72 x 1.72) = 75/(2.95) = 25.42

BMI Standard Chart অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি Over weight অর্থাৎ তার ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৩ জনে ২ জন (৬৫%) অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতার শিকার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ৪০% স্থূল। বাংলাদেশে ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৭% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ স্থূল এবং ১৪% শিশু অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতার শিকার।

অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতার কারণ

- **অতিরিক্ত প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণ :** গরু খাসি ভেড়া ও পাঁঠার মাংস। অতিরিক্ত মুরগির মাংস রোস্ট কাবাবও ওজন বৃদ্ধির কারণ।
- **তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ :** পোলাও রোস্ট বিরিয়ানি কাচ্চি তেহারি লুচি পুরি সিঙ্গাড়া পেঁয়াজু সমুচা বেগুনি পরোটা চপ কাবাব কাটলেট ও চিকেন ফ্রাই, ফাস্ট ফুড ইত্যাদি।
- **চিনি ও চিনির তৈরি সকল খাবার গ্রহণ :** কোমল পানীয়, চিনিযুক্ত চা/ কফি ও জুস কেক পুডিং পেস্ট্রি পায়েস পিঠা মিষ্টান্ন ইত্যাদি।
- **সাদা চাল ও সাদা ময়দার তৈরি খাবার গ্রহণ :** ভাত রুটি পাউরুটি নুডল্‌স পাস্তা বার্গার পেটিস স্যান্ডউইচ ইত্যাদি।
- **পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব**

অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতার নেপথ্যে চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দার ভূমিকা

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার খাওয়ার পর হজম শেষে গ্লুকোজ ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে রক্তে প্রবেশ করে। রক্ত থেকে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ ইনসুলিনের সাহায্যে প্রবেশ করে বিভিন্ন দেহকোষে। এরপর গ্লুকোজ থেকে শক্তি তৈরি হয় এবং শরীর এই শক্তি ব্যবহার করে।

যদি কেউ অতিরিক্ত পরিমাণ শর্করা জাতীয় খাবার খায়, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ রক্তে প্রবেশ করে। এই অতিরিক্ত গ্লুকোজ লিভার কর্তৃক গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়ে গ্লাইকোজেন স্টোরেজে (লিভার ও পেশি) জমা হতে থাকে। প্রয়োজনের সময় গ্লাইকোজেন দ্রুত গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গ্লাইকোজেনের পরিমাণ যখন এতটাই বেড়ে যায় যে, গ্লাইকোজেন স্টোরেজে আর কোনো ফাঁকা জায়গা থাকে না, তখন লিভার এই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনের পরিবর্তে ট্রাইগ্লিসারাইড নামক চর্বিতে রূপান্তরিত করে।

অতিরিক্ত গ্লুকোজ থেকে রূপান্তরিত এই নতুন চর্বি ট্রাইগ্লিসারাইড হচ্ছে স্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা বডি ফ্যাট নামেও পরিচিত। এই ট্রাইগ্লিসারাইড বা বডি ফ্যাট লিভার থেকে তৈরি হয়ে জমা হতে থাকে শরীরের নানা অংশে, বিশেষ করে পেটের মধ্যকার নানা অঙ্গে এবং এর চারপাশে। প্রয়োজনের সময় এই ট্রাইগ্লিসারাইড ভেঙে ফ্যাটি এসিডে রূপান্তরিত হয়ে শক্তির জোগান দেয়। এ-ছাড়া অতিরিক্ত প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাবার খেলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিডও (আমিষের ক্ষুদ্রতম অংশ) লিভার কর্তৃক ট্রাইগ্লিসারাইডে (স্যাচুরেটেড ফ্যাট বা বডি ফ্যাট) রূপান্তরিত হয়ে জমা হতে থাকে, যা স্থূলতা, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

ফ্যাটি লিভার ডিজিজ

একপর্যায়ে এসে এই রূপান্তরিত চর্বি বা ট্রাইগ্লিসারাইড জমা হতে শুরু করে লিভার বা যকৃতে। লিভারের পাঁচ শতাংশ এই চর্বিতে পূর্ণ হয়ে গেলে সূচনা হয় ফ্যাটি লিভার ডিজিজের। লিভারে চর্বির পরিমাণ বাড়তে থাকলে ফ্যাটি লিভার ডিজিজের মাত্রাও (গ্রেড) বাড়তে থাকে।

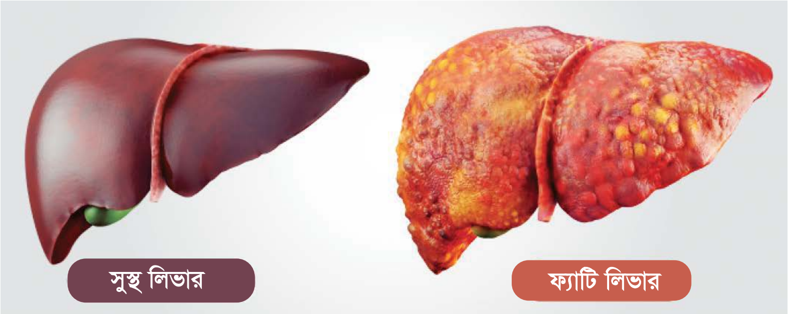

আর এ সকল ঘটনার নেপথ্য নায়ক বা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে ইনসুলিন। একপর্যায়ে শরীরে দেখা দেয় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিন প্রতিরোধিতা, যার পরিণতি টাইপ-২ ডায়াবেটিস। আর এজন্যেই টাইপ-২ ডায়াবেটিসের অন্যতম প্রধান কারণ অতিরিক্ত চিনি, সাদা চাল ও সাদা ময়দা এবং এই সকল রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট দিয়ে তৈরি খাবার।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ৩৩% মানুষ অর্থাৎ প্রতি তিন জনে একজন ফ্যাটি লিভার ডিজিজে আক্রান্ত। আর প্রতি ১০ জনে ১ জন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত।

স্থূলতা ও অতিরিক্ত ওজন কমানোর ফলপ্রসূ উপায়

- ☐ আপনার উচ্চতা অনুযায়ী আদর্শ/ কাঙ্ক্ষিত ওজন জেনে নিন। এ-ক্ষেত্রে ওজন সারণি বা BMI Standard Chart-এর সাহায্য নিতে পারেন।
- ☐ খাবার গ্রহণে সংযত হোন। তৈলাক্ত চর্বিযুক্ত ভাজাপোড়া খাবার বর্জন করুন। বিরিয়ানি-তেহারি-কাচ্চি-মোগলাই খাবার এবং ফাস্ট ফুড পরিহার করুন। সপ্তাহে অন্তত দুদিন নিরামিষ খান। পর্যাপ্ত শাকসবজি, সালাদ, সবুজ পাতা, ফল ও বাদাম, বীজ, বিন খাওয়া শুরু করুন।
- ☐ চিনি ও চিনিযুক্ত খাবার পুরোপুরি বর্জন করুন। সাদা চাল ও সাদা ময়দার পরিবর্তে লাল চাল, লাল আটা ব্যবহার করুন। সকালে ১-২টি লাল আটার রুটি খান—সাথে সবজি ডাল সালাদ ডিম। দুপুরে এক কাপ লাল চালের ভাত—সাথে সবজি ডাল শাক সালাদ মাছ/ মাংস।
- ☐ হাই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ফুড (High GI Food) এর পরিবর্তে লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ফুড (Low GI Food) খাওয়ার অভ্যাস করুন।

- ☐ সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিন। রাতে ভাত/ রুটির পরিমাণ খুব কম রাখুন অথবা বন্ধ রাখুন ওজন না কমা পর্যন্ত। শুধু কিছু সবজি ও সালাদ খান। অল্প পরিমাণে মটরশুঁটি খেতে পারেন। এতে পেট ভরে যাওয়ার অনুভূতি হয় যা ওজন কমাতে সাহায্য করবে।
- ☐ মিষ্টি ফল আপাতত পরিহার করুন। কম মিষ্টি ও টক জাতীয় ফল যেমন : কমলা মাল্টা জাম্বুরা জাম আমড়া আনারস লেবু স্ট্রবেরি পেয়ারা ও সবুজ আপেল খেতে পারেন।
- ☐ প্রতিদিন সকালে ও রাতে ৩ চা চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনেগার এক গ্লাস পানিতে মিশিয়ে খান। এ ভিনেগার পেট ভরে যাওয়ার অনুভূতি দেয়; ফলে খাবারের চাহিদা কমে। এ-ছাড়াও এটি রক্তের সুগার লেভেল কমিয়ে ওজন কমাতে সাহায্য করে।
- ☐ প্রতিদিন ঘণ্টায় ৪ মাইল বেগে একঘণ্টা হাঁটুন। প্রয়োজনে কিছু সময় জগিং করুন।
- ☐ সপ্তাহে এক/ দুই/ তিন দিন রোজা রাখুন/ উপবাস করুন/ ফাস্টিং-এ থাকুন। রোজা বা উপবাস ওজন কমাতে সাহায্য করে।
- ☐ ওজন কমাতে তাড়াহুড়ো করবেন না। রাতারাতি ওজন কমাতে গিয়ে শরীরের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি করবেন না। ওজন কমানোর পুরো প্রক্রিয়াটি উপভোগ করুন। আর তাই প্রয়োজনে ওজন কমানোর বিশেষ মেডিটেশন ডাউনলোড করে নিন কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট quantummethod.org.bd থেকে। এ মেডিটেশন সকালে ও রাতে প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে চর্চা করুন।

গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI)

হাই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ফুড দ্রুত রক্তের গ্লুকোজ লেভেল বাড়ায় যা অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ও ডায়াবেটিস হওয়া ত্বরান্বিত করে। অন্যদিকে লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ফুড ধীরে ধীরে রক্তের গ্লুকোজ লেভেল বাড়ায়। ফলে ওজন বৃদ্ধি পায় না এবং ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের সম্ভাবনাও কমে যায়।

- **লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ফুড (GI ৫৫ বা তার কম) :** অধিকাংশ ফল, সব ধরনের শাক, সবজি ও সালাদ, সব ধরনের বাদাম, বীজ ও বিন, লাল ওটস, সয়াদুধ, ফ্রুকটোজ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার।
- **মিডিয়াম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ফুড (GI ৫৬ - ৬৯) :** মিষ্টি আলু, লাল চাল, লাল আটা, মধু, আঙুর, আনারস, চেরি ফল।
- **হাই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ফুড (GI ৭০ বা তার বেশি) :** গ্লুকোজ, চিনি, সফট ড্রিংকস, চিনিযুক্ত জুস, সাদা চাল, সাদা ময়দা, ইন্সট্যান্ট নুডল্‌স ও সাদা পাস্তা, গোল আলু, তরমুজ।

অটোফেজি ও ফাস্টিং

আমাদের দেহে আছে ৭০-১০০ ট্রিলিয়ন কোষ এবং প্রতিটি কোষে প্রতিনিয়ত ঘটছে লক্ষাধিক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া-বিক্রিয়া। তৈরি হচ্ছে হরমোন, এনজাইমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পদার্থ। পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে বর্জ্য পদার্থ ও টক্সিন। এই ক্ষতিকর টক্সিন বের করার জন্যে রয়েছে দেহের Automatic Cleaning System বা Autophagy (অটোফেজি)। Auto মানে নিজ এবং Phagy মানে খাওয়া। Autophagy মানে হচ্ছে নিজেকেই খাওয়া।

অটোফেজির ধারণা প্রথম উপস্থাপন করেন বেলজিয়ামের বায়োকেমিস্ট ক্রিশ্চিয়ান ডি দ্যুভ। তিনি লাইসোজোম নামক কোষের Recycling compartment আবিষ্কার করতে সক্ষম হন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্যে ১৯৭৪ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

পরবর্তীকালে জাপানি সেল বায়োলজিস্ট ড. ইউশিনোরি ওসুমি অটোফেজির পূর্ণাঙ্গ ধারণা উপস্থাপন করেন এবং ২০১৬ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন এই কালজয়ী আবিষ্কারের জন্যে।

অটোফেজি দেহকোষের একটি নিয়মিত ও স্বাভাবিক স্বয়ংচালিত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোষ তার মধ্যে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ, টক্সিন, কোষের মৃত অংশ ইত্যাদি দূর করে। এ প্রক্রিয়া যত সুন্দরভাবে কাজ করবে, দেহকোষ তত সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকবে। সে ব্যক্তি তত সুস্থ থাকবেন প্রাণবন্ত থাকবেন।

ড. ওসুমি প্রমাণ করেন, নির্দিষ্ট সময় না খেয়ে থাকলে এই অটোফেজি সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে। এ-ছাড়াও ফাস্টিং শুধু বর্জ্য পদার্থ বা টক্সিনকেই দূর করে না, বাড়তি চর্বিকেও পোড়াতে সাহায্য করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ফাস্টিং ১২ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় হলে অটোফেজি প্রক্রিয়া খুবই কার্যকর হয়। ফাস্টিং প্রক্রিয়ায় যে শব্দটি এখন খুবই পরিচিত তা হলো ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং। নানা ধরনের ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং এখন প্রচলিত। মাঝেমধ্যে একবেলা না খাওয়া, ১৬ ঘণ্টা/ ২০ ঘণ্টা/ ২৪ ঘণ্টা/ ৩৬ ঘণ্টা না খেয়ে থাকা, একদিন পর পর না খেয়ে থাকা ইত্যাদি।

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং শব্দটি নতুন হলেও প্রক্রিয়াটি হাজার বছরের পুরনো। বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মগুলোতেও (ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম) রোজা/ উপবাস/ ফাস্টিং-এর কথা বলা হয়েছে।

ইসলাম ধর্মে রোজার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, *‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বসূরিদের ওপর। যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন থাকতে পারো। ... রোজা রাখা তোমাদের জন্যে সবচেয়ে বেশি কল্যাণের, যদি তোমরা জানতে!’*

(সূরা বাকারা : ১৮৩-১৮৪)

নবীজী (স) বলেছেন :

‘তোমরা রোজা রাখো, যেন তোমরা সুস্থ থাকতে পারো।’ [আবু হুরায়রা (রা); আল তাবারানী]

‘সবকিছুর জন্যেই যাকাত (শুদ্ধি প্রক্রিয়া) রয়েছে। শরীরের যাকাত হচ্ছে রোজা।’ [আবু হুরায়রা (রা); ইবনে মাজাহ]

রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে ফাস্টিংয়ের গুরুত্ব

অমর চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক ইবনে সিনা (পাশ্চাত্যে আভিসিনা নামে সমধিক পরিচিত, তার রচিত The cannon of Medicine ইউরোপে ৫০০ বছর মেডিকেল টেক্সট বই হিসেবে পঠিত হয়েছে) সর্বপ্রথম রোগ নিরাময়ে রোজা রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন। ফাস্টিং-এর মাধ্যমে তিনি তার রোগীদের বহু দুরারোগ্য রোগ নিরাময় করতে সক্ষম হন।

আধুনিক কালের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিস নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের The New England Journal of Medicine-এর ২৬ ডিসেম্বর ২০০৯-এ প্রকাশিত একটি রিভিউ আর্টিকেলের শিরোনাম ছিল Effect of Intermittent Fasting on Health, Aging and Disease. গবেষণা-নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে, আমাদের শরীরের কোষগুলো দুটি প্রধান উৎস থেকে শক্তি পেয়ে থাকে : গ্লুকোজ এবং ফ্যাটি এসিড। খাবার গ্রহণের পর গ্লুকোজ সাধারণত এনার্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ফ্যাটি এসিড জমা থাকে ট্রাইগ্লিসারাইড হিসেবে। রোজা/ উপবাস/ ফাস্টিং-এ ট্রাইগ্লিসারাইড ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত হয়। লিভার এই ফ্যাটি এসিডকে কিটোন বডিতে (Ketone body) রূপান্তরিত করে, যা এনার্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফাস্টিং ১২ ঘণ্টা বা তার বেশি হলে পর্যাপ্ত কিটোন বডি তৈরি হয়। আসলে রোজা/ উপবাস/ ফাস্টিং-এ যা ঘটে সেটা হলো Metabolic switching (গ্লুকোজের পরিবর্তে কিটোন বডি এনার্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়)। দেহের সঞ্চিত চর্বি ব্যবহৃত হয় বলে ওজন কমতে থাকে এবং সঞ্চিত চর্বির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেহ মুক্তি পায়।

তাই গবেষকেরা বলছেন, সুযোগ পেলেই মাঝে মাঝে রোজা/ উপবাস/ ফাস্টিং করুন। এর ফলে—

- আপনার ওজন কমবে।
- রক্তের অতিরিক্ত কোলেস্টেরল কমবে।
- ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বাড়বে।
- ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমবে।
- ফ্যাটি লিভার ডিজিজ দূর হবে।
- টাইপ-২ ডায়াবেটিস দূর হবে।
- হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ দূর হবে।
- ক্যান্সার, আলঝেইমার্স ডিজিজের ঝুঁকি কমবে।
- মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়বে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা
যা বলছেন

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম	২৪৮
জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান	২৫২
জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব.) ডা. আব্দুল মালিক	২৫৪
ডা. হাসনাইন নান্না	২৫৭

মানুষ যা ভাবতে পারে, যা বিশ্বাস করতে পারে
তা অর্জন করতে পারে।

প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও বাংলাদেশে ধূমপানবিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। ২১ জানুয়ারি ২০১১ কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব প্রকাশিত 'হৃদরোগ নিরাময়ে মেডিটেশন' সিডির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি এ বক্তব্য দেন।

প্রশান্তি ও সুস্থ জীবনাচার হৃদরোগ নিরাময় করে

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

হৃৎপিণ্ডের যত ধরনের অসুখ আছে, তার মধ্যে করোনারি হৃদরোগ অন্যতম। ধূমপান, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ইত্যাদি এ রোগের অন্যতম কারণ। প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় শুধু ওষুধ, এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস অপারেশনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ব্লকেজের চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু চিকিৎসক-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, অত্যধিক মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা হৃদরোগের অন্যতম প্রধান অনুঘটক, যার কোনো সমাধান প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় নেই।

এ-ছাড়াও অপারেশনের পর রোগী যখন আবার ধূমপান, ভাজাপোড়া ও তৈলাক্ত খাবারসহ পুরনো জীবনধারায় ফিরে যায়, আবারও সে আক্রান্ত হয় হৃদযন্ত্রের নানা জটিলতায়। তাই এ থেকে পরিপূর্ণ নিরাময়ের জন্যে প্রয়োজন ধূমপান বর্জন, জীবনধারায় পরিবর্তন এবং টেনশনমুক্ত জীবন। আমি আমার রোগীদেরকে এসব ব্যাপারে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেই।

টেনশনমুক্ত প্রশান্ত জীবনের জন্যে মেডিটেশনের ভূমিকা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। মেডিটেশন ও জীবনাচার পরিবর্তনের মাধ্যমে যারা হৃদরোগ মুক্ত

হয়েছেন, আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। এদের মধ্যে অনেকেই অপারেশন-পরবর্তী জটিলতায় আক্রান্ত হতে পারতেন। কিন্তু তা হন নি; বরং সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসাটি তারা নিতে পেরেছেন।

অপারেশনকে ভয় করেন না এমন মানুষ নেই, তাই অপারেশনের চেয়ে ঝুঁকিহীন এমন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে সুস্থ হওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। হৃদরোগ থেকে মুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের কাছ থেকে আমি শুনেছি। সৎসাহস না থাকলে এ কথাগুলো তারা এত সহজে বলতে পারতেন না। সত্য বলেই সৎসাহস ও সৎ-উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এ কথাগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। আর সত্য বলতে কোনো ভয় থাকা উচিত নয়। কারণ সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানসিক প্রশান্তি ও সুস্থ জীবনধারা হৃদরোগ নিরাময় করে—এটি এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। নানা গবেষণা আর চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতামতের ভিত্তিতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে বলেই মেডিকেল সায়েন্সের মূলধারার বই ও জার্নালগুলোতে এ কথাগুলো ছাপা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে আপনি যদি ভালো থাকতে পারেন, তবে অনর্থক কাটাছেঁড়া কেন করবেন?

প্রযুক্তির ক্রম-উৎকর্ষের ফলে শহরে-গ্রামে কোথাও আমরা এখন হাঁটি না, সর্বত্রই গাড়িতে চলাচল করি। অর্থাৎ আমাদের জীবনযাত্রা হয়ে পড়েছে শারীরিক পরিশ্রমহীন। আমাদের খাদ্যাভ্যাসেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। শাকসবজির বদলে এখন আমরা ফাস্ট ফুড, প্রক্রিয়াজাত, ভাজাপোড়া ও অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এসব খাবার যতই সুস্বাদু হোক, শরীরের জন্যে কিন্তু বিপজ্জনক। আর ধূমপানের কথা বলাই বাহুল্য। সিগারেটের নিকোটিন হৃৎপিণ্ডের ধমনীকে সংকুচিত করে। এতে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়, যা করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে আধুনিক জীবনের নানা দুশ্চিন্তা ও টেনশন।

তাই আপনার হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার জন্যে ধূমপান অবশ্যই বর্জন করুন। জীবন-অভ্যাসে পরিবর্তন আনুন। মানসিকভাবে প্রশান্তিতে থাকুন। আপনি ভালো থাকবেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ডা. ডিন অরনিশ শত শত হৃদরোগীকে এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস ছাড়াই সুস্থ করে তুলেছেন। হৃদরোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্যে তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে

ভূষিত করা উচিত বলে আমি মনে করি। সমস্ত মেডিকেল জার্নাল, গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এর ভিত্তি আছে। এতে মিথ্যা কিছু নেই। চিকিৎসক-জীবনে আমি নিজেও এর বহু প্রমাণ পেয়েছি।

নজরুলের একটি কবিতায় আছে—'বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেও না তাহার কাছে'। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বাস এবং আশাকে সঙ্গী করে রাখবেন। এই আশা এবং বিশ্বাসই আপনাকে সুস্থ করে তুলবে, সাফল্য এনে দেবে। এর পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তা যা দিয়েছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন। সবসময় কৃতজ্ঞচিত্ত থাকুন।

মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার চর্চা করে যারা সুস্থ হয়েছেন, তাদের সুস্থতার মূলেও রয়েছে এই বিশ্বাস। বিশ্বাস করে এগিয়ে গেছেন বলেই তারা আজ সুস্থ ও হৃদরোগমুক্ত। নিঃসন্দেহে তারা ভাগ্যবান। তাদেরকে বলি—আপনারা এ অভিজ্ঞতা সবাইকে জানান, পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করুন। আপনাদের খ্যাতি কিংবা পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্যে নয়, বরং মানুষের কল্যাণের জন্যে। যারা হৃদরোগ থেকে পরিত্রাণ চান, অপারেশনের ঝুঁকি থেকে দূরে থাকতে চান, সুন্দরভাবে বাঁচতে চান, তাদের জন্যে প্রচার করুন। সমাজের জন্যে, জাতির জন্যে সর্বোপরি মানুষের কল্যাণার্থে এ সুসংবাদ সবার কাছে পৌঁছে দেয়া একটি নৈতিক কর্তব্য বলে আমি মনে করি। বিশ্বাসের সাথে আমি যে কথাগুলো বললাম, তাতে আমার পেশার কোনো ক্ষতি হবে না। আমার পেশা তার যোগ্য সম্মান নিয়েই বেঁচে থাকবে।

প্রায় ২০ বছর আগে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের শিথিলায়ন মেডিটেশনের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আমি অতিথি হয়ে এসেছিলাম। সেদিনও 'প্রশান্তিতে মুক্তি' শীর্ষক ভাষণে একজন চিকিৎসক হিসেবেই আমি বলেছিলাম—'শুধু ট্যাবলেট, মিকশ্চার বা প্রেসক্রিপশন দিয়ে সব রোগমুক্তি সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক চিকিৎসককেই তার পেশাগত জীবনে এমন কিছু রোগীর সংস্পর্শে আসতে হয়, যাদের রোগের সাথে কোনো না কোনোভাবে টেনশন জড়িত। দেখা গেছে, হাসপাতালের বহির্বিভাগে যে রোগীরা যান, তাদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগেরই কোনো ওষুধের প্রয়োজন হয় না। কাউন্সেলিং বা সৎপরামর্শ, আত্মবিশ্বাস এবং প্রশান্তিতে এ সমস্ত রোগের মুক্তি হয়। আর অস্থির-অশান্ত আধুনিক মানুষের জীবনে প্রশান্তির সুবাতাস আনতে পারে মেডিটেশন। কোয়ান্টাম মেডিটেশন মানুষের মনে প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে রোগ

নিরাময়কে ফলপ্রসূ করে, যা এখন পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। তাই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে কোয়ান্টাম মেথড চমৎকার কাজ করতে পারে। যে-সব রোগে ওষুধের প্রয়োজন নেই, তার নিরাময়ে কোয়ান্টামই হতে পারে সার্থক বিকল্প।'

আসলে শরীরের চেয়ে মন অনেক বেশি শক্তিশালী। মনের গতি, শক্তি, পরিধি সবই ব্যাপক। মনের এই দুর্দমনীয় শক্তির প্রভাবে শরীরে এমন কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, এমনকি রোগ নির্মূলেও সাহায্য করে।

যুগে যুগে মহামানবরা, নবী-রসুলরা বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ধ্যানের এই শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। এটি তাই নতুন কিছু নয়। এটি হাজার বছরের শাশ্বত চেতনারই একটি আধুনিক ও সমন্বিত রূপ, যার উৎস এই প্রাচ্য। বর্তমানে হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের এ প্রক্রিয়া সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনস্বীকৃত। তাই আমি আশা করব, হৃদরোগ নিরাময়ের এ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

পরিশেষে এটাই বলি—আপনার সুস্থতা ও নিরাময়ের দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। তাই সুস্থ হৃদযন্ত্র সর্বোপরি সুস্থ জীবনের জন্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করুন। অর্থাৎ ইতিবাচক ও কৃতজ্ঞচিত্ত হোন। প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হোন। নিয়মিত হাঁটুন, ব্যায়াম করুন এবং টেনশনমুক্ত জীবনযাপন করুন। সবচেয়ে বড় কথা—বিশ্বাস এবং আশা নাই যাদের, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকুন। সবসময় আশাবাদী, বিশ্বাসী ও ভালো মানুষদের সংস্পর্শে থাকুন। আপনি ভালো থাকবেন।

বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার পথিকৃৎ ও শিশুবন্ধু প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান।
১৯ অক্টোবর ২০১২ কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব আয়োজিত হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে তিনি এ বক্তব্য দেন।

জীবনযাপনে সচেতন হোন ॥ আপনার হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকবে

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা অধিকাংশ মানুষ আজ ভুল খাদ্যাভ্যাসের দিকে ঝুঁকে পড়ছি। স্বাস্থ্যঘাতী নানারকম খাবার একটু একটু করে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে ঠাঁই করে নিয়েছে। ছোট ছোট শিশুরা এখন বোতলজাত জুস, সফট ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকসের প্রতি মাত্রাতিরিক্তভাবে আসক্ত। অথচ আপনার শরীরের জন্যে, বিশেষ করে কিডনির সুস্থতার জন্যে দরকার হলো পানি। অন্যদিকে এসব ড্রিংকস ও জুস শিশুসহ যে-কোনো বয়সের মানুষের কিডনির ক্ষতির কারণ। সুস্থ থাকতে চাইলে সবারই এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে নিরাময় ও সুস্থতার এক সহজাত শক্তি। ডা. হার্বার্ট বেনসন বলেছেন, 'একজন মানুষ রিল্যাক্সেশন, মেডিটেশন, ব্যায়াম ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন'। এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তই আমরা দেখছি কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে।

অনেক হৃদরোগী আছেন, যাদের হয়তো একবার এনজিওপ্লাস্টি কিংবা বাইপাস অপারেশন করা হয়েছে; কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল, আবার বুকে ব্যথা, নতুন ব্লকেজ ইত্যাদি। তিনি আবারও অসুস্থ হতে শুরু করলেন। অর্থাৎ চিকিৎসা নেয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বার বার একই ঘটনা ঘটে চলেছে। এ দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ একটাই—আপনার জীবনযাপনের প্রতি মনোযোগী হোন। স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। ব্যায়াম করুন। অবশ্যই মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকুন।

করোনারি হৃদরোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই দুশ্চিন্তা ও টেনশন। টেনশন যে শুধু হৃৎপিণ্ডেরই ক্ষতি করে তা নয়; বরং আমাদের সার্বিক সুস্থতার পথেও এটি একটি প্রধান বাধা। তাই সুস্থ থাকতে হলে প্রথম কথা হলো, আপনাকে টেনশনমুক্ত হতে হবে। মানসিক চাপ কমাতে হবে।

টেনশনের মতো হৃৎপিণ্ডের আরেক শত্রু হলো আপনার রাগ। রাগ-ক্রোধ আপনাকে নানাভাবে অশান্ত করে তোলে, আপনার মধ্যে স্ট্রেস তৈরি করে, আপনাকে কুরে কুরে খায়। তাই রাগ বর্জন করা খুব জরুরি। 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'—কোয়ান্টামের এই কথাটি ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব পছন্দ করি এবং সবাইকে বলি। প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় নিত্যনতুন অনেক ওষুধ আবিষ্কৃত হচ্ছে সত্য, কিন্তু জীবনের এ দিকগুলোর প্রতি কোনোরকম মনোযোগ দেয়ার সুযোগ সেখানে নেই। আমার খুব ভালো লাগে যে, কোয়ান্টাম এ বিষয়গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরছে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে আমি দেখেছি, অসংখ্য মানুষ এখানে এসে নিজেদের চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাপনের প্রতি সচেতন হয়ে উঠছেন। সমস্ত নেতিবাচকতার বৃত্ত ভেঙে তারা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উঠছেন। যিনি এসেছিলেন রোগ শোক জরা ব্যাধি অস্থিরতা দুঃখ নিয়ে—মনের ও বিশ্বাসের শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে তিনি সুস্থতার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। কারণ যে-কোনো রোগমুক্তি এবং সর্বোপরি পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যে মানসিক চাপমুক্তি ও প্রশান্তিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে অর্থে, কোয়ান্টাম সত্যিই মানুষকে সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন ও কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের আলোকিত পথে পরিচালিত করছে।

বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর মহাসচিব জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিক। ১৯ অক্টোবর ২০১২ কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব আয়োজিত হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এ বক্তব্য দেন।

সুস্থ জীবনধারা, প্রার্থনা ও মেডিটেশন ॥ হৃদরোগ নিরাময় করে

জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব.) ডা. আব্দুল মালিক

বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে সংক্রামক ব্যাধির পরিমাণ কমে যাওয়ার সাথে সাথে অসংক্রামক ব্যাধি বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার মারাত্মক স্বাস্থ্য-সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগ মৃত্যুর কারণ হলো এসব অসংক্রামক ব্যাধি, যার অন্যতম হচ্ছে করোনারি হৃদরোগ এবং এটি শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ মৃত্যুর কারণ। গত ২০ বছরে বাংলাদেশে হৃদরোগে মৃত্যুর হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শতকরা ২০-২৫ জন উচ্চ রক্তচাপে এবং শতকরা ১০ জন করোনারি হৃদরোগে ভুগছেন।

মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যে অঙ্গটি নিরলস কাজ করে আমাদের কর্মক্ষম রাখে, সেটি হলো আমাদের হৃৎপিণ্ড। আমরা জানি, রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষে পৌঁছে যায়। আর হৃৎপিণ্ডে এটি পৌঁছে দেয় করোনারি আর্টারি।

আমরা যখন ক্রমাগত ভুল খাদ্যাভ্যাস ও ভ্রান্ত জীবনাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন এই করোনারি আর্টারির ভেতরের দেয়ালে ক্রমশ কোলেস্টেরল জমতে থাকে এবং রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হয়। একসময় বুকে ব্যথা অনুভূত হয়, যাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয় এনজাইনা। এরই পরিণতিতে একসময় দেখা দিতে পারে হার্ট অ্যাটাক (Myocardial Infarction)।

সাধারণভাবে ছোটবেলা থেকেই রক্তনালীতে কোলেস্টেরল জমা শুরু হয় এবং একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর উপসর্গ দেখা দেয়। করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকিপূর্ণ কারণগুলো হলো : ধূমপান, ভুল খাদ্যাভ্যাস, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য, অতিরিক্ত ওজন, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং মানসিক চাপ ইত্যাদি।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে হৃদরোগ ও স্ট্রোক অন্যতম ঘাতক ব্যাধি এবং অকালমৃত্যুর জন্যে দায়ী। বিশ্বে প্রতিবছর এক কোটি ৭৫ লাখ মানুষ এ রোগে মারা যায় এবং এ সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে দুই কোটি ৩০ লাখ মৃত্যু ঘটবে শুধু হৃদরোগেই, যা সত্যিই খুব দুঃখজনক। কারণ যে বয়সে হৃদরোগসহ এ ধরনের ভুল জীবনাচারজনিত অসুখে মানুষ ভুগতে শুরু করে এবং মারা যায়, সেই সময়টি হলো জীবনের সুন্দরতম একটি সময়, যখন তারা নিজেদের পরিবার-সমাজ-জাতির জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখতে পারতেন।

করোনারি হৃদরোগ একবার হয়ে গেলে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। এজন্যে প্রথম থেকেই এর প্রতিরোধের দিকে জোর দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ডা. ডিন অরনিশ প্রমাণ করেছেন যে, সুস্থ জীবনযাপন, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস, কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম, মেডিটেশন বা ধ্যানের মাধ্যমে অনেক হৃদরোগী অপারেশন ও এনজিওপ্লাস্টি ছাড়াই সুস্থ হয়েছেন। আর আমাদের মনে রাখা উচিত যে, অপারেশন ও এনজিওপ্লাস্টি কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। সুস্থ থাকতে চাইলে সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত জীবনযাপনের কোনো বিকল্প নেই। তা না হলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

নিরাময়ের এক অসাধারণ ক্ষমতা দিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে

পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর মানুষ শুধু একটি দেহ নয়, দেহ এবং আত্মা—এ দুয়ের সমন্বয়ে একজন মানুষ। পরিপূর্ণ সুস্বাস্থ্যের জন্যে তাই দেহ ও আত্মা উভয়েরই সুস্থতা জরুরি। আমাদের দেহ বস্তু জগতের, এটি স্থান-কালে সীমাবদ্ধ। আর আত্মা অপার্থিব জগতের—যা মুক্ত, বন্ধনহীন এবং স্থান-কালে সীমাবদ্ধ নয়। এই আত্মা ভালো থাকলে মানুষের শরীরও ভালো থাকে। তাই প্রয়োজন স্রষ্টার প্রতি মানুষের পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস, প্রকৃত জ্ঞান অর্জন এবং সবসময় সৎকর্ম করা।

জীবনে সুখশান্তি চাইলে এটি অর্জনের উপায়ও জানতে হবে। শুধু পার্থিব সম্পদ মানুষকে সুখশান্তি দিতে পারে না। সুখী হতে হলে শরীর এবং আত্মাকেও সুস্থ রাখতে হবে। আর শারীরিক সুস্থতার জন্যে সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে। আত্মার সুস্থতার জন্যে স্রষ্টায় বিশ্বাসের পাশাপাশি পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হতে হবে। ধর্মের মূল শিক্ষার অনুশীলন, নিয়মিত প্রার্থনা ও মেডিটেশন চর্চা আত্মায় প্রশান্তি আনে। আর রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে এটি কাজ করে এক চমৎকার সহায়ক শক্তি হিসেবে।

মানুষের মন তার অতীতের সুখ-দুঃখ কিংবা ভবিষ্যতের চিন্তা-আশঙ্কা নিয়ে সবসময় অস্থির থাকে। এই অস্থির মনকে স্থিরতা, শান্তি ও কল্যাণের পথে আনতে হলে মেডিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চঞ্চল মনকে শান্ত ও সংযত করতে পারলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণকারী মহাচেতনার সাথে যোগাযোগ সম্ভব। সত্যে পৌঁছার জন্যেও মনকে শান্ত করা চাই। এজন্যেই মেডিটেশন।

মেডিটেশন আমাদের মনকে শান্ত করে, বর্তমানে নিয়ে আসে। নিজের প্রতি মনোযোগ দিতে শেখায়। টেনশন ও চাপমুক্তি তখন সহজ হয়। এর পাশাপাশি জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ এবং জীবনধারা পরিবর্তন করাও অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান সময়ে যত রোগ হচ্ছে, তার একটা বড় কারণ হলো মানুষের ভুল জীবনযাপন। এ বিষয়গুলোর প্রতি কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব মানুষকে সচেতন করে তুলছে, একটি সময়োপযোগী উদ্যোগের মাধ্যমে হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে কাজ করে যাচ্ছে। সেজন্যে আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হাসনাইন নান্না। ১৯ অক্টোবর ২০১২ কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব আয়োজিত হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে তিনি এ বক্তব্য দেন।

এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস ॥ হৃদরোগ নিরাময়ে স্থায়ী সমাধান নয়

ডা. হাসনাইন নান্না

একজন হৃদরোগ চিকিৎসক হিসেবে আমাকে প্রতিদিন কিছু রুটিন কাজের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যেমন : রোগী দেখা, প্রয়োজনে তাদের কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো, কখনো-বা এনজিওগ্রাম করা এবং রোগীর ব্লকেজের পরিমাণ অনুসারে স্টেন্ট বা রিং লাগানো। আর ব্লকেজের পরিমাণ অনেক বেশি হলে তাকে বাইপাস অপারেশনের পরামর্শ দেয়া।

একটা গান আছে—*বলতে হলে নতুন কথা, চেনা পথের বাইরে চলো*। আজ আমি আমার প্রতিদিনকার এই চেনা পথের বাইরের কিছু কথাই আপনাদের বলব। তার আগে আমার চেনা পথের দুটি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা শোনাই।

২০০৮ সালের কথা। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে ভর্তি হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বর্ষীয়ান অধ্যাপক। আনুষঙ্গিক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তাকে বললাম, মনে হচ্ছে আপনার হার্টে ব্লকেজ থাকতে পারে। এনজিওগ্রাম করে নিলে ব্যাপারটা নিশ্চিত করে বলা যাবে।

তিনি ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। এমনিতে বেশ হাসিখুশি ও খুব সাহসী মানুষ। বললেন, 'কুচ পরোয়া নেহি। এনজিওগ্রাম করে ফেলুন।' আমরা এনজিওগ্রাম করলাম। দেখা গেল, ব্লকেজের পরিমাণ এত বেশি যে, তাতে স্টেন্ট লাগিয়ে কাজ হবে না। বাইপাস অপারেশন করাতে হবে। বিষয়টা শুনে তিনি প্রথমে কিছুটা দমে গেলেও, পরে রাজি হলেন। বাইপাস করা হলো। একমাসের মাথায় মোটামুটি সুস্থ হয়ে তিনি ফিরে গেলেন তার ব্যস্ত জীবনে।

মাস ছয়েক পর একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ আবার তার ফোন। বললেন, খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এখন কী করণীয়? একটা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চলে আসতে বললাম। স্যার এলেন। ভর্তি করা হলো তাকে। প্রথমবার অসুস্থ হয়ে যখন এসেছিলেন, তখন বাইপাস করানোসহ সবমিলিয়ে হাসপাতালে ছিলেন একমাস। এবার তাকে থাকতে হলো বেশ অনেকদিন। অস্বাভাবিক রকমের একটা লম্বা সময় তিনি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কাটালেন। প্রায় চার মাস লাগল তার সেরে উঠতে।

এ ঘটনার বছর তিনেক পর এই কিছুদিন আগে একটা ব্যক্তিগত কাজে তাকে ফোন করলাম। জানতে চাইলাম, স্যার কেমন আছেন? তার খুব সহজ স্বীকারোক্তি—'আমি ভালো নেই'। কেন স্যার, কী হলো? তিনি বললেন, 'আবার সমস্যা দেখা দিয়েছে, মাত্র গতকালই হাসপাতাল থেকে ফিরেছি। এবার একমাস হাসপাতালে ছিলাম। আবার এনজিওগ্রাম করা হয়েছে। বাইপাস আর্টারিতে নতুন ব্লক। এখন যে কী করব বুঝে উঠতে পারছি না!'

আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটা যাকে নিয়ে, তিনি আমার এক ডাক্তার বড় ভাই। বহুদিন দেশের বাইরে ছিলেন। দেশে ফিরলেন ১৯৯০ সালে। রাজশাহীতে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। ছাত্রজীবনে রাজনীতি করতেন, খুব ভালো বক্তা ছিলেন। দেশে ফিরেও প্র্যাকটিসের পাশাপাশি রাজনীতিতে সক্রিয় হলেন আবার।

হঠাৎ একদিন তার ফোন। তিনি ঢাকায় আসবেন, ডাক্তার দেখাতে হবে। কদিন আগে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ গিয়েছিলেন একটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের অতিথি হয়ে। হঠাৎ তার ভীষণ বুকব্যথা। সাথে দরদর করে ঘাম। বক্তৃতা আর দেয়া হয় নি। তিনি ঢাকায় এলেন। এনজিওগ্রাম করা হলো। হার্টের বাম দিকের রক্তনালী হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্লক্‌ড। রিং পরানো হলো। তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। আবার শুরু করলেন রাজনীতি। সাথে নিয়মিত প্র্যাকটিস।

দুবছরের মাথায় হঠাৎ একদিন তার ফোন। আবার সমস্যা দেখা দিয়েছে। ঢাকায় এলেন। এবার করা হলো সিটি এনজিওগ্রাম। তাতে দেখা গেল, আগে যেখানটায় রিং পরানো হয়েছিল তার পাশে আরেকটি ব্লকেজ। তার মন খুব খারাপ। বললেন, দেশে আর নয়। চলে গেলেন দিল্লি। ওখানে আবার এনজিওগ্রাম করা হলো। তাতেও একই রিপোর্ট। অগত্যা আরেকটি রিং পরিয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন।

একবছরের মাথায় আবার বুকব্যথা। আবার দিল্লি। আবার এনজিওগ্রাম। এবার আরো দুঃসংবাদ। দ্বিতীয়বার যে রিংটি লাগানো হয়েছিল সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। সাথে অন্যান্য রক্তনালীতেও নতুন ব্লকেজ। ফুসফুসেও কিছু সমস্যা দেখা গেছে। তাকে বলা হলো, বিশেষ ধরনের একটা বাইপাস অপারেশন আছে—রোবটিক সার্জারি—আপনি সেটা করাতে পারেন।

রোবটিক সার্জারি করেন যিনি, সেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে গেলেন। ১৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। যা-ই হোক, সেবার কিছু না করে তিনি দেশে চলে এলেন। কিছুদিন আগেও যে মানুষটি নিয়মিত প্র্যাকটিস করতেন, রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, এবার তিনি হয়ে গেলেন পুরোপুরি গৃহবন্দি। প্র্যাকটিস, রাজনীতি সব বন্ধ। এখন সারাদিন ইন্টারনেটের সামনে বসে সার্চ করতে থাকেন রোবটিক সার্জারি কোথায় হয়, কেমন করে হয়, কত খরচ ইত্যাদি।

এই যে দুটি অভিজ্ঞতা আমার, এমন ঘটনার সংখ্যা কিন্তু খুব কম নয়। এ দুজন হৃদরোগী আধুনিকতম চিকিৎসা গ্রহণ করেছিলেন। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, সেটা কোনো স্থায়ী সমাধান ছিল না। তাদের দুজনেরই অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, কিন্তু এখন কোনো উপায় নেই। হৃদরোগীদের অনেকেই আছেন, যাদের কাছে এসব অভিজ্ঞতা নতুন নয়।

করোনারি হৃদরোগে আসলে কী ঘটে? হার্টের করোনারি আর্টারিতে কোলেস্টেরল জমে জমে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে। ফলে হার্ট বঞ্চিত হয় তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি থেকে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দেয় বুকে ব্যথা, চাপ এবং শ্বাসকষ্টসহ আরো নানা উপসর্গ।

আমরা যদি দেখি, এ রোগ কেন হয়? ধূমপান, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস, বিজ্ঞাপন-নির্ভর ভুল খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম না করা, মানসিক চাপ এবং টেনশন করোনারি হৃদরোগের প্রধান কারণ।

একজন রোগী যখন এসে বলেন যে, একটু হাঁটলে বা পরিশ্রম করলে কিংবা সিঁড়ি বেয়ে উঠলে তার বুকব্যথা হচ্ছে, তিনি বুকে চাপ অনুভব করছেন, এই ব্যথা আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে দাঁতের গোড়া অবধি বা পিঠে, বাম হাতে যাচ্ছে, তখন প্রাথমিকভাবে আমরা এগুলোকে করোনারি হৃদরোগের উপসর্গ বলেই ধরে নিই।

করোনারি হৃদরোগের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে রোগীকে আমরা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরামর্শ দিয়ে থাকি। এতে প্রথমেই আসে ইসিজি-র কথা। অনেকের ধারণা, ইসিজি স্বাভাবিক তো সব ঠিক, হৃদরোগ নেই। আমি নিজেও একসময় তা-ই মনে করতাম। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে ঠিক তা নয়। আমার এই ভুল ভাঙাল একজন রোগীর এটেনডেন্ট। আমরা ডাক্তাররা বই পড়ে যা শিখি, কখনো কখনো তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখি রোগী এবং রোগীর এটেনডেন্টের কথা শুনে।

২০০০ সালের ঘটনা। আমি তখন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে কার্ডিওলজিতে উচ্চতর পড়াশোনা করছি। একদিন সিসিইউ-তে ডিউটি করছি। এক রোগীর এটেনডেন্ট এসে বললেন, ডাক্তার সাহেব, আমার রোগীটা জরুরি বিভাগে আছে, এই তার ইসিজি, একটু দেখে দিন। দেখলাম। বললাম, আপনার রোগীর ইসিজি তো নরমাল, রোগী ভালো আছে। তখন তিনি বললেন, এটাই তো আমার রোগীর সমস্যা। রোগীর ইসিজি সবসময় স্বাভাবিকই থাকে, কিন্তু বুকের ব্যথা কমছে না। ডাক্তাররা বলেছেন, এটা হার্টের অসুখ, হার্টে ব্লক আছে।

সেদিন খুব অবাক হয়েছিলাম। পরে অবশ্য আমার প্রফেসরদের কাছে জেনেছি—ভালো কার্ডিওলজিস্ট হতে হলে ইসিজিকে অবিশ্বাস করতে হবে। কারণ শুধু ৪৮ ভাগ হৃদরোগ বোঝা যায় ইসিজি দেখে। বাকি ৫২ ভাগ বুঝতে হয় রোগীর উপসর্গ শুনে। আর এ শোনাটা ফলপ্রসূ হয় কেবল তখনই, যখন রোগীর কথা মনোযোগ ও মমতা সহকারে শোনা হয়।

তাই চিকিৎসকের কাছে গেলে আগে আপনার শারীরিক অসুবিধাগুলো তাকে বলুন। রোগের উপসর্গগুলো বিস্তারিত বলুন। কেউ বলতে পারেন যে, ডাক্তার সাহেব কথা শোনেন না, শুনতে চান না। অভিযোগটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সত্যি। কিন্তু রোগীদের আমি বলি, এর সমাধান খুব সহজ। আপনার কথা যিনি শুনবেন সেই ডাক্তারের কাছে যান। খুঁজে বের করুন।

উপসর্গ বিবেচনার পাশাপাশি ইসিজি ছাড়াও করোনারি হৃদরোগ নির্ণয়ের জন্যে আছে আরো কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যেমন : ইটিটি, ইকোকার্ডিওগ্রাম ও করোনারি এনজিওগ্রাম। এর রিপোর্ট অনুসারে কার্ডিওলজিস্টরা রোগীকে এনজিওপ্লাস্টি কিংবা বাইপাস অপারেশনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সাথে সারাজীবন ওষুধ সেবনের নির্দেশনা তো আছেই।

বাইপাস অপারেশন নিয়েও আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে। সেটিও আমি যখন হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে কাজ করছিলাম, সেই সময়কার ঘটনা। একজন রোগী এলেন। তার সব রিপোর্ট দেখে জানলাম, হার্টের তিনটা আর্টারিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্লক। তিনটা রক্তনালী পুরোপুরি বন্ধ। লোকটা তাহলে বেঁচে আছে কীভাবে? রোগীর এটেনডেন্ট বললেন, ডাক্তার তাদের বলেছেন যে, রোগীর তিনটা আর্টারিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্লক আছে সত্যি কিন্তু রিং লাগানো বা বাইপাস কিছুই প্রয়োজন নেই; আল্লাহর রহমতে তার অটো-বাইপাস হয়ে গেছে (চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় ন্যাচারাল বাইপাস)। এসব ঘটনা দেখে আমার সত্যিকারের শেখা শুরু হলো।

পরে জেনেছি, ন্যাচারাল বাইপাস ঘটে মূলত কোলেটারাল সার্কুলেশনের মাধ্যমে। আমাদের হার্টের চারপাশে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালী রয়েছে। নিয়মিত হাঁটা এবং ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে এই পরিপূরক রক্তনালীগুলো সক্রিয় ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। হার্টের মূল রক্তনালীগুলোতে ব্লকেজের কারণে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে এই পরিপূরক রক্তনালীগুলো তখন প্রয়োজনীয় কাজটুকু চালিয়ে নেয়। এটাই ন্যাচারাল বাইপাস।

আসলে হৃদরোগ থেকে নিরাময় ও সুস্থ জীবনযাপনের জন্যে নিয়মিত হাঁটা, ব্যায়াম, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান বর্জন আর টেনশনমুক্ত থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ করোনারি হৃদরোগের প্রচলিত চিকিৎসাগুলো রোগীদের জীবনে কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারছে না। রোগী যে চিকিৎসাই নিচ্ছেন, কিছুদিন পরই ঘুরে-ফিরে আবার সেই একই সমস্যা। আমার পরিচিত এরকম দুজন রোগীর কথা প্রথমেই বলেছি। আবার অন্যদিকে যারা ভুল অভ্যাসগুলো পাল্টে ফেলেছেন তারা সত্যিই ভালো আছেন, এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস করুন আর না-ই করুন। সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটেই একথা সত্য।

সন্দেহ নেই, আমেরিকার চিকিৎসাব্যবস্থা বিশ্বের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ। বাইপাস অপারেশনের শুরুও ওখানেই। ১৯৬৭ সালে

আমেরিকার ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকে প্রথম সফল বাইপাস সার্জারি করা হয়। সেই থেকে এখন পর্যন্ত ৪৫ বছর পেরিয়ে গেছে। বাইপাস তো হরদম হচ্ছে দেশে-বিদেশে, কিন্তু তারপর কী অবস্থা? সবাই কি ভালো আছেন?

আমেরিকার একজন রোগীর কথা বলি। রোগী আর কেউ নন, খোদ আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। বুকে ব্যথা হলো। হাসপাতালে ভর্তি হলেন। এনজিওগ্রাম করা হলো। আমেরিকার সেরা কার্ডিওলজিস্টদের নিয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হলো। সিদ্ধান্ত হলো, বাইপাস করতে হবে। করা হলো বাইপাস। ক্লিনটন সুস্থ হয়ে আবার কাজকর্ম শুরু করলেন। কিছুদিন পর ব্যক্তিগত জীবনে কিছু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন। প্রেসিডেন্টশিপ চলে যাওয়ার মতো গুরুতর অবস্থা তৈরি হলো। সবমিলিয়ে ভীষণ এক স্ট্রেসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।

ঝামেলা একসময় মিটল ঠিকই, কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। বাইপাসের ছয় বছরের মাথায় আবার বুকে ব্যথা। যথারীতি আবার এনজিওগ্রাম, আবার মেডিকেল বোর্ড। সিদ্ধান্ত হলো রিং পরানোর। রিং পরালেন। এবার জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি। তার চুরুট খাওয়ার অভ্যাস ছিল, ত্যাগ করলেন দীর্ঘদিনের সে অভ্যাস। চর্বিযুক্ত খাবার ও ফাস্ট ফুড ছেড়ে দিলেন পুরোপুরি। শুরু করলেন শাকসবজি আর ফলমূল খাওয়া। এখন তিনি ভালো আছেন।

শুধু তা-ই নয়, বিল ক্লিনটন দ্বিতীয় মেয়াদে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে হোয়াইট হাউজে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের একজন ছিলেন ডা. ডিন অরনিশ। ক্যালিফোর্নিয়ার এই চিকিৎসাবিজ্ঞানী মেডিটেশন এবং সুস্থ জীবনযাপনের মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ নিরাময়ের পথিকৃৎ। এ থেকেই বোঝা যায়, হৃদরোগ নিরাময়ে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থ জীবনাচার অনুশীলনের ব্যাপারে ক্লিনটন নিজে কতটা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

সুস্থতার জন্যে আসলে এই জীবনযাপন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি এদিকে দৃষ্টি দেবেন, পৃথিবীর যে দেশেই যত উন্নততর চিকিৎসা আপনি নেন, সমস্যা সমস্যার জায়গাতেই থেকে যাবে। তাই হৃদরোগ থেকে নিরাময় ও সুস্থ জীবনের জন্যে স্থায়ী সমাধান যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তার চাবিকাঠি একমাত্র আপনার হাতেই, ডাক্তার আর ওষুধ আপনার সহযোগী মাত্র।

আমরা ভালো আছি

হৃদরোগ জয় করেছেন যারা | ২৬৫
ওষুধ ছাড়াই ডায়াবেটিস তাদের নিয়ন্ত্রণে | ২৭৩
উচ্চ রক্তচাপ মুক্ত হলেন তারা | ২৭৬
কাঙ্ক্ষিত ওজন অর্জন করলেন তারা | ২৭৮

প্রতিটি বিষয়কে পুরোপুরি গ্রহণ করুন।
তাহলেই আপনি এ থেকে পরিপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারবেন।

আমরা ভালো আছি

২০১০ সালে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের পথচলা শুরু। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা ও ডায়াবেটিস আক্রান্ত বহু রোগী হার্ট ক্লাবের সদস্য হওয়ার পর বদলে ফেলেছেন তাদের অতিপরিচিত জীবনধারা। খাওয়াদাওয়ার মেন্যু থেকে শুরু করে চিন্তাভাবনার ধারাও তারা বদলেছেন হার্ট ক্লাবের নির্দেশনা অনুসারে।

হার্ট ক্লাবের সাথে যারা সম্পৃক্ত থেকে নিয়মিত সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ করেছেন, তাদের প্রায় সকলেই এসব রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। তাদের কয়েকজনের জীবন-অভ্যাস পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা ও সুস্থতার অনুভূতি তাদের বয়ানে তুলে ধরা হলো। তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি অনুপ্রাণিত করবে আপনাকেও।

হৃদরোগ জয় করেছেন যারা

প্রতিদিন এক-দেড় ঘণ্টা জোরকদমে হাঁটি

ইঞ্জি. মো. শাহ আলম তালুকদার
কনসালটেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েটস, ঢাকা

২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়। কিছুদূর হাঁটলে প্রায়ই শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা অনুভব করতাম। দু-তিন মিনিট দাঁড়ালে ঠিক হয়ে যেত। চেক-আপ করালাম। ইসিজি ও ইকো রিপোর্ট ভালো এলেও ইটিটি রিপোর্টে সমস্যা ধরা পড়ল। এরপর এনজিওগ্রাম রিপোর্টে ছয়টা ব্লক পাওয়া গেল। দুটি ১০০%, দুটি ৯০% এবং দুটি ৮০%। ডাক্তার অতি দ্রুত বাইপাস করার পরামর্শ দিলেন। প্রস্তুতি না থাকায় বাসায় ফিরে এলাম।

একদিন রাতে আমার এক প্রকৌশলী বন্ধু আমাকে দেখতে বাসায় এলেন। তিনি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। আমার বিছানায় বসে তার মোবাইল ফোন থেকে একটা মেডিটেশন বাজিয়ে আমাকে শোনালেন এবং বললেন—কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবে গিয়ে আপনি একবার পরামর্শ করুন এবং এরপর সিদ্ধান্ত নিন বাইপাস করাবেন কিনা।

পরদিন সেখানে গিয়ে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের মডারেটরের সাথে বিস্তারিত আলাপ করলাম। তিনি দুই দিন পরে অনুষ্ঠিতব্য হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিতে বললেন। ওরিয়েন্টেশনে অংশ নেয়ার পর বাইপাস অপারেশনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলাম। হার্ট ক্লাবের নির্দেশনা অনুসারে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করলাম। এ-ছাড়া প্রতিদিন হাঁটা, ইয়োগা, প্রাণায়াম, মেডিটেশনসহ হার্ট ক্লাবের সব নিয়মকানুন মেনে চলতে থাকলাম।

এখন আমি আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি। প্রতিদিন এক থেকে দেড় ঘণ্টা জোরকদমে হাঁটতে পারি এবং প্রাত্যহিক সকল কাজ সুন্দরভাবে করতে পারি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

ভুলেই গেছি—আমি হৃদরোগী

মো. রফিকুল ইসলাম
অবসরপ্রাপ্ত উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, গাজীপুর

২০০৯ সালে আমার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর চিকিৎসকদের কথা শুনে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। এরপর ভারতে গেলাম ডা. দেবী শেঠির কাছে। তিনি আমাকে আশা দিলেন—আমার হার্টে রিং না পরালেও চলবে।

আমার হার্টে তিনটি ব্লক ছিল। একটিতে ১০০%, একটিতে ৯৮% এবং অন্যটিতে ৬৫%। এ অবস্থায় দেশে ফিরে আমি ওষুধ খেতে থাকলাম। কিন্তু আবারও হতাশা আমাকে ঘিরে ধরল। কারণ আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং ডাক্তাররা বললেন—আবার আমার হার্ট অ্যাটাক হবে, যদি আমি রিং না পরাই বা বাইপাস সার্জারি না করাই।

২০১০ সালে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশনের প্রথম ব্যাচে অংশ নিয়ে হতাশার মাঝে আলোর দিশা পেলাম। দুই দিনের ওরিয়েন্টেশনে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সম্পর্কে প্রথম ধারণা পেলাম। মনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে জীবনকে বদলে ফেলা যায়, কোয়ান্টাম থেকে আমি সেটাই শিখেছি। আজ ১০ বছর ধরে আমি কোয়ান্টাম জীবনাচার অনুসরণ করে অনেক ভালো আছি! কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের ছয়টি কম্পোনেন্ট অনুসরণ করছি গত ১০ বছর ধরে।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়মিত মেডিটেশন, বিজ্ঞানসম্মত খাবার গ্রহণ, কোয়ান্টাম ইয়োগা ও দমচর্চা, হাঁটা এবং গ্রুপ কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিয়ে আমি এখন এতটাই ভালো আছি যে, ভুলেই গেছি—আমি একজন হৃদরোগী!

আলহামদুলিল্লাহ! হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ১০ বছর পর আমি এখন নিজেকে ১০০ ভাগ সুস্থ মানুষ ভাবতে পারছি!

হার্টের অসুবিধা নিয়ে এখন আর হাসপাতালে যেতে হয় না

এ. কে. এম নূরুল ইসলাম
ব্যবসায়ী, ঢাকা

২০১৩ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি। সেখানেই কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কথা জানতে পারি। আমার দৈনন্দিন জীবন বেশ গোছানো ছিল। অতিরিক্ত খাওয়া বা বেশি তেলযুক্ত খাবার খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু জীবন ছিল স্ট্রেসফুল।

২০০৪ সালে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়। তিন দিন অজ্ঞান ছিলাম। টানা ১০ দিন হাসপাতালে ছিলাম। এনজিওগ্রাম রিপোর্টে মেইন আর্টারিতে ব্লকেজ পাওয়া গেল। ইমেডিয়েট বাইপাস করার পরামর্শ দেয়া হলো। ডাক্তারদের কথা শুনে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কোথায় বাইপাস করাব সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। এমনি করে ছয় মাস কেটে গেল। এই ছয় মাস আমি বাসার বাইরে বের হই নি। ব্যবসা বন্ধ। এক দুঃসহ অবস্থা।

দেশেই একটি হাসপাতালে বাইপাস অপারেশন করা হলো। এরপর প্রতিদিন আমাকে ১৪ রকমের ওষুধ খেতে হতো। মাসে ওষুধ বাবদ খরচ হতো পাঁচ হাজার টাকার বেশি এবং বছরে তিন-চার বার নানা অসুবিধা নিয়ে হাসপাতালে যেতে হতো। ২০১৩ সালে কোয়ান্টাম হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশন করার পর কাউন্সেলিং সেশনে অংশগ্রহণ করি টানা দুবছর। নির্দেশনাগুলো মেনে চলি শতভাগ। অর্থাৎ নির্দেশিত খাদ্যাভ্যাস, হাঁটা, ইয়োগা, প্রাণায়াম, মেডিটেশন চর্চা। এর ফলে এখন আমার ওষুধ বাবদ খরচ হয় মাসে ২৫০-৩০০ টাকা। এরপর হার্টের অসুবিধা নিয়ে আমাকে হাসপাতালে যেতে হয় নি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! এখন বেশ ভালো আছি।

শেষে একটি কথা বলি—ওরিয়েন্টেশন করাটা এন্টিবায়োটিক ওষুধ নয় যে, করলাম আর ভালো হয়ে গেলাম। হার্ট ক্লাব নির্দেশিত বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাহলে যে-কেউ সুস্থ থাকতে পারবে, যেমন আমি আছি।

১০০% ব্লকের একটি পুরোপুরি রিভার্স হয়ে গেছে

মুহ: শাহ আলম
অবসরপ্রাপ্ত উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

সরকারি চাকরি শেষ করে অবসর ছুটির মাত্র দুই মাস পরেই আমার হার্ট অ্যাটাক হয় এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হই। দিনটি ছিল ২৫ এপ্রিল ২০১৫। আগের রাতে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ভুরিভোজ হয়েছিল বেশ ভালোভাবেই। এনজিওগ্রাম রিপোর্টে আমার হৃৎপিণ্ডে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৬টি ব্লক পাওয়া গেল, যার মধ্যে দুটি ছিল ১০০%। কার্ডিয়াক সার্জন আমাকে বাইপাসের বিবিধ উপকারিতা বর্ণনা করে শীঘ্রই অপারেশন করার পরামর্শ দেন। আমি রোগের ভয়াবহতা বুঝতে পেরে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি। তবে কোয়ান্টামের সাথে ছিলাম বলে কখনো হতাশায় ভেঙে পড়ি নি। আগে বাইপাস করিয়েছেন পরিচিত এমন অনেকে এবং কর্মস্থলের চিকিৎসকবৃন্দসহ পরিবারের সকলের জোরালো পরামর্শ—'জীবন একটাই। তাই অতিদ্রুত বাইপাস করে জীবনকে নিরাপদ করুন'।

কিন্তু আমি বাইপাস করালাম না। কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের দুই দিনের ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিয়ে জীবনাচার বদলের সংগ্রাম শুরু করি। নিয়মিত মেডিটেশন, ব্যায়াম, প্রাণায়াম ও তেলছাড়া ভেগান ডায়েট। কয়েক মাসেই আমার ওজন ৮০ কেজি থেকে ৬২ কেজিতে নেমে এলো। ডায়াবেটিস, প্রেসার ও গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাচ্ছি না গত চার বছর ধরে। আগে হাঁটতে কষ্ট হতো, এখন দৌড়াতে পারি। ২০২০ সালের অক্টোবরে সর্বশেষ সিটি এনজিওগ্রাম রিপোর্টে দেখা গেছে, ৬টি ব্লকের ৩টিই পুরোপুরি রিভার্স হয়ে গেছে, এর মধ্যে একটি ছিল ১০০%। আমি আশাবাদী যে, বাকিগুলোও ধীরে ধীরে চলে যাবে। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

নাচতে নাচতে পাহাড়ে উঠতে পারি

কামাল আহমেদ
ব্যবসায়ী, ঢাকা

ব্যবসা-সংক্রান্ত অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং শারীরিক পরিশ্রমের কারণে ২০১৪ সালে একদিন আমার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হয়। আমার বন্ধু তখন আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, এনজিওগ্রাম করতে হবে। এনজিওগ্রাম রিপোর্টে আমার হার্টে তিনটি ব্লক (১০০%, ৯৫% ও ৬০%) ধরা পড়ল। ডাক্তার বললেন, অবশ্যই রিং পরাতে হবে। আমি রাজি হলাম না। ভাবছিলাম কী করব।

আমার পরিবারের সদস্যরা বলল, রিং পরিয়ে ফেলতে। আমি সময় নিলাম। আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেখা করলাম, যাদের হৃদরোগ আছে। একজন বলল, তার বাইপাস সার্জারি হয়েছে, তবুও অনেক ওষুধ খেতে হয়। সারাজীবন ওষুধ খেতে হবে। আরেকজন বলল, তার হার্টে রিং পরানো হয়েছে, তবুও তাকে ওষুধ খেতে হয়। সবসময় খেতে হবে। আমি তখন নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, তাহলে অপারেশন করে বা রিং পরিয়ে লাভ কী?

আমার আরেক বন্ধু এবং তার মেয়েরা কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য। তাদের পরামর্শে আমি কোয়ান্টাম হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিলাম। এরপর থেকে হার্ট ক্লাবের নিয়মকানুন মেনে চলছি গত তিন বছর ধরে। আগে অনেক ওষুধ খেতে হতো, এখন মাত্র দুয়েকটা ওষুধ খেতে হয়। সত্যি কথা হলো, মাঝে মাঝে ওষুধ খেতেই ভুলে যাই। এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রহমতে আমি কত ভালো আছি!

আমি মনে করি, আমার হার্টে রিং পরানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বান্দরবানের লামা বেড়াতে গিয়ে নাচতে নাচতে পাহাড়ে উঠেছি, বুকে কোনো ব্যথা হয় নি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ও কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব আমার জীবন বদলে দিয়েছে। তাই আমি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এখন আমি অনেক প্রাণবন্ত

ডা. তালাত মাহমুদ
দন্ত চিকিৎসক, ঢাকা

২০০৫ সালে করোনারি এনজিওগ্রাম করার পর আমার হার্টে ব্লক ধরা পড়ে। মানুষ হিসেবে আমি অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। তাই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলাম। অতিরিক্ত এ মানসিক চাপেই আমার হার্টে ব্লক হয়।

২৫ আগস্ট ২০০৫ সালে ভারতের বিখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জন ডা. দেবী শেঠি আমার বাইপাস সার্জারি করেন। অপারেশনের পরও সবসময়ই বিষণ্নতা, টেনশন এবং উত্তেজিত অবস্থায় থাকতাম। কোনো কাজ করতে ভালো লাগত না।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। এরপর কোয়ান্টাম হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিয়ে সেই আলোকে আমার জীবনাচার পুরোপুরি বদলে ফেলি।

২০১৫ সালে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের অনুপ্রেরণায় আমি পুনরায় করোনারি এনজিওগ্রাম করি। সম্মানিত কার্ডিওলজিস্ট কম্পিউটার স্ক্রিনে আমার এনজিওগ্রাম স্ট্যাটাস দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। তিনি আমাকে বলেন যে, ১০ বছর আগে বাইপাস করা ধমনী ও শিরাগুলো এখনো একশ ভাগ সতেজ-সজীব-প্রাণবন্ত আছে! দেখে মনে হচ্ছে যেন দুই-তিন দিন আগে সার্জারি করে এগুলো জোড়া লাগানো হয়েছে। জোড়া লাগানো প্রত্যেকটি ধমনী ও শিরা সম্পূর্ণ পরিষ্কার, কোনো ব্লকেজ নেই।

আজ ১৫ বছর পরও অনুভব করি, আমি অনেক প্রাণবন্ত! মহান আল্লাহর নিকট আমি গভীরভাবে শুকরিয়া জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এবং কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবকে।

বাইপাস সার্জারি না করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি

আবু নাসের মো. আনিসুর রহমান
সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সাকোহালী দাখিল মাদ্রাসা, কাহালু, বগুড়া

হৃদরোগের উপসর্গ দেখা দেয়ার পর আমি প্রথমে ঢাকার একটি হাসপাতালে এনজিওগ্রাম করাই। এনজিওগ্রাম রিপোর্টে আমার হার্টে চারটি ব্লক (৯০%, ৮০%, ৭৫% এবং ৬০%) ধরা পড়ে। সেখানকার ডাক্তার আমাকে জরুরি ভিত্তিতে বাইপাস সার্জারি করতে বলেন। আমি রাজি হই নি। তারপর ভারতে গেলাম। ডা. দেবী শেঠি আবার আমার এনজিওগ্রাম করলেন। রিপোর্ট দেখে তিনি বাইপাস সার্জারি করার কথা বললেন। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। দেশে ফিরে এলাম।

ভারত থেকে ফিরে এসে বগুড়ায় অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করলাম। একদিন একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট আমাকে একটি বই পড়তে দিলেন। বইটি ছিল 'এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ'। বইটি পড়ে আমি নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হলাম। তারপর বগুড়া থেকে কক্সবাজারে গিয়ে কোয়ান্টাম হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিলাম।

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের নিয়মকানুনগুলো প্রায় দেড় বছর পুরোপুরি মেনে চলার চেষ্টা করলাম। তেল ছাড়া খাবার খেতে শুরু করলাম। এর মধ্যে কোয়ান্টামের একজন কার্ডিওলজিস্টকে দেখালাম। তিনি আমাকে মাত্র তিনটি ওষুধ খেতে দিলেন। আল্লাহর রহমতে আমি সবদিক থেকেই ভালো অনুভব করছি। গত দুবছর ধরে আমি ব্যালেন্সড ডায়েট খাচ্ছি। নিয়মিত মেডিটেশন, ব্যায়াম এবং দমচর্চা করার চেষ্টা করছি।

আমার হার্টে আর কোনো ধরনের সমস্যা অনুভূত হয় না। আমি আমার চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিবার ও সমাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমি এখন অনেক প্রাণবন্ত, হাসিখুশি জীবন কাটাচ্ছি।

প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা বাঁচাতে পারছি

মো. জয়নাল আবেদীন
ব্যবসায়ী, চট্টগ্রাম

২০১৭-র নভেম্বরে হঠাৎ আমার হার্ট অ্যাটাক হয়। ২/৩ মাস পর আবার একই সমস্যা। কলকাতায় গিয়ে এনজিওগ্রাম করাই। তিনটি ব্লক ধরা পড়ে। একটা ১০০%, একটি ৭৫%, একটি ৬৫%। ডাক্তার বললেন, দ্রুত রিং পরাতে হবে। শুনে খুবই নার্ভাস হয়ে যাই। সাথে পর্যাপ্ত টাকাপয়সা ছিল না। তাই দেশে চলে আসি। দেশের ডাক্তার নিয়মিত ওষুধ খেতে বললেন এবং সাবধানে চলাফেরা করতে বললেন। বুকের ব্যথা কিছুটা কমলেও পরবর্তী সময়ে মানসিক দুশ্চিন্তা ও আর্থিক সংকটের কারণে দিন দিন শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকল। মনে প্রচণ্ড ভয় ঢুকে গেল—আমি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচব না।

এ অবস্থায় পরিচিতজনের পরামর্শে ২০১৮ সালে কোয়ান্টাম হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করি। এরপর হার্ট ক্লাবের নির্দেশনা অনুযায়ী চলতে থাকি। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম, প্রাণায়াম ও মেডিটেশনের মাধ্যমে দুই-তিন মাসের মধ্যে আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করতে থাকি। পরের মাসেই চার দিনের কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। ধীরে ধীরে কোয়ান্টামের প্রতি আমার আস্থা বাড়তে থাকে।

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের নির্দেশনা মতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিমিত খাবার খেয়ে এবং কোয়ান্টাম জীবনাচার অনুসরণ করে ধাপে ধাপে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ছেড়ে দিয়ে এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। প্রতি মাসে ডাক্তারের ফিস, ওষুধ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ বাবদ আমি এখন ১০ হাজার টাকা বাঁচাতে পারছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

ওষুধ ছাড়াই ডায়াবেটিস তাদের নিয়ন্ত্রণে

দেড় বছর ধরে ডায়াবেটিসের কোনো ওষুধ খাচ্ছি না

আব্দুর রাজ্জাক
অবসরপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবনা

পেশাগত বিভিন্ন টেনশনে ১৯৯৯ সালে আমার ডায়াবেটিস দেখা দিল। ডাক্তার বললেন, ডায়াবেটিসের ওষুধ আজীবন আমাকে খেয়ে যেতে হবে।

২০১৫ সালে কোয়ান্টাম হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করলাম। এরপর হার্ট ক্লাব নির্দেশিত খাদ্যাভ্যাস মানতে শুরু করলাম। আমি তেল ও চর্বি জাতীয় খাবার পুরোপুরি বর্জন করলাম। নিয়মশৃঙ্খলা পুরোপুরি মেনে চলার চেষ্টা করলাম। আমি তেল ছাড়া রান্না এবং সকালে ও রাতে দুবেলা লাল আটার রুটি খেতাম। সবজি এমনকি ডিম ভাজিও খেতাম তেল ছাড়া।

২০১৫ সালে অনেক বেশি সুস্থ বোধ করছিলাম। তারপর চিন্তা করলাম—আচ্ছা দেখি, ওষুধ ছাড়া ভালো থাকা যায় কিনা, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে কিনা। তাই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করলাম।

আগে ওষুধ না খেলে খালি পেটে আমার ডায়াবেটিস ১৪ থাকত আর ওষুধ খেলে ১০ থাকত। কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের নিয়মকানুন অনুসরণ করে দেখলাম, ডায়াবেটিসের ওষুধ বন্ধ করে এখন খালি পেটে আমার ডায়াবেটিস ৭-এর ভেতরেই থাকে, ৭-এর ওপরে উঠছে না। দেড় বছর ধরে ডায়াবেটিসের কোনো ওষুধ আমি খাচ্ছি না।

ওষুধ ছাড়াই ডায়াবেটিস পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে

মো. জালাল উদ্দিন খান
নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং
ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ

২০০০ সালে আমার হার্টের অসুখ ধরা পড়ে। ডাক্তার বাইপাস করাতে বললেন। এসময় ১২৮ তম কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। পরবর্তী ৬ মাস ওষুধ, মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম জীবনাচার অনুসরণ করে সুস্থ হয়ে উঠলাম। এরপর দীর্ঘ ১৯ বছর ৮ মাস এত ভালো ছিলাম যে, ডাক্তারের কাছে যেতে হয় নি।

এরপর আস্তে আস্তে কোয়ান্টামের নিয়ম থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম। অনেক রাত পর্যন্ত জাগতাম। জর্দা-পান ও প্রচুর মিষ্টি খেতাম। খাবারে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ২০১৯ সালের ২২ আগস্ট অফিসে কাজ করার সময় আমার হার্ট অ্যাটাক হলো।

এনজিওগ্রাম রিপোর্টে মেইন আর্টারিতে একটি ৯৯% ব্লক ধরা পরে। হার্টের পাম্পিং ছিল মাত্র ৩৭%। ডাক্তারের পরামর্শ সত্ত্বেও হার্টে রিং না পরিয়ে ফিরে এলাম। আবার আমার ডায়াবেটিসও ধরা পড়ল। ব্লাড সুগার ২৫। আমাকে ইনসুলিন দেয়া হলো। নিয়মিত দুই বেলা ইনসুলিন নিতে হতো এবং হার্টের অসুখের জন্যে কয়েক ধরনের ওষুধ খেতাম।

এরপর আমি কোয়ান্টাম হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিলাম। নিয়মিত হাঁটা, কোয়ান্টাম ইয়োগা, মেডিটেশন এবং ভেগান ডায়েট অনুসরণ করতে শুরু করলাম। সাথে তেল ছাড়া খাবার। দুই মাস পর ইনসুলিনের পরিবর্তে ট্যাবলেটে চলে এলাম। আরো একমাস পর ওষুধ ছাড়াই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে এলো। নির্দেশনা অনুসরণ করে গত প্রায় দেড় বছর ধরে কোনো ওষুধ ছাড়াই আমার ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। হার্টের পাম্পিং বেড়ে ৪৫% হয়েছে, বুকে কোনো ব্যথা অনুভব করি না। আমি এখন আধাঘণ্টা দৌড়াতে পারি। ১০ তলা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারি। ২২ কেজি কমে আমার ওজন এখন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহর রহমতে বেশ ভালো আছি।

ডায়াবেটিস এখন পুরোটাই নিয়ন্ত্রণে

দেলোয়ারা খানম
গৃহিণী, ঢাকা

আমি দীর্ঘ ২২ বছর ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছিলাম। যখন আমার ব্লাড সুগার অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যেত, তখন হাই ডোজে ইনসুলিন নিতে হতো, ওষুধ তো আছেই। কোনোভাবেই যখন আর আমার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আসছিল না, তখন আমি কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব নির্দেশিত ভেগান ডায়েট অনুসরণ করতে শুরু করলাম।

আমি গত তিন বছর ধরে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব নির্দেশিত ভেগান ডায়েট পুরোপুরি অনুসরণ করেছি। যার ফলে আমাকে আর ইনসুলিন নিতে হয় নি, ইনসুলিন পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পেরেছি। এখন শুধু ইনসুলিন না, সব ধরনের ডায়াবেটিসের ওষুধ আমি একদম বন্ধ করে দিয়েছি।

গত তিন বছর ধরে ভেগান ডায়েট অনুসরণ করেই আমার সুগার নরমাল থাকছে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো—সেই ছোটবেলা থেকে আমার অ্যাজমার সমস্যা ছিল। কিন্তু ভেগান ডায়েট অনুসরণ করার পর থেকে দেখছি যে, আমার অ্যাজমার সমস্যাও ভালো হয়ে গেছে।

শ্বাসকষ্টের জন্যে আমি এখন কোনো ওষুধ খাচ্ছি না, এমনকি কোনো ধরনের ইনহেলারও নিচ্ছি না! বর্তমানে আমি ভেগান ডায়েটের বদলে কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস (ব্যালান্সড ডায়েট) অনুসরণ করছি। নিয়মিত মেডিটেশন, কোয়ান্টাম ইয়োগা এবং দমচর্চা করছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমি বেশ ভালো আছি।

উচ্চ রক্তচাপ মুক্ত হলেন তারা

ওষুধ ছাড়াই উচ্চ রক্তচাপ এখন নিয়ন্ত্রণে

মো. আলমগীর হোসেন
ব্যবসায়ী, ঢাকা

আমার উচ্চ রক্তচাপ ছিল। নিয়মিত হাঁটা ব্যায়াম দৌড়ানো—এসব করে যাচ্ছিলাম। তখনো ওষুধ খাওয়া শুরু করি নি। মাছ-মাংস ভাজাপোড়া সবই খেতাম। এত ব্যায়াম করার পরও প্রেসার কমত না। অস্থিরতা টেনশন লেগেই থাকত। কার্ডিওলজিস্টকে দেখালে তিনি ওষুধ খেতে দিলেন।

ওষুধ অনেকদিন খেলাম। তারপরও ভালো বোধ করতাম না। হার্টবিট বেড়ে যেত। ঘুম হতো না। আবার ডাক্তার দেখাই। তিনি ঘুমের ওষুধ দিলেন। সেটাও চলল অনেকদিন। এবার আগের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে ব্যায়াম ও সাঁতার শুরু করলাম। তবে খাওয়াদাওয়া আগের মতোই চলত। কিছুতেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছিল না।

২০১৩ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি। ২০১৬ সালে কোয়ান্টাম হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিই। নির্দেশনা অনুযায়ী ভেজিটেরিয়ান ডায়েট মেনে চলি দুই বছর। কিছুটা ভালোলাগা শুরু হলে আগের মতো রিচ ফুড খেতে শুরু করি। তিন মাস পর প্রেসার আবার বেড়ে গেল। মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যেতাম। শেষবার অজ্ঞান হওয়ার পর আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রেসার পাওয়া গেল ১৬০/১১০।

এবার হার্ট ক্লাবের পরামর্শমতো সিরিয়াসলি ভেগান ডায়েট অনুসরণ করি। একদিনের জন্যেও অন্য খাবার খাই নি। ধীরে ধীরে ভালোলাগা শুরু হলো। আট মাসের মতো ভেগান ডায়েট চলল। এখন কোয়ান্টাম নির্দেশিত নরমাল ডায়েট অনুসরণ করছি। কোনো ওষুধ খাচ্ছি না। ওষুধ ছাড়াই কতটা ভালো আছি তা বলে বোঝাতে পারব না।

পাঁচ বছর ধরে আমার ব্লাড প্রেসার সবসময় ১২০/৮০-র মধ্যে থাকে

মো. গিয়াস উদ্দিন
ব্যবসায়ী, ঢাকা

২০০৮ সালে এনজিওগ্রামে আমার হার্টে ৩টি ব্লক ধরা পড়ে। ডাক্তার বললেন—লাইফ রিস্ক আছে, জরুরি ভিত্তিতে দুটি আর্টারিতে রিং বসাতে হবে। তখন আমার আর্থিক সামর্থ্য ছিল না এবং রিং পরাতেও চাচ্ছিলাম না। নিয়মিত ওষুধ সেবন করে যাচ্ছিলাম।

২০১১ সালে কোয়ান্টাম হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিই। এরপর থেকেই হার্ট ক্লাবের সকল নিয়মকানুন মেনে চলছি। মাছ-মাংস, চর্বি ও তেল জাতীয় খাবার পুরোপুরি বর্জন করি। প্রথম তিন-চার বছর আমি পুরোপুরি তেল ছাড়া রান্না করা খাবার খেয়েছি।

৬ মাস পরই আমার রক্তচাপ কমে গেল। ডাক্তার উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ বন্ধ করে দিলেন। তারপর থেকে আমি উচ্চ রক্তচাপের কোনো ওষুধ খাই নি। ৫ বছর ধরে আমার ব্লাড প্রেসার সবসময় ১২০/৮০-র মধ্যে থাকে। এ-ছাড়া প্রতিদিন ঘণ্টায় চার মাইল বেগে আধাঘণ্টা হাঁটতাম। নিয়মিত কোয়ান্টাম ইয়োগা এবং মেডিটেশন করতাম। হার্ট ক্লাবের সাপ্তাহিক গ্রুপ কাউন্সেলিং সেশনে অংশ নিতাম এবং চেক-আপে যেতাম।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! গত ৮ বছর ধরে আমার ইসিজি, ইকো, লিপিড প্রোফাইলসহ অন্যান্য রিপোর্ট স্বাভাবিক আছে। আমার হার্টের কোনো সমস্যাই এখন আর নেই। আমি এখন কোনো ওষুধও খাই না।

২০০৮ সালের এনজিওগ্রাম রিপোর্টে আমার তিনটি ব্লক ছিল (৭৫%, ৪০% এবং ২০%)। ২০১৫ সালে আমার চেক এনজিওগ্রামে দেখা গেল, আমার দুটি ব্লক পুরোপুরি রিভার্স হয়ে গেছে, কোনো ব্লক নেই! আর যেটাতে ৭৫% ব্লক ছিল সেটা ৫০% হয়ে গেছে। কোয়ান্টাম জীবনাচার অনুসরণ করে গত ৮-৯ বছর ধরে আমি অনেক ভালো আছি।

কাঙ্ক্ষিত ওজন অর্জন করলেন তারা

ওজন কমিয়ে আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ

মো. দেলোয়ার হোসেন
মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ, স্কিল ডট কম, ঢাকা

আমার ওজন ছিল ১২০ কেজি। একসময় ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ও ডায়াবেটিস ধরা পড়ল। একটু পরিশ্রম করলেই হাঁপিয়ে উঠতাম। দিন দিন ওজন বেড়ে যাচ্ছিল। ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে লাগলাম। আমি যে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে নানা ধরনের ওষুধ দিলেন, খরচ হতো প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা। ওষুধগুলো নাকি চলতেই থাকবে। একপর্যায়ে ভাবলাম এভাবে জীবন চলতে পারে না।

এক বন্ধুর উৎসাহে কোয়ান্টাম কোর্স করি। জানতে পারি কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কথা। তারপর ২০১৯ সালে হার্ট ক্লাবের ১২৭ তম ব্যাচে অংশগ্রহণ করি। বনশ্রী সেন্টারে যখন আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি তখন দেখি বড় করে লেখা—*মানুষ যা ভাবতে পারে, যা বিশ্বাস করতে পারে, তা সে অর্জন করতে পারে*। কথাটি আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তখন থেকে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে, এখান থেকে আমি সুখী জীবনের পথ খুঁজে পাব।

হার্ট ক্লাবের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত ইয়োগা, দ্রুত হাঁটা, মেডিটেশন, ভেগান ডায়েট মেনে চলতে শুরু করি। সপ্তাহে দুই দিন রোজা রাখি। ফলে আমার ওজন দ্রুত কমতে শুরু করে। মাত্র তিন মাসে ওজন ১২০ কেজি থেকে ৭৫ কেজিতে নেমে আসে। আজ ১০ মাস যাবৎ আমার ওজন ৭৫ কেজি ধরে রেখেছি। এই তিন মাস শুধু ভেগান ডায়েট অনুসরণ করেছি।

এখন আমি কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করি। এখন আমার জীবনে না আছে ডায়াবেটিস, না আছে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, না আছে অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠা। আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ।

ওজন কমেছে, অন্যান্য সমস্যাও দূর হয়েছে

সালাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
ব্যবসায়ী, ঢাকা

অনেকদিন থেকেই আমার ওজন অনেক বেশি, উচ্চতা অনুসারে অস্বাভাবিক বলা চলে। বিদেশে থাকাকালীন ওজন বাড়তে শুরু করে। কেননা যা পেতাম তা-ই খেতাম, শুধু স্বাদ লাগলেই হলো। আর সকালে বা বিকেলে পার্কে হেঁটে একটি-দুটি চক্কর মারতাম।

ভাবতাম, হাঁটলেই বুঝি ওজন কমে যাবে। কিছুই হতো না, পায়ে ব্যথা ছাড়া। এর কারণ ছিল ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি, ভুল খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব। আমার উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, ওজন ৯৫ কেজির আশেপাশেই থাকে, কমে না।

টোটকা, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি—কিছুই বাদ দেই নি। যে যা বলেছে তা-ই নিজের ওপর প্রয়োগ করেছি। একবার ফ্যাট বার্নিং ট্যাবলেট খেয়ে মরে যাই যাই অবস্থা হয়ে গিয়েছিল!

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কথা জানা ছিল, কিন্তু যাওয়া হয় নি। ভাবছিলাম, এত চেষ্টা ব্যর্থ হলো, সেখানে আর কী পাব? এটাই বুঝি আমার নিয়তি। অবশেষে একজনের পরামর্শে হার্ট ক্লাবের ১২১ তম ব্যাচে অংশগ্রহণ করি। এখন আমার ওজন ৭৫ কেজির আশেপাশে থাকছে।

শুধু ওজনই কমে নি, শারীরিক-মানসিকভাবেও আমি এখন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত। বুক ভরে দম নিতে পারছি, পেট ফোলা, গ্যাস্ট্রিকসহ নানান উপসর্গ থেকেও মুক্তি পেয়েছি।

গ্রুপ সাপোর্ট ও কাউন্সেলিং ॥ আপনি একা নন

অটুট থাকুক পারিবারিক সম্প্রীতি	।	২৮১
সঙ্ঘবদ্ধ পথচলা ॥ সুস্বাস্থ্যের জন্যেই প্রয়োজন	।	২৮২
কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব ॥ একা নয়, একসাথে	।	২৮৩
কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব ॥ যাত্রা শুরু	।	২৮৪
হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশন	।	২৮৫
সাপ্তাহিক ফলো-আপ ও কাউন্সেলিং সেশন	।	২৮৬
হৃদরোগ নিরাময়ে বিশেষ মেডিটেশন	।	২৮৭

রাতারাতি পাওয়ার আশা না করে
যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন।
তাহলেই আপনি সফল হবেন।

গ্রুপ সাপোর্ট ও কাউন্সেলিং ॥
আপনি একা নন

আমাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি সংবেদনশীল মন। আছে সুখ দুঃখ কষ্ট আনন্দ বেদনার মতো বিচিত্র আবেগ। এই আবেগ-অনুভূতি আমরা যে কেবল নিজের মধ্যে চেপে রাখি, তা নয়। ভাইবোন বন্ধু সহপাঠী প্রিয়জনকে বলি। ভাব-বিনিময় করি। এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু সবাই কি সবসময় এটা পারেন? যিনি পারেন না, তিনি দিনের পর দিন বয়ে বেড়ান সে কষ্ট। গবেষণায় দেখা গেছে, মনের কোণে জমে থাকা দীর্ঘদিনের কষ্ট, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর নেতিবাচক আবেগ থেকে সৃষ্টি হতে পারে হরেক রকম জটিল রোগব্যাধি, এমনকি তা রূপ নিতে পারে ক্যান্সারে। কারণ ধ্বংসাত্মক আবেগ মানুষের শরীর-মনকে বেশ ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করে। ক্রমাগত এ অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একসময় সে হয়ে পড়ে ক্লান্ত ও উদ্যমহীন। অসুস্থ হতে শুরু করে নানাভাবে। আর এর সবচেয়ে বড় শিকার হয় আমাদের নিঃস্বার্থ ও পরম বন্ধু—হৃৎপিণ্ড।

অটুট থাকুক পারিবারিক সম্প্রীতি

আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, প্রাচ্যে এখনো পরিবার-প্রথা টিকে আছে। আমাদের যে-কোনো সমস্যায় প্রথমেই সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে কাছে এসে দাঁড়ায় পরিবারের সদস্যরা। এর পাশাপাশি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে আছে আমাদের একটি বৃহত্তর পরিবার। আর পারিবারিক ও বাস্তব সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে (ফেসবুক-ইন্টারনেটের 'সামাজিক যোগাযোগ' নয়) যে মানুষ যত সঙ্ঘবদ্ধ, তার দুঃখ কষ্ট হতাশার পরিমাণ তত কম। তিনি চাপ বোধ করেন কম। তাই পারিবারিক সম্প্রীতি ও একাত্মতা গড়ে তুলুন। পরিবারের সদস্যরাই যেন হয়ে ওঠে আপনার সকল অনুপ্রেরণা ও আনন্দের উৎস।

একটি আনন্দময় পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে মনোযোগী হোন। টেনশন উদ্রেককারী টিভি সিরিয়াল, টক শো, কম্পিউটার-ইন্টারনেটের সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়ার চেয়ে পরিবারকে মনোযোগী সময় দেয়া ঢের গুরুত্বপূর্ণ।

একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, দীর্ঘক্ষণ টেলিভিশনের সামনে বসে থাকেন কিংবা রাত জেগে টিভি দেখেন যারা, তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক বেশি। তাই বাসায় যতক্ষণই থাকুন, পুরোটা সময় মনোযোগ দিন আপনার পরিবারের সদস্যদের প্রতি। আপনি সবদিক থেকে ভালো থাকবেন।

সঙ্ঘবদ্ধ পথচলা ॥ সুস্বাস্থ্যের জন্যেই প্রয়োজন

একসাথে মিলেমিশে চলেন বা কাজ করেন যারা, পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে তারা হয়ে ওঠেন একে অন্যের শক্তি। প্রত্যেকে হয়ে ওঠেন প্রত্যেকের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগী ও আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী। জীবনযাপনের বেলায়ও একথা সত্যি। সঙ্ঘবদ্ধ অনুসরণের ফলে সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস আয়ত্ত করা যায় অনেক সহজে।

ডা. ডিন অরনিশ পরিচালিত হৃদরোগ নিরাময় কার্যক্রমে হৃদরোগীরা প্রতি সপ্তাহে গ্রুপ সাপোর্ট ও কাউন্সেলিং সেশনে মিলিত হতেন। সেখানে তারা অনুভূতি-অভিজ্ঞতা বিনিময় করতেন। দেখা যেত একজন হয়তো এমন একটি সমস্যায় ভুগছিলেন, যা তিনি কাউকে বলতে পারছিলেন না, কাউন্সেলিং সেশনে তিনি তার সতীর্থ ও কাউন্সিলরদের সাথে বিষয়টি নিয়ে নিঃসংকোচে আলাপ করতেন। সবাই সেখানে একে অন্যের আবেগ-অনুভূতি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দেয়ার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই কাউন্সেলিং সেশনটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সবাই মিলে এমনই উপভোগ করতে শুরু করলেন যে, জড়তার দেয়াল ভেঙে তারা একে অন্যের সাথে মিশে গেলেন। ফলে জীবনের অনেক চাপা কষ্টের কথা তারা সেখানে বলতে পারছিলেন এবং কখনো কখনো কেঁদেকেটে বুকটাকে হালকা করে তারা বাড়ি ফিরতেন। শুধু তা-ই নয়, তাদের মধ্যে যারা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও নতুন জীবনধারার সাথে খাপ খাওয়াতে

পারছিলেন না, তারাও একসময় সুস্থ জীবনাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। সবকিছুই শুরু করলেন নতুনভাবে।

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব ॥
একা নয়, একসাথে

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব এমন একটি প্ল্যাটফর্ম—যেখানে একা নয়, রয়েছে সুস্থতার পথে একসাথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ। এখানে সাপ্তাহিক কাউন্সেলিং সেশনে এসে হৃদরোগীরা খোলামেলা আলোচনায় তাদের সমস্যা তুলে ধরেন এবং নিজেদের সমস্যামুক্তি ও সম্ভাবনার পথ খুঁজে পান।

এ কার্যক্রমের মূল প্রাণ এ ক্লাবের সদস্যরা। এতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে সুস্থ জীবন-অভ্যাস চর্চা করা তাদের জন্যে হয়ে ওঠে অনেক সহজ। একজন হয়তো কোনো কারণে একটি বিষয় অনুসরণ করতে পারছিলেন না; দেখা গেল, সেটাই তিনি এখানে এসে আত্মস্থ করতে পারেন সুন্দরভাবে। অনুপ্রাণিত হন ইতিবাচক জীবনদৃষ্টিতে। সুস্থ জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন।

সঙ্ঘবদ্ধ পথচলা আর পারস্পরিক পরামর্শ এবং সহযোগিতা মানুষকে পৌঁছে দেয় তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। তাই আপনিও অংশ নিন এ অনন্য কার্যক্রমে। পরিবার বা পরিচিত পরিমণ্ডলে কোনো হৃদরোগী থাকলে বা হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে চান যারা, তাদেরও উৎসাহিত করুন এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে। তাতে সবাই মিলে একসাথে এগিয়ে যাওয়া হবে অনেক সহজ এবং ফলপ্রসূ।

সৎসঙ্ঘ সবসময় আপনার আত্মবিশ্বাসে সহায়ক।
সৎসঙ্ঘ এক আত্মিক বন্ধন যা সীমাহীন প্রশান্তি
ও পরিতৃপ্তি প্রদান করে।
সৎসঙ্ঘ সবসময় প্রেরণার উৎসে
রূপান্তরিত হয়।

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবে আসুন

সঠিক জীবনদৃষ্টি, মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার হৃদরোগ নিরাময় করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এ আধুনিক ধারণাকে গত প্রায় তিন দশক ধরে দেশে জনপ্রিয় করে তুলেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। আর এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হাজারো মানুষ পেয়েছেন স্বস্তি ও মুক্তি। হৃদরোগ প্রতিরোধে উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন দেশের সচেতন মানুষ।

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব ॥ যাত্রা শুরু

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে সবাইকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে আরো সুপরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে কাজ শুরু করেছে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব। এপ্রিল ২০১০-এ কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর মহাসচিব জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিক। জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ডা. মো. নজরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক বলেন, বাংলাদেশে এখন বিশ্বমানের হৃদরোগ চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব.) ডা. আব্দুল মালিক

মনে রাখতে হবে, এটাই একমাত্র সমাধান নয়। হৃদরোগ থেকে পরিপূর্ণ নিরাময়ের জন্যে দরকার জীবনধারা পরিবর্তন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, মেডিটেশন বা রিল্যাক্সেশনের মাধ্যমে চাপমুক্ত জীবনযাপন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এসব ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে তুলছে বলে আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।

কোয়ান্টাম হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশন

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের উদ্যোগে মে ২০১০ থেকে পরিচালিত হচ্ছে হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ কার্যক্রম। প্রতি মাসে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুদিনের বিশেষ ওরিয়েন্টেশন। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৩৫টিরও বেশি ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিয়েছেন সাড়ে সাত সহস্রাধিক মানুষ।

হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশনের মডারেটর ডা. মনিরুজ্জামান

ওরিয়েন্টেশনে রয়েছে—

- ☐ করোনারি হৃদরোগের জন্যে দায়ী ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি, ভুল জীবনাচার এবং অবৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
- ☐ হৃদরোগ নিরাময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয় সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা।
- ☐ হৃদরোগের কারণ শনাক্তকরণ ও হৃদরোগ নিরাময়ে বিশেষ মেডিটেশন।
- ☐ কোয়ান্টাম ইয়োগা, প্রাণায়াম এবং ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা।
- ☐ ইতিবাচক জীবনদৃষ্টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা এবং শুকরিয়ার বিশেষ মেডিটেশন।
- ☐ হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, স্থূলতা ও ফ্যাটি লিভার ডিজিজ প্রতিরোধ এবং নিরাময়ে আপনার করণীয়।

ঢাকার আইডিইবি-তে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম হার্ট কেয়ার ওরিয়েন্টেশনের ১০০ তম ব্যাচের অংশগ্রহণকারীরা

সাপ্তাহিক ফলো-আপ ও কাউন্সেলিং সেশন

ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিয়েছেন যারা, সে-সব সদস্যের অংশগ্রহণে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাপ্তাহিক ফলো-আপ ও কাউন্সেলিং সেশন।

এ কার্যক্রমে রয়েছে—

- বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও মেডিটেশন
- বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং এবং চেক-আপ
- কোয়ান্টাম ইয়োগা অনুশীলন
- গ্রুপ কাউন্সেলিং বা পারস্পরিক অভিজ্ঞতা-অনুভূতি বিনিময়

সাপ্তাহিক ফলো-আপ সেশনে অংশ নিয়ে গ্রুপ কাউন্সেলিং-এ মিলিত হন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সদস্যরা

বিশেষ কার্যক্রম ॥

বৈজ্ঞানিক সেমিনার ও দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব-এর উদ্যোগে ১৯ অক্টোবর, ২০১২ অনুষ্ঠিত হয় একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার ও দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ। 'হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে চাই সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবনাচার' শীর্ষক এ সেমিনারে আলোচনা করেন দেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞবৃন্দ। কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সদস্যসহ এতে অংশ নেন প্রায় দুই সহস্রাধিক মানুষ।

১৯ অক্টোবর ২০১২ কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব আয়োজিত 'হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে বৈজ্ঞানিক সেমিনার'-এ আলোচকবৃন্দ। (বাঁ থেকে) হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হাসনাইন নান্না, গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক, জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিক, জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান ও মাদাম নাহার আল বোখারী

হৃদরোগ নিরাময়ে বিশেষ মেডিটেশন

২১ জানুয়ারি, ২০১১ জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় হৃদরোগ নিরাময়ের বিশেষ মেডিটেশন সিডির প্রকাশনা অনুষ্ঠান। কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব প্রকাশিত মেডিটেশন সিডির মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলাদেশে ধূমপান বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ ও প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, মেডিটেশন ও জীবনাচার পরিবর্তনের মাধ্যমে হৃদরোগমুক্ত হওয়ার জন্যে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সদস্যদের আমি অভিনন্দন জানাই। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

২১ জানুয়ারি, ২০১১ জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'হৃদরোগ নিরাময়ে বিশেষ মেডিটেশন' সিডির মোড়ক উন্মোচন করেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম ও প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে পাঁচটি বিশেষ মেডিটেশন

গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের কণ্ঠে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয়েছে হৃদরোগ নিরাময়ের পাঁচটি বিশেষ মেডিটেশন, যা করোনারি হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে।

সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবন-অভ্যাস অনুসরণের পাশাপাশি এ মেডিটেশনগুলোর নিয়মিত চর্চা আপনার হৃৎপিণ্ডের ব্লকেজ দূর করতে সাহায্য করবে। গবেষণায় দেখা গেছে, মেডিটেশনকালে সুস্থ হৃৎপিণ্ডের কল্পনা হৃৎপিণ্ডকে প্রাণবন্ত করার সাথে সাথে রক্তের অতিরিক্ত কোলেস্টেরলকেও স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে।

হৃদয়ের কথা বলি হৃদয়ে

এ মেডিটেশনে জীবনে প্রথমবারের মতো নিজের হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযোগ স্থাপন করবেন আপনি। গভীর আত্মনিমগ্নতায় কথা বলবেন আপনার হৃৎপিণ্ডের সাথে। একে একে উন্মোচিত হবে আপনার হৃদরোগের কারণগুলো। ফলে এসব ভুল জীবন-অভ্যাস শুধরে নিতে পারবেন সহজেই।

আত্মপর্যালোচনা

ক্রমাগত আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে সুস্থ হৃৎপিণ্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় জীবন-অভ্যাসগুলো অনুসরণ করা আপনার জন্যে অনেক সহজ হয়ে উঠবে। প্রতিদিন একটু একটু করে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যাবেন আপনি।

হৃদরোগ নিরাময়

নিয়মিত নিরাময়ের কল্পচিত্র বা মনছবি দেখে গত তিন দশকে অসংখ্য মানুষ পেয়েছেন হৃদরোগ থেকে মুক্তি। হৃদরোগ নিরাময়ের একটি পরীক্ষিত ও কার্যকর মনছবি হিসেবে এটি ইতোমধ্যেই প্রমাণিত। এ মেডিটেশনের মাধ্যমে মনের অফুরন্ত শক্তিভাণ্ডারকে ব্যবহার করে আপনিও এগিয়ে যাবেন সুস্থতার পথে।

শুকরিয়া

নিয়মিত এ মেডিটেশন আপনার শুকরিয়ার অনুভূতি বাড়িয়ে দেবে। গভীর আত্মনিমগ্নতায় আপনি লাভ করবেন শুকরিয়ার নতুন উপলব্ধি। হয়ে উঠবেন প্রশান্ত পরিতৃপ্ত এক সুখী মানুষ। এগিয়ে যাবেন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন ও কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে।

দীর্ঘজীবন

আমরা সকলেই দীর্ঘজীবী হতে চাই, কিন্তু জানি না কীভাবে দীর্ঘজীবনের অধিকারী হবো। বিজ্ঞানের সর্বশেষ গবেষণা আর সাধকদের সাধনালব্ধ জ্ঞানের আলোকে এই মেডিটেশনে দীর্ঘজীবনের রহস্যকে তুলে ধরা হয়েছে। নিয়মিত এই মেডিটেশন চর্চা আপনাকে সুস্থ ও কর্মব্যস্ত দীর্ঘজীবনের পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করবে।

হৃদবান্ধব খাদ্যতালিকা ও সুস্বাদু রেসিপি

মেন্যু

সকালের নাশতা	।	২৯২
দুপুরের খাবার	।	২৯৩
রাতের খাবার	।	২৯৪

রেসিপি

নাশতার কয়েকটি রেসিপি	।	২৯৬
শরবত/ জুস/ ড্রিংকস	।	৩০০
স্যুপ	।	৩০৪
সালাদ	।	৩০৯
শাকসবজি	।	৩১৩
ভাত/ খিচুড়ি	।	৩২১
ডাল	।	৩২৪
ভর্তা	।	৩২৬
চাটনি	।	৩২৭
ডেজার্ট	।	৩৩১

প্রার্থনা খাবারের তৃপ্তি বাড়ায়। তাই খাওয়ার আগে প্রার্থনা করুন। আর খাওয়া শেষ হলে বলুন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ/ থ্যাংকস গড/ হরি ওম/ প্রভু ধন্যবাদ, বেশ তৃপ্তির সাথে খেয়েছি।

হৃদবান্ধব খাদ্যতালিকা ও
সুস্বাদু রেসিপি

সকালের নাশতা, দুপুরের কিংবা রাতের খাবার—যেটাই হোক, অধিকাংশ মানুষই প্রত্যাশা করেন তার জন্যে ডাইনিং টেবিলে সাজানো থাকবে মাছ-মাংস-ডিম-দুধ। সাথে অন্যান্য খাবার। মাছ-মাংস ছাড়া যে দুপুর বা রাতের খাবার হতে পারে এটা অনেকে বিশ্বাসই করতে পারেন না। আর বর্তমান সময়ে শিশু-কিশোরদের অবস্থা তো আরো শোচনীয়। অনেকে তো মুরগির মাংস ছাড়া খেতেই পারে না। মুরগি তার চাই-ই চাই। সাথে সফট ড্রিংকস। শাকসবজি তার কাছে কোনো খাবারই নয়।

অথচ মাছ-মাংস-ডিম-দুধ ছাড়াও যে খাওয়া যায়, শুধু খাওয়া নয়—সুস্থও থাকা যায়, বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার ভেগান ও ভেজিটেরিয়ানরাই তার বাস্তব উদাহরণ। শুধু আমেরিকা-ইউরোপেই নয়, হার্ট ক্লাবের অনেক সদস্য আছেন যারা এখন পুরোপুরি ভেগান। মাছ-মাংস-ডিম-দুধ তো খানই না, এমনকি একফোঁটা তেলও খান না। দুই বছরের লক্ষ্য নিয়ে তারা শুরু করেছেন এই নতুন পথচলা। প্রায় প্রতিমাসেই কয়েকজন করে যোগ হচ্ছেন তাদের দলে। তাদের লক্ষ্য একটাই—এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় করতে চান, অথবা স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস নিরাময় করে ওষুধ ছাড়াই সুস্থ থাকতে চান।

তাদের এই পথচলাকে মসৃণ ও সহজতর করার জন্যে ভেগান ডায়েটের কিছু মেন্যু ও শতাধিক রেসিপি এখানে দেয়া হলো। আপনার প্রতিদিনের পরিচিত রেসিপির পাশাপাশি দেশি-বিদেশি অনেক বৈচিত্র্যময় এসব রেসিপি আপনার খাবারের একঘেঁয়েমি দূর করবে, রুচির পরিবর্তন ঘটাবে এবং আপনাকে সার্বিকভাবে পুষ্টি দেবে।

আজন্মলালিত কোনো অভ্যাস হঠাৎ করে বদলে ফেলা সবসময়ই কঠিন

কিন্তু অসম্ভব নয়। হাজার মাইলের পথচলার শুরু হয় কিন্তু একটি ছোট পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই। আপনিও শুরু করুন। ধীরে ধীরে আপনার কাছে এই সকল খাবারই সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় মনে হবে। তবে এর জন্যে আপনার লাগতে পারে সর্বনিম্ন তিন সপ্তাহ থেকে সর্বোচ্চ তিন মাস। এরপর হয়তো আপনিই বলবেন, এরকম সুস্বাদু খাবার আপনি ইতঃপূর্বে খান নি।

সকালের নাশতার মেন্যু

মেন্যু-১	পৃষ্ঠা
লাল আটার রুটি	২৯৬
ডাল-মটরশুঁটি চাট	৩১৩
তাজা সালাদ	৩০৯
করলার জুস	৩০৪
মেন্যু-২	
সবজি খিচুড়ি	৩২২
টোফু-মাশরুম কারি	৩১৮
আদা-কলার লাচ্ছি	৩০২
মিষ্টি আলুর সালাদ	৩১১
মেন্যু-৩	
ফলের রসে লাল আটার রুটি	২৯৭
খেজুরের হালুয়া	৩৩১
পালং-কলা স্মুদি	৩০২
ফুলকপি-মটরশুঁটি ভুনা	৩১৯
মেন্যু-৪	
গ্রানোলা বরফি	২৯৬
বাঁধাকপি-শিমের সবজি	৩১৩
রাশিয়ান সালাদ	৩০৯
টমেটো-গাজর স্যুপ	৩০৪
মেন্যু-৫	
কাউন চালের নাশতা	২৯৭
পাঁচমিশালি তরকারি	৩১৬
বেগুনের ঝাল মসলার চাটনি	৩২৭
ফারমেন্টেড বিট-আদার জুস	৩০১

মেন্যু-৬

নরম গরম খিচুড়ি (তরল খিচুড়ি)	৩২১
বর্ষার মিক্সড সবজি	৩১৪
রসুনের চাটনি	৩২৭
পালং-সবুজ আপেল স্মুদি	৩০৩

মেন্যু-৭

মটরশুঁটি-বাসমতির ভাত	৩২৩
আপেল-নাশপাতি স্মুদি	৩০৩
মিক্সড সবজি-ডাল	৩২৪
লাউয়ের খোসার ভর্তা	৩২৬

দুপুরের খাবারের মেন্যু

মেন্যু-১

লাল চালের ভাত	—
তাজা সালাদ	৩০৯
কচুর ঘণ্ট	৩১৫
ভাপানো শাকপাতার ভর্তা	৩২৬
শিমের বিচির কাবাব	৩২৫

মেন্যু-২

পাঁচমিশালি খিচুড়ি	৩২২
রাশিয়ান সালাদ	৩০৯
পালং-মুলার তরকারি	৩১৪
কালোজিরার ভর্তা	৩২৬
সজনে পাতার মালাইকারি	৩১৫

মেন্যু-৩

সবজি খিচুড়ি	৩২২
গ্রিন পাপায়া সালাদ	৩০৯
কচুর ঘণ্ট	৩১৫
তিলের ভর্তা	৩২৭

মেন্যু-৪

লাল চালের ভাত ও সবজি মিক্স	৩২৩
মিষ্টি আলুর সালাদ	৩১১
লাউয়ের খোসার ভর্তা	৩২৬
মাশরুম কারি	৩১৭

মেন্যু-৫

নরম গরম খিচুড়ি (তরল খিচুড়ি)	৩২১
ক্যাপসিকাম-লেটুস-শসার সালাদ	৩১০
মসলা ঢেঁড়স	৩১৭
পুদিনার চাটনি	৩২৯

মেন্যু-৬

লাল চালের ভাত	—
শীতের মিক্সড সবজি-১	৩১৬
ভুট্টা-শিমের বিচি-টমেটো সালাদ	৩১১
পালং-মুগ ডাল	৩২৫

মেন্যু-৭

লাল চালের ভাত	—
কোরিয়ান মেরিনেটেড ক্যাবেজ সালাদ	৩১২
টমেটো-ঢেঁড়স ভুনা	৩১৯
সুইট এন্ড সাওয়ার ভেজিটেবল	৩২০
পালং-মুগ ডাল	৩২৫

রাতের খাবারের মেন্যু

মেন্যু-১

গাজর-বিট ডিলাইট	৩১১
লাল আটার রুটি	২৯৬
সুইট ডিলাইট	৩৩১
ইন্দোনেশিয়ান মিক্সড ভেজিটেবল স্যুপ	৩০৫

মেন্যু-২

গ্রিন পাপায়া সালাদ	৩০৯
পুরভরা ক্যাপসিকাম	৩১৫
গ্রানোলা বরফি	২৯৬
মাশরুম-টমেটো স্যুপ	৩০৫

মেন্যু-৩

লাল আটার রুটি	২৯৬
কোরিয়ান মেরিনেটেড ক্যাবেজ সালাদ	৩১২
বাঁধাকপি-শিমের সবজি	৩১৩
পালং-টমেটোর স্যুপ	৩০৬

মেন্যু-৪

লাল চালের ভাত	—
শীতের মিক্সড সবজি-২	৩১৬
আনারস-পেঁপের স্মুদি	৩০১
ডিনার সালাদ	৩১০

মেন্যু-৫

ব্রাউন পাউরুটি	—
টমেটো-গাজর স্যুপ	৩০৪
টোফু-মাশরুম কারি	৩১৮
গাজরের কেক	৩৩২

মেন্যু-৬

লাল আটার রুটি	২৯৬
কমলার রসে ব্রকোলি	৩১২
টমেটো-ঢেঁড়স ভুনা	৩১৯
খেজুরের হালুয়া	৩৩১

মেন্যু-৭

লাল আটার রুটি	২৯৬
ব্রকোলি-সয়া স্যুপ	৩০৭
ডিনার সালাদ	৩১০
পুরভরা টমেটো	৩১৭

নাশতার কয়েকটি রেসিপি

লাল আটার রুটি

গমের লাল আটা	*২ কাপ*	*লবণ*	*১/৪ চা চামচ*
পানি/ সয়াদুধ	*১১/২ কাপ*		

প্রণালি : একটি পাত্রে পানি/ সয়াদুধ ও লবণ দিয়ে গরম করে চুলা বন্ধ করে দিন। এবার ২ কাপ আটা অল্প অল্প করে মিশিয়ে আটার কাই তৈরি করুন (পানি গরম করে নিলে রুটি অনেকক্ষণ নরম থাকবে)। এবার তৈরি করা কাই দিয়ে পছন্দমতো আকারের রুটি বেলে নিন। চুলায় তাওয়া গরম করে রুটি সেঁকে নিন। সবজি/ তরকারি/ ডাল/ হালুয়া দিয়ে পরিবেশন করুন।

রেইনবো ব্রেকফাস্ট

আপেল	*১টি*	*কাজুবাদাম (কুচি)*	*৪টি*
পাকা কলা	*১টি*	*আখরোট/ পেস্তাবাদাম গুঁড়ো*	*১টি*
পাকা পেঁপে/ বাঙ্গি (ছোট টুকরো)	*১ কাপ*	*কিশমিশ*	*৫টি*
আঙুর	*১০টি*	*মালটা/ কমলার রস*	*১ কাপ*

প্রণালি : ফলগুলো খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। একটি বড় বাটিতে সবগুলো ফলের টুকরো মিশিয়ে নিন। এবার এর মধ্যে ১ কাপ মাল্টা/ কমলার রস মেশান। কাজুবাদাম, আখরোট/ পেস্তাবাদাম গুঁড়ো এবং কিশমিশ ওপরে ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করুন। [**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা বাদাম বাদ দিয়ে তৈরি করবেন]

গ্রানোলা বরফি

ওটস	*২ কাপ*	*জয়ফল গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
লাল আটা	*১/২ কাপ*	*খেজুর কুচি*	*১/৪ কাপ*
সয়াদুধ	*১/২ কাপ*	*কিশমিশ কুচি*	*১/৪ কাপ*
মধু	*১ চা চামচ*	*তেল*	*১ চা চামচ*
দারুচিনি গুঁড়ো	*১ চা চামচ*		
আপেল/ যে-কোনো ফলের রস	*১/৪ কাপ*		

প্রণালি : খেজুর ও কিশমিশ বাদে বাকি সব উপকরণ একটি বাটিতে নিয়ে আপেল বা ফলের রসের সাথে ভালো করে মেশান। এবার চুলায় একটি কড়াইতে তেল দিয়ে গরম করুন এবং মেশানো সব উপকরণ দিয়ে অল্প আঁচে নেড়ে নেড়ে বাদামি রং করে ভাজুন। যখন গ্রানোলা পুরো বাদামি রং ধারণ করবে, তখন চুলা থেকে নামিয়ে খেজুর ও কিশমিশ মেশান। একটি সমতল পাত্রের ওপর তৈরি উপকরণটি ঢেলে চেপে চেপে সমান করুন। এরপর ঠান্ডা হলে পছন্দমতো আকৃতিতে কেটে একটি এয়ার টাইট বক্সে ভরে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করুন।

কাউন চালের নাশতা

আপেলের রস	*১/২ কাপ*	*কাউন চাল*	*১ কাপ*
পানি	*১১/২ কাপ*	*লবণ*	*স্বাদমতো*
দারুচিনি গুঁড়ো	*১/২ চা চামচ*	*আলুবোখারা ও কিশমিশ*	*১/২ কাপ*
ওটস	*১ কাপ*		

প্রণালি : কাউন চাল ধুয়ে নিন। একটি পাত্রে আপেলের রস, দারুচিনি, পানি এবং লবণ নিয়ে ফোটান। চুলার আঁচ কমিয়ে ওটস এবং কাউন চাল দিন। ১৫ মিনিট রান্না করুন। পানি শুকিয়ে গেলে আলুবোখারা ও কিশমিশ দিয়ে নেড়ে নিন। একটি প্লেটে ঢেলে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ফলের রসে লাল আটার রুটি

শুকনো ইস্ট	*২ টেবিল চামচ*	*লাল আটা (গম)*	*১১/২ কাপ*
পানি	*১/২ কাপ*	*লবণ*	*২ চা চামচ*
লাল চালের আটা	*২ কাপ*	*অ্যাপল সাইডার ভিনেগার*	*২ কাপ*

প্রণালি : একটি বড় বাটিতে শুকনো ইস্ট ১/২ কাপ হালকা গরম পানি দিয়ে গুলে নিন। এবার এর সাথে অ্যাপল সাইডার ভিনেগার দিয়ে ফেটে নিন। আরেকটি বাটিতে শুকনো উপকরণ, অর্থাৎ চালের আটা, গমের লাল আটা এবং লবণ মিশিয়ে নিন। এবার ফেটে রাখা উপকরণে শুকনো উপকরণের মিশ্রণ অল্প অল্প করে মিশিয়ে হাত দিয়ে কাই তৈরি করুন। আটার কাই একটু নরম হবে। এবার এমন একটি পাত্রে কাই রাখুন যেন ফুলে তিন গুণ বড় হওয়ার মতো জায়গা থাকে। এরপর সেটি রেফ্রিজারেটরে সারারাত রেখে দিন। সকালে রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে সাধারণ তাপমাত্রায় ৩-৪ ঘণ্টা রাখুন। কাই চেপে চেপে সব বাতাস বের করে নিন। এবার ছোট ছোট কাই নিয়ে রুটি তৈরি করে তাওয়ায় সেঁকে নিন।

নাশতায় ফল ও বাদামের দুধ

আপেল	*১টি*	*কাজুবাদাম/ যে-কোনো বাদাম*	*৫টি*
পাকা কলা	*১টি*	*কিশমিশ*	*১০টি*
পছন্দমতো অন্য যে-কোনো ফল	*১টি*	*কাজুবাদামের দুধ*	*১-২ কাপ*
বেদানা/ ডালিম	*১/২ কাপ*		

প্রণালি : ফলগুলো খোসা ছাড়িয়ে ছোট টুকরো করে কেটে নিন। একটি বড় বাটির মধ্যে সবগুলো ফল, বাদাম ও কিশমিশ মিশিয়ে নিন। এরপর তার মধ্যে এক কাপ কাজুবাদামের দুধ ঢেলে দিন।

(বাদামের দুধ বানাতে দুই ঘণ্টা আগে এক কাপ কাজুবাদাম পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর বেটে নিন অথবা ব্লেন্ড করে নিন। ৩-৪ কাপ পানি মেশান)

[**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা বাদামের পরিবর্তে সয়াদুধ ব্যবহার করবেন]

কলা ও বাদাম দুধে ঝটপট নাশতা

পাকা কলা	*২টি*	*তিসি*	*১ চা চামচ*
তিল	*১ চা চামচ*	*যে-কোনো বাদামের দুধ*	*১ কাপ*
ভাজা চীনাবাদাম গুঁড়ো	*৪ চা চামচ*	*কিশমিশ*	*১০টি*

প্রণালি : কলা খোসা ছাড়িয়ে ছোট টুকরো করে কেটে নিন। একটি বড় বাটিতে বাদামের দুধ ঢেলে তার মধ্যে কলার টুকরো মেশান। তারপর তিল, তিসি এবং বাদামের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এর ওপরে কিশমিশ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

[**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা বাদামের পরিবর্তে সয়াদুধ ব্যবহার করবেন]

আপেলের রসে যবের পায়েস

যব/ লাল চাল	*১ কাপ*	*দারুচিনি গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
পানি	*১১/২ কাপ*	*জয়ফল গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
আপেলের রস	*১১/২ কাপ*	*লেবুর রস*	*১ টেবিল চামচ*
আপেল কুচি	*১/২ কাপ*	*লবণ*	*স্বাদমতো*
কিশমিশ	*১/৪ কাপ*		

প্রণালি : যব/ লাল চাল হালকা গরম পানিতে ভিজিয়ে পানি ঝরিয়ে একটি পাত্রে নিন। এবার আপেলের রস, আপেল কুচি, কিশমিশ, পানি ও লবণ দিয়ে চুলায় বসান। ফুটে উঠলে এতে যব/ লাল আটা দিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে ১০ মিনিট রান্না করুন। একটু পর পর নাড়া দিন যেন পাত্রের তলায় লেগে না যায়। এরপর চুলা থেকে নামিয়ে দারুচিনি জয়ফল গুঁড়ো, লেবুর রস মিশিয়ে ৪৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। প্লেটে বেড়ে পরিবেশন করুন।

ফলের রসে যবের ছাতু

যবের ছাতু	*১/৩ কাপ*	*লাল আটা*	*১ টেবিল চামচ*
লবণ	*১/৮ চা চামচ*	*আপেল/ যে-কোনো ফলের কুচি*	*১/২ টি*
পানি	*৩/৪ কাপ*	*তিসি গুঁড়ো*	*১১/২ চা চামচ*

প্রণালি : একটি বাটিতে যবের ছাতু লবণ এবং পানি মিশিয়ে সারারাত রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। সকালে ফ্রিজ থেকে বের করুন। আপেল খোসা ফেলে কুচি করে নিন অথবা অন্য

যে-কোনো মিষ্টি ফল কেটে কুচি করে নিন। এবার যবের মিশ্রণের সাথে ফলের কুচি মিশিয়ে চুলায় বসান। কিছুক্ষণ নেড়ে চুলার আঁচ কমিয়ে ঢেকে ১৫ মিনিট সেদ্ধ করুন। মাঝে মাঝে নেড়ে দিন। পানি শুকিয়ে ঘন হয়ে এলে তিসির গুঁড়ো মিশিয়ে প্লেটে নিয়ে পরিবেশন করুন। এই খাবারটি আপনি সয়াদুধ এবং সামান্য মধু বা গুড় দিয়ে খেতে পারেন।

ওটস ও ফলের নাশতা

ওটস	*১১/২ কাপ*	*লবণ*	*১/৪ চা চামচ*
পানি	*১১/২ কাপ*	*আপেল (মাঝারি)*	*২টি*
কিশমিশ/ শুকনো ফল	*২ টেবিল চামচ*	*লেবুর রস*	*৩ টেবিল চামচ*

প্রণালি : একটি বাটিতে ওটস এবং পানি মিশিয়ে আগের রাতেই রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। সকালে রেফ্রিজারেটর থেকে বের করুন। মাঝারি আকৃতির দুটি আপেল খোসাসহ গ্রেট করে নিন। এবার একটি বড় বাটিতে কিশমিশ লবণ আপেল লেবুর রস এবং আগের রাতের ভেজানো ওটস মিশিয়ে নিন। স্বাদ বাড়াতে সয়াদুধ, গুড় বা মধু এবং তাজা ফল দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

ওটস চাপটি

মটর	*১/২ কাপ*	*তিসি গুঁড়ো*	*৩/৪ টেবিল চামচ*
পানি	*২১/৪ কাপ*	*বেকিং পাউডার*	*১ টেবিল চামচ*
ওটস/ লাল চালের গুঁড়ো	*১৩/৪ কাপ*	*ভ্যানিলা এসেন্স*	*১১/২ চা চামচ*
মধু	*১ টেবিল চামচ*	*লবণ*	*১ চা চামচ*

প্রণালি : একটি বড় বাটিতে আগের রাতেই মটর ভিজিয়ে রাখুন। সকালে মটরের পানি ঝরিয়ে একটি ব্লেন্ডারে সব উপকরণ একসাথে ব্লেন্ড করে মসৃণ মিশ্রণ তৈরি করুন। মিশ্রণ বেশি ঘন হলে পানি মিশিয়ে একটু পাতলা করে নিন। এবার চুলায় তাওয়া গরম করুন। ১/৩ কাপ মিশ্রণ গরম তাওয়ায় ৪ ইঞ্চি চওড়া করে ছড়িয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। কয়েক মিনিট পর উল্টে অপর পিঠ সেঁকে নামিয়ে নিন। এভাবে বাকি মিশ্রণ দিয়ে আরো কয়েকটি ওটস চাপটি তৈরি করে নিন। ওটস চাপটি দেখতে বাদামি রঙের এবং মচমচে হবে। এটি আপনি গরম গরম পরিবেশন করতে পারেন ঝাল চাটনি অথবা সবজি দিয়ে।

পালং পাস্তা

সবজি স্টক (পৃ. ৩০৪)	*৫ কাপ*	*পাস্তা/ স্প্যাগিটি/ নুডল্‌স*	*২ কাপ*
মসুর ডাল	*১ কাপ*	*ধনেপাতা কুচি*	*১/৪ কাপ*
পেঁয়াজ কুচি (মাঝারি)	*২টি*	*লেবুর রস*	*২ টেবিল চামচ*
রসুন কুচি	*২ কোয়া*	*লবণ*	*স্বাদমতো*
জিরা গুঁড়ো	*১ চা চামচ*	*শুকনো মরিচ গুঁড়ো*	*১/৪ চা চামচ*
পালং শাক কুচি	*২ কাপ*	*গোলমরিচ গুঁড়ো*	*স্বাদমতো*

প্রণালি : ডাল ধুয়ে একটি হাঁড়িতে নিন। সবজি স্টক নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচ কমিয়ে ২৫ মিনিট সেদ্ধ করুন। লক্ষ রাখুন যেন ডালের দানা নরম হয় কিন্তু গলে না যায়। আরেকটি হাঁড়িতে পেঁয়াজ রসুন জিরা নিয়ে অল্প পানি দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার সেদ্ধ করা ডাল এই হাঁড়িতে ঢেলে দিন। এর সাথে পালং শাক, পাস্তা, ধনেপাতা, শুকনো মরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে দিন। পানি শুকিয়ে মাখা মাখা হয়ে এলে লেবুর রস দিয়ে নেড়ে ভালো করে মেশান। সবশেষে লবণ এবং গোলমরিচ গুঁড়ো ওপরে ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মিক্সড ডালে পাস্তা

পাস্তা	*৪ কাপ*	*মিক্সড ডাল*	*২ কাপ*
টমেটো সস/ মেরিনারা সস	*৩ কাপ*	*সবজি স্টক (পৃ. ৩০৪)*	*১ কাপ*
লবণ	*স্বাদমতো*	*পানি*	*৮ কাপ*
গোলমরিচ গুঁড়ো	*স্বাদমতো*		

প্রণালি : প্রথমে একটি হাঁড়িতে ৮ কাপ পানি গরম করে নিন। এবার পাস্তা দিয়ে ৭-৮ মিনিট সেদ্ধ করুন (লক্ষ রাখতে হবে যেন পাস্তা বেশি নরম হয়ে আঠালো হয়ে না যায়)। পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর টমেটো সস, মিক্সড ডাল, সবজি স্টক একটি কড়াইতে মিশিয়ে গরম করে নিন। এর সাথে সেদ্ধ করা পাস্তা মিশিয়ে নিন। সবশেষে লবণ এবং গোলমরিচ গুঁড়ো ওপরে ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

হার্বাল চা

দারুচিনি গুঁড়ো	*১/৩ টেবিল চামচ*	*মধু*	*১ চা চামচ*
লবঙ্গ	*৩টি*	*পানি*	*২১/২ কাপ*
গোলমরিচ	*২০টি*	*কাগজি লেবু*	*১ টুকরো*
ছোট এলাচ	*৪টি*	*আদা*	*১ ইঞ্চি সমান*

প্রণালি : প্রথমে দারুচিনি গুঁড়ো গোলমরিচ আদা (কুচি করা) ছোট এলাচ ও লবঙ্গ একসাথে আড়াই কাপ পানিতে মিশিয়ে চুলায় দিন। ফুটানোর পর পানির পরিমাণ কমে এক কাপ

পরিমাণ হলে ১ চা চামচ মধু ভালোভাবে নেড়ে মেশান। এবার একটুকরো লেবু চিপে দিন। তৈরি হয়ে গেল হার্বাল চা। আপনার পছন্দ অনুযায়ী কাপে বা মগে পরিবেশন করুন।
[**বি. দ্র.** চাইলে আপনি গ্রিন টি যোগ করতে পারেন]

আনারস-পেঁপের স্মুদি

আনারস	*১ কাপ*	*নারিকেলের দুধ*	*১ কাপ*
পাকা পেঁপে	*১ কাপ*	*মধু*	*৩ চা চামচ*

প্রণালি : আনারস ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে নিন। পেঁপে খোসা ছাড়িয়ে ভেতরের বিচি ফেলে টুকরো করে নিন। এবার নারিকেলের দুধ, আনারস, পেঁপে ও মধু দিয়ে খুব মসৃণ করে ব্লেন্ড করুন। একটি গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন।
[যদি গরম খেতে চান তাহলে নারিকেলের দুধ গরম করে নিন]

ফারমেন্টেড বিট-আদার জুস

বিট কুচি	*৪ কাপ*	*লবণ*	*৪ টেবিল চামচ*
ফুটানো পানি	*১৬ কাপ*	*আদা কুচি*	*১/৪ কাপ*

প্রণালি : একটি প্রশস্ত মুখের বোতল বা বয়াম নিন। তাতে বিট কুচি লবণ ও আদা কুচি দিন। এবার ফুটানো পানি বোতলে এমনভাবে ঢালুন যেন ওপরে এক ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁকা থাকে। ভালোভাবে নেড়ে উপকরণগুলো মিশিয়ে দিন এবং বোতলের মুখ শক্ত করে বন্ধ করে দিন। ৩ দিন অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা বোতলটি ২২° সে. তাপমাত্রায় রাখুন। প্রতিদিন একবার বোতলের ঢাকনা খুলে ওপরের ফেনা ফেলে দিন। ৩ দিন পর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। এই জুস রেফ্রিজারেটরে এক সপ্তাহ সংরক্ষণ করতে পারবেন। (ফারমেন্টেড বিট-আদার জুস এক ধরনের ওষুধি পানীয় যা রক্ত পরিষ্কারক, লিভার ভালো রাখে, হজম ক্ষমতা বাড়ায়। তাই ১০০-১৫০ মি.লি. পানীয় প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় পান করতে পারেন।)

নন-ডেইরি লাচ্ছি

কাঠবাদাম/ কাজুবাদামের পাতলা দুধ	*১ কাপ*	*লেবুর রস*	*স্বাদমতো*
পুদিনা পাতা কুচি	*২-৩টি*	*লবণ (ঐচ্ছিক)*	*পরিমাণমতো*
জিরা গুঁড়ো	*১/২ চা চামচ*		

প্রণালি : এক কাপ বাদামের দুধে সব উপকরণ মিশিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। এরপর গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন। [**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা বাদামের দুধের পরিবর্তে সয়াদুধ ব্যবহার করুন]

কাঠবাদামের দুধ

কাঠবাদাম	*১ কাপ*	*পানি*	*৪ কাপ*

প্রণালি : কাঠবাদাম ২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। আবরণসহ বাদাম ২ কাপ পানি দিয়ে ব্লেন্ড করুন (খেজুর দিতে চাইলে একইসাথে ব্লেন্ড করে নিন)। এমনভাবে ব্লেন্ড করতে হবে যেন দেখতে মনে হয় ক্রিম। এবার আরো দুই কাপ পানি মিশিয়ে ব্লেন্ড করুন। (এরপর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে পারেন। তবে ছেঁকে নেয়া উপকরণ ফেলে দেবেন না। সেটাও খেতে পারেন)। রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। এই দুধ আপনি ২-৩ দিন ফ্রিজে রেখে খেতে পারবেন। (আপনার পছন্দমতো মধু/ দারুচিনি গুঁড়ো/ জাফরান/ এলাচও দিতে পারেন।) ব্লেন্ডার না থাকলে পাটায় পিষেও তৈরি করতে পারেন কাঠবাদামের দুধ। কাঠবাদামের পরিবর্তে অন্য বাদাম দিয়েও এ দুধ তৈরি করতে পারেন। [**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা খাবেন না]

চীনাবাদামের মাখন

চীনাবাদাম (ভাজা)/ কাজুবাদাম	*১ কাপ*	*খেজুর*	*২টি*
পানি	*১/৪ কাপ*	*দারুচিনি গুঁড়ো*	*স্বাদমতো*
মধু	*৩/৪ কাপ*	*লবণ*	*স্বাদমতো*

প্রণালি : ব্লেন্ডারে ভাজা বাদাম নিয়ে পানি দিয়ে ২ মিনিট ব্লেন্ড করুন। থেমে থেমে ব্লেন্ড করতে হবে। এমনভাবে ব্লেন্ড করুন যেন পুরো মিশ্রণটি খুব মসৃণ হয়। দেখতে মাখনের মতো নরম মনে হয়। এবার এর সাথে মধু, খেজুর, দারুচিনি এবং লবণ দিয়ে আরো কিছুক্ষণ ব্লেন্ড করুন। ব্যস তৈরি হয়ে গেল চীনাবাদামের ক্রিম বা মাখন। এটি আপনি ৩-৪ দিন রেফ্রিজারেটরে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন। [**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা খাবেন না]

আদা-কলার লাচ্ছি

পাকা কলা কুচি	*১টি*	*মধু*	*১ চা চামচ*
বাদামের দুধ (যে-কোনো)	*১ কাপ*	*আদা কুচি*	*১/২ চা চামচ*

প্রণালি : খোসা ফেলে কলা কুচি করে নিন। এবার কলা, বাদামের দুধ, মধু, আদা কুচি একসাথে নিয়ে ব্লেন্ড করুন। তৈরি হয়ে গেল আদা-কলার লাচ্ছি।
[**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা বাদামের দুধের পরিবর্তে সয়াদুধ ব্যবহার করুন]

পালং-কলা স্মুদি

পাকা কলা	*২টি*	*লেবুর রস*	*১/২ চা চামচ*
পালং শাক	*১ কাপ*	*পানি*	*১ কাপ*
মধু	*১ চা চামচ*		

প্রণালি : কলা খোসা ফেলে কুচি করে কেটে নিন। পালং শাক ধুয়ে ডাটা ফেলে শুধু পাতা নিন। এবার কলা কুচি, পালং পাতা, মধু, পানি এবং লেবুর রস দিয়ে ব্লেন্ড করুন। আমের মৌসুম হলে এই স্মুদির সাথে আমও দিতে পারেন, তাহলে খেতে আরো সুস্বাদু হবে।

পালং-সবুজ আপেল স্মুদি

আপেল কুচি (সবুজ)	*১টি*	*পানি*	*১/২ কাপ*
পালং শাক	*১/২ কাপ*	*গোলমরিচ গুঁড়ো*	*১/৪ চা চামচ*
আদা কুচি	*১/২ চা চামচ*	*বিট লবণ/ লবণ*	*স্বাদমতো*

প্রণালি : আপেল খোসা ছাড়িয়ে কুচি করে কেটে নিন। আপেল কুচি, পালং শাক, আদা কুচি গোলমরিচ গুঁড়ো এবং বিট লবণ একসাথে নিয়ে ব্লেন্ড করুন। পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে মসৃণ করুন। এবার স্মুদি পরিবেশন করুন।

আপেল-নাশপাতি স্মুদি

আপেল	*১টি*	*কাঠবাদাম*	*৪-৫টি*
নাশপাতি	*১টি*	*কাঠবাদামের দুধ*	*১-২ কাপ*

প্রণালি : আপেল ও নাশপাতি ধুয়ে টুকরো করে নিন। সবগুলো উপকরণ ব্লেন্ডারে নিয়ে মসৃণ করে ব্লেন্ড করুন (শীতকালে কাঠবাদামের দুধ গরম করে দিতে পারেন)। গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন। [**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা বাদামের পরিবর্তে সয়াদুধ দিতে পারেন]

মাল্টা-ক্যাপসিকাম জুস

ক্যাপসিকাম (লাল)	*১টি*	*নারিকেলের দুধ*	*১ টেবিল চামচ*
মাল্টা/ কমলা	*১টি*	*লবণ (ঐচ্ছিক)*	*১ চিমটি*

প্রণালি : ক্যাপসিকামের ভেতরের শাঁস ফেলে কুচি করে কেটে নিন। মাল্টা/ কমলা খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার ক্যাপসিকাম, মাল্টা/ কমলা ও নারিকেলের দুধ ব্লেন্ডারে নিয়ে ব্লেন্ড করে জুস পরিবেশন করুন। চাইলে অল্প পরিমাণ লবণ দিতে পারেন।

স্ট্রবেরি/ চেরি-তিসির স্মুদি

সয়াদুধ	*১ কাপ*	*পাকা কলা কুচি*	*১টি*
ডালিমের রস	*১/২ কাপ*	*তিসি গুঁড়ো*	*১ টেবিল চামচ*
স্ট্রবেরি/ চেরি	*১/২ কাপ*		

প্রণালি : সবগুলো উপকরণ একটি ব্লেন্ডারে নিয়ে মসৃণ করে ব্লেন্ড করুন। যদি মিশ্রণটি খুব বেশি ঘন হয়ে যায়, তাহলে একটু পানি মেশাতে পারেন। গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন।

করলার জুস

করলা	*১ কাপ*	*মধু (ঐচ্ছিক)*	*২ চা চামচ*

প্রণালি : করলা ধুয়ে মাঝখান দিয়ে দুই ফালি করে বিচি ফেলে কুচি করে কেটে খুব মসৃণ করে ব্লেন্ড করুন। ব্লেন্ড করা করলার রস ছেঁকে নিতে পারেন। এবার একটি গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন। স্বাদ বাড়াতে মধু মিশিয়ে নিতে পারেন।

টোফু-আনারস স্মুদি

টোফু (পৃ. ৩০৭)	*১ কাপ*	*ভ্যানিলা এসেন্স*	*৩/৪ চা চামচ (স্বাদমতো)*
মধু	*১ টেবিল চামচ*	*আনারসের টুকরো*	*১১/২ কাপ*
লেবুর রস	*৪ চা চামচ*	*নারিকেলের কুচি*	*১/২ চা চামচ*

প্রণালি : ব্লেন্ডারে সব উপকরণ নিয়ে মসৃণ করে ব্লেন্ড করুন। গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন।

স্যুপ

সবজি স্টক

পেঁয়াজ (টুকরো)	*২ কাপ*	*পুদিনা পাতা কুচি*	*১ টেবিল চামচ*
গাজর (টুকরো)	*২টি*	*গোলমরিচ গুঁড়ো*	*১১/২ চা চামচ*
ধনেপাতা কুচি	*১ কাপ*	*তেজপাতা*	*১টি*
রসুন কুচি	*২ টেবিল চামচ*	*লবঙ্গ*	*৪টি*
আদা কুচি	*১ টেবিল চামচ*	*পানি*	*১২ গ্লাস*

প্রণালি : একটি বড় হাঁড়িতে সবগুলো উপকরণ নিয়ে ফুটান। পানি ফুটে উঠলে আঁচ কমিয়ে দিয়ে ২ ঘণ্টা জ্বাল দিন। ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে পানি আলাদা করুন। ঠান্ডা করে বোতলে ভরে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করুন। সবজি স্টক স্যুপ বা তরকারি রান্নার সময় ব্যবহার করুন। [নিজের পছন্দমতো মৌসুমি সবজি দিয়েও স্টক তৈরি করে রাখতে পারেন]

টমেটো-গাজর স্যুপ

গাজর কুচি	*১০০ গ্রাম*	*টমেটো রস*	*২৫ গ্রাম*
পেঁয়াজ কুচি	*১টি*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*

রসুন কুচি	*১টি*	*তেল*	*১/২ চা চামচ*
টমেটো কুচি	*৪৫০ গ্রাম*	*ধনেপাতা কুচি*	*১ টেবিল চামচ*
সবজি স্টক (পৃ. ৩০৪)	*৬০০ মি. লি.*	*কাঁচামরিচ*	*৩টা*
জাফরান রং	*১/২ চা চামচ*		

প্রণালি : কড়াইতে খুব হালকা আঁচে ১/২ চা চামচ তেল গরম করে গাজর পেঁয়াজ এবং রসুন সামান্য ভেজে নিন। দেখবেন, পেঁয়াজে যেন বাদামি রং না ধরে। এবার টমেটো ও সবজি স্টক কড়াইতে ঢেলে নেড়েচেড়ে পরিমাণমতো লবণ, কাঁচামরিচ ও জাফরান দিন। টমেটোর রস দিয়ে সামান্য নেড়ে ফুটতে দিন। জ্বাল কমিয়ে আধাঘণ্টা রান্না হওয়ার পর নামিয়ে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। ওপরে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

মাশরুম-টমেটো স্যুপ

পেঁয়াজ কুচি	*১ কাপ*	*পানি*	*১/২ কাপ*
রসুন	*৫ কোয়া*	*কাঁচামরিচ*	*২টি*
তুলসীপাতা কুচি	*১ কাপ*	*পালং শাক*	*১/২ কাপ*
মাশরুম কুচি	*১১/২ কাপ*	*ভুট্টা*	*১/২ কাপ*
টমেটো কুচি	*২টি*		

প্রণালি : কাঁচামরিচ ভুট্টা এবং পালং শাক বাদে বাকি সব উপকরণ একটি পাত্রে নিয়ে চুলায় বসিয়ে ফুটে উঠলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে ১ ঘণ্টা সেদ্ধ করুন। এরপর ভুট্টা দিয়ে আরো আধাঘণ্টা সেদ্ধ করুন। সবশেষে কাঁচামরিচ ও পালং শাক কুচি মিশিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন। এ স্যুপ ভাত, রুটি বা পাস্তার সাথে খেতে পারেন।

ইন্দোনেশিয়ান মিক্সড ভেজিটেবল স্যুপ

বরবটি	*৯০ গ্রাম*	*আদা ঝুরি*	*১/২ চা চামচ*
বাঁধাকপি	*১০০ গ্রাম*	*সাদা গোলমরিচ*	*১/২ চা চামচ*
টমেটো (বড়)	*১টি*	*তেঁতুল*	*১ চা চামচ*
গাজর (মাঝারি)	*১টি*	*পানি/ সবজি স্টক (পৃ. ৩০৪)*	*৮ কাপ*
টোফু (বিনকর্ড) (পৃ. ৩১৮)	*১ কাপ*	*লবণ*	*২ চা চামচ*
পেঁয়াজ (বড়)	*১টি*	*নুডল্‌স*	*১০০ গ্রাম*
রসুন কুচি	*১ কোয়া*	*পেঁয়াজ (বেরেস্তা)*	*১০০ গ্রাম*
সরিষার তেল	*১ চা চামচ*	*ধনেপাতা কুচি*	*৪ চা চামচ*
তেজপাতা	*১টি*		

প্রণালি : বাঁধাকপি ও বরবটি ধুয়ে ঝুরি করুন। টমেটো ও গাজর স্লাইস করুন। টোফু ১ সে.মি. চৌকো টুকরো করুন। তেলে পেঁয়াজ ও রসুন দিয়ে নাড়ুন। নরম হলে তেজপাতা আদা গোলমরিচ লবণ এবং তেঁতুল দিয়ে ২ মিনিট নাড়ুন। সবজি স্টক বা পানি দিয়ে

ফুটান। মসলা এবং সবজি দিয়ে আরো ১৫ মিনিট ফুটান। নুডল্স দিন। নুডল্স সেদ্ধ হলে নামান। গরম স্যুপে ধনেপাতা ও বেরেস্তা দিয়ে পরিবেশন করুন।

জুকনি/ কুমড়া-পালং স্যুপ

জুকনি/ কুমড়া টুকরো	*৬ কাপ*	*সয়াসস*	*২ টেবিল চামচ*
পেঁয়াজ কুচি	*১ কাপ*	*পালং শাক*	*১ কাপ*
রসুন কুচি	*৩ কোয়া*	*ভুট্টা*	*২ কাপ*
পানি/ সবজি স্টক (পৃ. ৩০৪)	*৩ কাপ*	*কাঁচামরিচ*	*২টি*

প্রণালি : জুকনি ধুয়ে খোসাসহ টুকরো করে কেটে নিন। এবার একটি পাত্রে জুকনি পেঁয়াজ রসুন ও ৩ কাপ পানি দিয়ে চুলায় বসান। পানি ফুটে উঠলে চুলার আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ১০ মিনিট সেদ্ধ করে জুকনি নরম করে নিন। এবার ব্লেন্ডারে সেদ্ধ উপকরণটি নিয়ে ব্লেন্ড করুন। এমনভাবে ব্লেন্ড করুন যেন মসৃণ হয় এবং খুব সুন্দর হালকা সবুজ রং দেখা যায়। এবার কড়াইতে নিয়ে সয়াসস ভুট্টা এবং পালং শাক দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করুন। একটি পাত্রে নিয়ে ওপরে কাঁচামরিচ দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

[**বি. দ্র.** জুকনি হচ্ছে এক ধরনের সবজি যার বাইরের আবরণটি দেখতে কুমড়ার মতো কিন্তু আকৃতি লাউ বা বড় শসার মতো। এর স্বাদ কুমড়ার মতো। এটি আমাদের দেশীয় সবজি নয়, কিন্তু বর্তমানে চাষ হচ্ছে এবং বাজারে লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন]

পালং-টমেটোর স্যুপ

পালং শাক	*১ কাপ*	*কাজুবাদাম*	*৩-৪টি*
জিরা	*১/৪ চা চামচ*	*দারুচিনি গুঁড়ো*	*স্বাদমতো*
পানি	*১১/২ কাপ*	*গোলমরিচের গুঁড়ো*	*স্বাদমতো*
টমেটো কুচি (বড়)	*১টি*	*লেবুর রস*	*স্বাদমতো*
রসুন	*২-৪ কোয়া*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
কাজুবাদামের মাখন (ঐচ্ছিক)	*১ চা চামচ (পৃ. ৩০২)*		

প্রণালি : পালং শাক ভালো করে ধুয়ে কুচি করে কেটে নিতে হবে। একটি হাঁড়িতে দেড় কাপ পানি ফুটিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন। এবার হাঁড়িতে পালং শাক টমেটো রসুন এবং কাজুবাদাম দিয়ে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। ১০ মিনিট পর একটি ব্লেন্ডারে নিয়ে মসৃণ করে ব্লেন্ড করুন। ব্লেন্ড করা মিশ্রণটি ছেঁকে নিন (ব্লেন্ডার না থাকলে ডাল ঘুটনি দিয়ে ভালোভাবে ঘুটে ছেঁকে নিতে পারেন)। বাটিতে স্যুপটি ঢেলে লেবুর রস দারুচিনি গোলমরিচ জিরা গুঁড়ো এবং লবণ ভালোভাবে মেশান এবং সবশেষে কাজুবাদামের মাখন স্যুপের ওপরে দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। [**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা বাদাম বাদ দিয়ে তৈরি করবেন]

বিট-পুদিনার স্যুপ

বিট	*৪টি*	*লেবুর খোসা কুচি*	*১টি*
কমলার রস	*১ কাপ*	*পুদিনা পাতা*	*৬টি*
লেবুর রস	*২-৩ টেবিল চামচ*	*শুকনো মরিচ*	*১টি*

প্রণালি : বিট ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে ৪০ মিনিট সেদ্ধ করে কুচি করে কেটে নিন। এরপর ব্লেন্ডারে বিট এবং বাকি উপকরণ নিয়ে ব্লেন্ড করুন। এবার একটি বাটিতে নিয়ে ওপরে পুদিনা পাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ব্রকোলি-সয়া স্যুপ

ব্রকোলি	*১২ কাপ*	*পানি*	*৪ কাপ*
পেঁয়াজ কুচি (বড়)	*২টি*	*সয়াদুধ*	*১ কাপ*
রসুন কুচি	*৪ কোয়া*	*শুকনো মরিচ*	*২টি*

প্রণালি : ব্রকোলি ধুয়ে ২-৩ ইঞ্চি মাপে টুকরো করে কেটে নিন। এবার একটি পাত্রে পেঁয়াজ রসুন ব্রকোলি এবং পানি দিয়ে চুলায় ফুটিয়ে নিন। এরপর আঁচ কমিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে সেদ্ধ করে ব্রকোলি নরম করে নিন। একটি ব্লেন্ডারে সেদ্ধ করা উপকরণটি এমনভাবে ব্লেন্ড করুন যেন মসৃণভাবে সব উপকরণ মিশে যায় এবং দেখতে সবুজ সবুজ লাগে। এবার এর সাথে সয়াদুধ ও শুকনো মরিচ মিশিয়ে পরিবেশন করুন। [যদি আরেকটু পুষ্টি ও স্বাদ বাড়াতে চান, তাহলে পালং শাক এবং ভুট্টা ব্রকোলির সাথে সেদ্ধ করে ব্লেন্ড করে স্যুপ তৈরি করতে পারেন]

মাশরুম-ডাল-আলুর স্যুপ

পেঁয়াজ কলি/ পেঁয়াজ	*১টি*	*ডাল*	*১১/২ কাপ*
রসুন কুচি	*৬ কোয়া*	*মিষ্টি আলু*	*১টি*
মাশরুম	*২ কাপ*	*তেজপাতা*	*১টি*
সবজি স্টক (পৃ. ৩০৪)	*৪ কাপ*	*তাজা তুলসীপাতা*	*১/৪ কাপ*
পানি	*২ কাপ*	*কাঁচামরিচ*	*২টি*

প্রণালি : আলু এবং মাশরুম কেটে টুকরো করে নিন। এবার একটি পাত্রে পেঁয়াজ কলি রসুন মাশরুম ৩-৪ মিনিট অল্প আঁচে ভাজুন। পেঁয়াজ কলি যেন নরম হয়ে যায়। এবার সবজি স্টক পানি ডাল তেজপাতা এবং মিষ্টি আলু ফুটিয়ে আঁচ কমিয়ে দিয়ে ২০-৩০ মিনিট সেদ্ধ করে ঘন করুন। ডাল সেদ্ধ হলে তেজপাতা তুলে ফেলুন। ডাল ঘুটনি দিয়ে ঘুটে নিতে পারেন। এবার একটি বাটিতে স্যুপ নিয়ে তুলসীপাতা এবং কাঁচামরিচ দিয়ে পরিবেশন করুন। এটি আপনি ভাত ও সালাদের সাথে খেতে পারেন।

ফুলকপি-গাজর-বার্লির স্যুপ

যব	*১/২ কাপ (১০০ গ্রাম)*	*আস্ত জিরা*	*১ চা চামচ*
সরিষার তেল	*১ চা চামচ*	*খোসা ছাড়ানো আপেল বাটা*	*১টি*
পেঁয়াজ মিহি কুচি	*১টি*	*গাজর কুচি (মাঝারি)*	*১টি*
রসুন বাটা	*২ কোয়া*	*সবজি স্টক (পৃ. ৩০৪)*	*৭ কাপ*
আদা বাটা	*১ টেবিল চামচ*	*ফুলকপি কুচি (ছোট)*	*১টি*
হলুদ	*১/২ চা চামচ*	*ধনেপাতা কুচি*	*১/৪ কাপ*
ধনে বাটা	*১ চা চামচ*		

প্রণালি : একটি বড় বাটিতে গরম পানি নিয়ে তাতে যব ভেজান এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ১ ঘণ্টা রেখে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর বড় কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও রসুন দিন। পেঁয়াজ নরম হওয়া পর্যন্ত নাড়ুন। এরপর আদা হলুদ ও জিরা দিয়ে নাড়তে থাকুন। সুগন্ধ বের হলে যব, আপেল বাটা এবং গাজর কুচি দিয়ে ২ মিনিট নাড়ুন। এতে এবার স্টক মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ১ ঘণ্টা রান্না করুন। ঢাকনা খুলে ফুলকপি দিন। আবার ঢাকনা এঁটে ১০ মিনিট অথবা ফুলকপি সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। ধনেপাতা দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিয়ে পরিবেশন করুন।

ওটস-মাশরুম স্যুপ

পেঁয়াজ কুচি	*১টি*	*সয়াসস*	*২ চা চামচ*
মাশরুম স্টক	*৫ কাপ*	*লবণ*	*স্বাদমতো*
তেজপাতা	*১টি*	*গোলমরিচ গুঁড়ো*	*স্বাদমতো*
ওটস	*২/৩ কাপ*	*পুদিনা পাতা*	*১/২ চা চামচ*
মাশরুম কুচি	*২ কাপ*	*তেল*	*১/২ চা চামচ*

প্রণালি : একটি পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ হালকা করে ভেজে নিন। এর মধ্যে মাশরুম স্টক, তেজপাতা এবং ওটস দিয়ে সেদ্ধ করুন। চুলার আঁচ কমিয়ে ওটস নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। আরেকটি পাত্রে মাশরুম কুচি লবণ এবং পানি দিয়ে উঁচু আঁচে এমনভাবে ভাজুন যেন কোনো পানি না থাকে। ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে রাখুন।

এবার রান্না করা ওটস থেকে তেজপাতা তুলে নিন এবং ওটস ব্লেন্ডারে নিয়ে খুব মসৃণ করে ব্লেন্ড করুন। ব্লেন্ড শেষে একটি পাত্রে নামিয়ে ভেজে রাখা মাশরুম সয়াসস লবণ ও গোলমরিচ মিশিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সালাদ

তাজা সালাদ

গাজর	*২টি*	*ক্যাপসিকাম (ঐচ্ছিক)*	*১টি*
মুলা	*১টি*	*পেঁয়াজ পাতা বা পেঁয়াজকলি*	*১ আঁটি*
ক্ষীরা/ শসা	*২টি*	*লেটুস পাতা*	*৬টি*
টমেটো	*৪টি*		

প্রণালি : সব সবজি ধুয়ে রাখুন। গাজর খোসা ছাড়িয়ে ৬ সে.মি. লম্বা ফালি করুন। মুলা খোসাসহ গোল চাক করে কাটুন। ক্ষীরা খোসা ছাড়িয়ে লম্বা ফালি করুন। টমেটো ও ক্যাপসিকাম লম্বা টুকরো করুন। পেঁয়াজ পাতার পেঁয়াজের পাতলা খোসা ছাড়ান। পেঁয়াজসহ পেঁয়াজ পাতা লম্বা রেখে আগা কেটে ফেলুন। কচি এবং ছোট আকারের লেটুস পাতা নিন। আয়তাকার স্বচ্ছ কাচের পাত্রে সবজিগুলো রং মিলিয়ে নিজের পছন্দমতো সাজিয়ে নিয়ে পরিবেশন করুন।

রাশিয়ান সালাদ

আলু	*১ কাপ*	*লেবুর রস*	*২ চা চামচ*
গাজর	*১/২ কাপ*	*গুড়*	*১ চা চামচ*
শসা	*১/২ কাপ*	*সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
আনারস	*১/২ কাপ*	*সরিষা গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
আপেল (ঐচ্ছিক)	*১/২ কাপ*	*লবণ*	*১ চা চামচ*
আঙুর (ঐচ্ছিক)	*৬টি*		

প্রণালি : আলু ও গাজর খোসা ছাড়িয়ে ছোট চৌকো টুকরো করে আলাদা সেদ্ধ করে রাখুন। শসা আনারস ও আপেল আলুর মতো চৌকো টুকরো করে নিন। সব উপকরণ একসঙ্গে মেশান। প্লেটে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

গ্রিন পাপায়া সালাদ

কাঁচা পেঁপে	*২৫০ গ্রাম*	*সয়াসস*	*২ টেবিল চামচ*
বরবটি	*১২৫ গ্রাম*	*রসুন ছেঁচা*	*৩ কোয়া*
টমেটো (মাঝারি)	*২টি*	*ভাজা চীনাবাদাম কুচি*	*২ টেবিল চামচ*
নারিকেলের ঘন দুধ	*১/৪ কাপ*	*ধনেপাতা কুচি*	*২ চা চামচ*

প্রণালি : পেঁপের খোসা ছাড়িয়ে ঝুরি করুন। ঠান্ডা পানিতে ডুবিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পরে পানি ঝরিয়ে নিন। বরবটি ২১/২ সে.মি. লম্বা টুকরো করুন। লবণ পানিতে এমনভাবে সেদ্ধ করুন যেন নরম না হয়। পানি ঝরিয়ে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নিন। সালাদের বাটিতে পেঁপে বরবটি টমেটো কুচি মেখে রাখুন। নারিকেলের দুধের সাথে সয়াসস ও রসুন মেশান। সালাদের ওপর ঢেলে দিন। ওপরে চীনাবাদাম ও ধনেপাতার কুচি ছড়িয়ে প্লেটে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। [**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা বাদাম বাদ দিয়ে তৈরি করবেন]

ক্যাপসিকাম-লেটুস-শসার সালাদ

লেটুস পাতা	*১ বাটি*	*টমেটো*	*১টি*
সবুজ ক্যাপসিকাম	*১টি*	*শসা*	*অর্ধেক*
কাঠবাদাম/ পেস্তাবাদাম/ আখরোট/ চীনাবাদাম		*১ মুঠ*	

সালাদ সাজাতে উপকরণ :

ভিনেগার	*১/২ টেবিল চামচ*	*রসুন ছেঁচা*	*১-২ কোয়া*
এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল (ঐচ্ছিক)	*২ চা চামচ*	*জিরা গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
কালো গোলমরিচ গুঁড়ো	*১/৪ টেবিল চামচ*	*মধু*	*১ টেবিল চামচ*
দারুচিনি গুঁড়ো	*১ চিমটি*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*

সালাদ সাজানোর উপকরণগুলো একসাথে মিশিয়ে ঝাঁকিয়ে নিন। সালাদে ব্যবহার করার আগপর্যন্ত রেফ্রিজারেটরে রাখুন।

প্রণালি : সব সবজি ধুয়ে নিন। শসা খোসা ছাড়িয়ে পাতলা স্লাইস করে কেটে নিন। টমেটো ও ক্যাপসিকাম মাঝখান দিয়ে কেটে ভেতরের শাঁস ফেলে পাতলা স্লাইস করে কেটে নিন। এবার শসা টমেটো ক্যাপসিকাম এবং লেটুস পাতা ছিঁড়ে একটি বড় বাটিতে নিন। সব উপকরণ ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে একটি প্লাস্টিকের প্লেট দিয়ে ঢেকে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। পরিবেশন করার আগে সালাদের বাটিতে সালাদ সাজানোর উপকরণ মিশিয়ে নিন। কাঠবাদাম/ পেস্তাবাদাম/ আখরোট/ চীনাবাদাম ওপরে ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করুন। [**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা বাদাম বাদ দিয়ে তৈরি করবেন]

ডিনার সালাদ

বাঁধাকপি	*১/২ বাটি*	*লেটুস পাতা*	*১ বাটি*
শসা	*১টি*	*হলুদ ক্যাপসিকাম*	*অর্ধেক*
টমেটো	*১টি*	*ছোলা (সেদ্ধ)*	*১ কাপ*
পেঁয়াজ পাতা কুচি	*১টি*	*লেবুর রস*	*৩ টেবিল চামচ*
পেঁয়াজ	*অর্ধেক*	*কাঁচামরিচ*	*১টি*
কুমড়া টুকরো	*১ কাপ*	*লবণ (ঐচ্ছিক)*	*পরিমাণমতো*
লাল ক্যাপসিকাম	*অর্ধেক*	*আখরোট/ কাঠবাদাম (ভিজানো)*	*৫টি*

প্রণালি : বাঁধাকপি টমেটো ক্যাপসিকাম ও লেটুস পাতা ধুয়ে কুচি করে কেটে নিতে হবে। শসা ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে কেটে নিন। পেঁয়াজ চাক চাক করে কেটে ছাড়িয়ে নিন। ছোলা ও কুমড়ার টুকরো ৭-১০ মিনিট সেদ্ধ করে নিন। এবার একটি বড় বাটিতে বাঁধাকপি শসা টমেটো ক্যাপসিকাম ছোলা কুমড়া কাঁচামরিচ ও লেটুস পাতা, পেঁয়াজ পাতা, পেঁয়াজ কুচি মিশিয়ে ৩০ মিনিট রেফ্রিজারেটরে রাখুন। এরপর বাদাম কুচি লেবুর রস ও লবণ (ঐচ্ছিক) মিশিয়ে পরিবেশন করুন। [**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা বাদাম বাদ দিয়ে তৈরি করবেন]

মিষ্টি আলুর সালাদ

মিষ্টি আলু	*২টি*	*রসুন কুচি*	*১ কোয়া*
কমলার রস	*১/২ কাপ*	*ধনেপাতা কুচি*	*১ টেবিল চামচ*
লেবুর রস	*২ টেবিল চামচ*	*মালটা*	*২টি*
লবণ	*১/২ চা চামচ*		

প্রণালি : সাদা মিষ্টি আলু খোসা ফেলে লম্বা ফালি করে কাটুন। মাল্টা খোসা ফেলে টুকরো করে নিন। এবার একটি বাটিতে মিষ্টি আলু, কমলার রস, লেবুর রস, লবণ, রসুন, ধনেপাতা এবং মাল্টা নিয়ে মেশান। ঠান্ডা হওয়ার জন্যে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। ঘণ্টাখানেক পরে বের করে প্লেটে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ভুট্টা-শিমের বিচি-টমেটো সালাদ

শুকনো শিমের বিচি	*১১/২ কাপ*	*রসুন কুচি*	*১ চা চামচ*
ভুট্টা দানা	*১ কাপ*	*পেঁয়াজ কুচি*	*১ চা চামচ*
টমেটো টুকরো	*২টি*	*লেবুর রস*	*১ কাপ*
জিরা	*২ চা চামচ*	*লেবুর খোসা কুচি*	*১টি*
ক্যাপসিকাম	*১টি*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*

প্রণালি : শুকনো শিমের বিচি ও ভুট্টার দানা ১০ মিনিট সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার একটি বাটিতে সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে নিন। ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন।

গাজর-বিট ডিলাইট

বিটরুট (গ্রেট করা)	*১/২ কাপ*	*কিশমিশ (ভিজানো)*	*১০-১২টি*
গাজর (গ্রেট করা)	*১ কাপ*	*লেবুর রস*	*১ চা চামচ*
টমেটো কুচি	*১টি*		

প্রণালি : বিটরুট ও গাজর ভালো করে ধুয়ে গ্রেট করে একটি পাত্রে নিন। এর সাথে টমেটো কুচি মেশান। কিশমিশ ছড়িয়ে দিন। তারপর লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে প্লেটে বেড়ে পরিবেশন করুন।

কোরিয়ান মেরিনেটেড ক্যাবেজ সালাদ

চাইনিজ/ দেশি বাঁধাকপি	*১৫৫ গ্রাম*	*সাদা তিল ভাজা গুঁড়ো*	*১ টেবিল চামচ*
ক্ষীরা/ শসা	*১টি*	*সিরকা*	*১১/২ টেবিল চামচ*
গাজর কুচি	*১/২ কাপ*	*সয়াসস লাইট*	*২১/২ টেবিল চামচ*
তিলের তেল	*১১/২ টেবিল চামচ*	*গুড়*	*১ চা চামচ*
কচি পেঁয়াজ কুচি	*৩টি*	*শুকনো মরিচ গুঁড়ো*	*১১/২ চা চামচ*
আদা কুচি	*১/২ চা চামচ*	*লবণ*	*প্রয়োজনমতো*

প্রণালি : বাঁধাকপির পাতা আলাদা আলাদা ধুয়ে পানি ঝরান। মোটা কুচি করুন। ক্ষীরা/ শসার তিতা ফেলে ধুয়ে খোসা ছাড়ান। পাতলা লম্বা স্লাইস করুন। সালাদের বাটিতে বাঁধাকপি ও শসা নিয়ে ওপরে তেল ঢেলে দিন। ১৫ মিনিট রাখুন। অন্যান্য উপকরণ একসাথে মিশিয়ে সালাদের ওপর ঢেলে দিন। ৫ ঘণ্টা ঢেকে রাখুন।

কমলার রসে ব্রকোলি

ব্রকোলি	*১টি*	*মরিচের গুঁড়ো*	*১/৪ চা চামচ*
কমলার রস	*১ কাপ*	*কমলার খোসা কুচি*	*১টি*
রসুন কুচি	*২ টেবিল চামচ*		

প্রণালি : ব্রকোলি ধুয়ে নিন। ব্রকোলির ফুল, কাণ্ড ও ডাঁটা আলাদা করে কেটে নিন। কমলা লেবুর রস বের করে নিন এবং খোসা গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিন। একটি পাত্রে ১/২ কাপ কমলার রস দিয়ে মৃদু আঁচে চুলায় বসান। এরপর রসুন কুচি দিয়ে ৫ মিনিট নেড়ে ভেজে বাদামি করুন। এবার এর সাথে মরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভাজুন। একটি প্লেটে নামিয়ে রাখুন। পাত্রটিতে বাকি কমলার রস এবং কেটে রাখা ব্রকোলি দিয়ে উঁচু আঁচে চুলায় বসান। ব্রকোলি এমনভাবে সেদ্ধ করুন যেন নরম হয় এবং কমলার রস শুকিয়ে যায়। এবার কমলার খোসা ও ভেজে রাখা রসুন এর সাথে মেশান এবং একটি প্লেটে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

শসা-মিষ্টি আলুর সালাদ

মিষ্টি আলু	*২ কাপ*	*ধনেপাতা কুচি*	*১/২ কাপ*
শসা	*১ কাপ*	*মরিচ গুঁড়ো*	*১ চা চামচ*
লেবুর রস	*১/৪ কাপ*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
লেবুর খোসা কুচি	*১/২ কাপ*		

প্রণালি : মিষ্টি আলু ও শসা ধুয়ে খোসা ফেলে চৌকো টুকরো করে নিন। এবার একটি স্বচ্ছ কাচের বাটিতে মিষ্টি আলু ও শসার টুকরো, লেবুর রস, লেবুর খোসা কুচি, ধনেপাতা কুচি ও লবণ নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। রেফ্রিজারেটরে রেখে ঠান্ডা করুন। পরিবেশন করার আগে মরিচ গুঁড়ো ওপরে ছিটিয়ে দিন।

চীনাবাদাম-গাজরের নুডল্স

গাজর	*২টি*	*লেবুর রস*	*১ চা চামচ*
চীনাবাদাম গুঁড়ো	*১/৪ কাপ*	*লবণ (ঐচ্ছিক)*	*পরিমাণমতো*
জিরা গুঁড়ো	*১ চা চামচ*	*ধনেপাতা কুচি*	*২ চা চামচ*

প্রণালি : গাজর ভালো করে ধুয়ে ছিলে নিন। এরপর গ্রেটার দিয়ে নুডল্স-এর আকৃতিতে গাজর গ্রেট করে একটি প্লেটে নিন। চীনাবাদাম ও জিরা গুঁড়ো গ্রেট করা গাজরের সাথে মিশিয়ে নিন। চাইলে অল্প লবণ দিতে পারেন। লেবুর রস ওপর দিয়ে ছিটিয়ে দিন। ধনেপাতা কুচি সালাদের ওপরে দিয়ে আপনার পছন্দের চাটনির সাথে পরিবেশন করুন।
[**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা বাদাম বাদ দিয়ে তৈরি করবেন]

শাকসবজির রেসিপি

ডাল-মটরশুঁটি চাট

ছোলা/ মটর	*১ কাপ*	*আমচুর (ঐচ্ছিক)*	*১ চা চামচ*
মটরশুঁটি	*১/২ কাপ*	*তেঁতুল চাটনি*	*২ টেবিল চামচ*
শসা কুচি	*১ চা চামচ*	*খেজুর কুচি*	*২ টেবিল চামচ*
টমেটো কুচি	*১ কাপ*	*লবণ*	*১ চিমটি*
পেঁয়াজ কুচি	*১/২ কাপ*	*ধনেপাতা*	*১ চা চামচ*
কাঁচামরিচ	*১টি*		

প্রণালি : ছোলা/ মটর আগের রাতে ভিজিয়ে রাখুন। ভিজানো ছোলা/ মটর ও মটরশুঁটি ১০-১৫ মিনিট অথবা নরম না হওয়া পর্যন্ত সেদ্ধ করুন। এরপর একটি বাটিতে সেদ্ধ ছোলা/ মটর ও মটরশুঁটি নিয়ে একটি চামচ দিয়ে চেপে হালকা গুঁড়ো করে নিন। এরপর বাকি সব উপকরণ মেশান। ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

বাঁধাকপি-শিমের সবজি

বাঁধাকপি কুচি	*১টি*	*সাদা শিমের বিচি*	*২ কাপ*
রসুন কুচি	*৪ কোয়া*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
মরিচ গুঁড়ো	*১ চা চামচ*	*গোলমরিচ গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
সবজি স্টক (পৃ. ৩০৪)	*১/২ কাপ*	*তেল*	*১ চা চামচ*
টমেটো	*৩ কাপ*		

প্রণালি : কড়াইতে ১ চা চামচ তেল নিয়ে গরম করুন। এরপর রসুন কুচি এবং শুকনো মরিচ গুঁড়ো দিয়ে কষিয়ে নিন। বাঁধাকপি দিয়ে ঢেকে দিন। বাঁধাকপি সেদ্ধ হয়ে পানি বের হলে সবজি স্টক টমেটো এবং শিমের বিচি দিন। নামানোর আগে লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে নেড়ে দিন। সব উপকরণ মিশে সুগন্ধ ছড়ালে চুলা থেকে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

বর্ষার মিক্সড সবজি

পেঁপে	*১ কাপ*	*পেঁয়াজ*	*৩টি*
কাঁচকলা	*১টি*	*আদা বাটা*	*১/৪ চা চামচ*
মিষ্টিকুমড়া	*১ কাপ*	*হলুদ বাটা*	*১/২ চা চামচ*
চালকুমড়া	*১ কাপ*	*জিরা বাটা*	*১/২ চা চামচ*
বেগুন	*১ কাপ*	*ধনে বাটা*	*১/২ চা চামচ*
ডাঁটা	*২টি*	*কাঁচামরিচ*	*৪টি*
মিষ্টি আলু	*২টি*	*তেজপাতা*	*১টি*
পটল	*২টি*	*পাঁচফোড়ন*	*১ চা চামচ*
ঝিঙে	*২টি*	*তেল*	*১ চা চামচ*
লবণ	*২ চা চামচ*		

প্রণালি : পেঁপে টুকরো করে কেটে সামান্য ভাপিয়ে রাখুন। কাঁচকলা টুকরো করে হলুদ মাখিয়ে রাখুন। ডাঁটা মিষ্টি আলু পটল ঝিঙে চালকুমড়া সামান্য পানি ও বাটা মসলা দিয়ে সেদ্ধ করুন। অর্ধসেদ্ধ হলে মিষ্টিকুমড়া বেগুন পেঁপে কাঁচকলা লবণ দিয়ে সেদ্ধ করুন। সবজি সেদ্ধ হওয়া মাত্রই নামিয়ে নিন। আদা কুচি সবজিতে দিন। কড়াই গরম করে পাঁচফোড়ন আদা তেজপাতা কাঁচামরিচ ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন। পেঁয়াজ বাদামি রং হলে সবজি ঢেলে দিন। ফুটে উঠলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

পালং-মুলার তরকারি

পালং শাক কুচি	*১/২ কেজি*	*হলুদ গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
মুলা (মাঝারি)	*২টি*	*তেল*	*১/২ চা চামচ*
পেঁয়াজ কুচি (বড়)	*১টি*	*লবণ*	*১ চা চামচ*
রসুন থেঁতো করা	*২ কোয়া*		

প্রণালি : মুলা ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে পাতলা স্লাইস করে নিন। একটি কড়াইতে শাক ও মুলা কুচি নিয়ে একটু পানি ছিটিয়ে দিন। অল্প আঁচে সেদ্ধ করুন যে পর্যন্ত না মুলা নরম হয়। এবার কড়াইতে তেল গরম করে পাঁচফোড়ন দিন। তাড়াতাড়ি পেঁয়াজ দিয়ে আঁচ কমিয়ে পেঁয়াজ বাদামি করে ভাজুন। এর মধ্যে রসুন হলুদ মরিচ ও লবণ দিন। ভালো করে নেড়ে ৩০ সেকেন্ড ভেজে সেদ্ধ করা সবজিগুলো ভালো করে মেশান। নামিয়ে পরিবেশন করুন।

সজনে পাতার মালাইকারি

নারিকেলের দুধ	*১ কাপ*	*সজনে পাতা*	*৬ কাপ*
রসুন কুচি	*২ টুকরো*	*লবণ*	*১/৮ চা চামচ*
পেঁয়াজ কুচি (মাঝারি)	*৬টি*		

প্রণালি : নারিকেলের দুধ, রসুন ও পেঁয়াজ একটি পাত্রে রেখে লবণ দিন ও ১০ মিনিট ফোটান। ফুটে ওঠার পর ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। এখন সজনে পাতা ও ঘন নারিকেলের দুধ দিয়ে আরো ৫ মিনিট রান্না করুন। এরপর নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

কচুর ঘণ্ট

কচু সেদ্ধ	*৪ কাপ*	*শুকনো মরিচ*	*৩টি*
হলুদ বাটা	*১/২ চা চামচ*	*লবণ*	*১ চা চামচ*
কাঁচামরিচ	*৬টি*	*রসুন বাটা*	*১ চা চামচ*
জিরা বাটা	*১ চা চামচ*	*তেজপাতা*	*১টি*
ধনে বাটা	*১ চা চামচ*	*গরম মসলা বাটা*	*১/২ চা চামচ*
আদা বাটা	*১ চা চামচ*	*নারিকেল (ঐচ্ছিক)*	*২ টেবিল চামচ*
তেল	*১ চা চামচ*		

প্রণালি : কচুর পাতা ফেলে ডাঁটা টুকরো করে ধুয়ে নিন। ডাঁটা ছিলবেন না। মাঝারি আঁচে সেদ্ধ করুন। পানি দেবেন না। কচু সেদ্ধ হলে হলুদ কাঁচামরিচ ও লবণ দিন। চামচের পিঠ দিয়ে কচু থেঁতলে মেশান। জিরা ধনে ও আদা বাটা দিয়ে নাড়ুন। পানি শুকিয়ে গেলে নামান। কড়াইয়ে তেল গরম করে শুকনা মরিচ তেজপাতা, রসুন দিয়ে ভাজুন। কচু দেয়ার পর নেড়ে নেড়ে অনেকক্ষণ ভাজুন। এসময় নারিকেল ও গরম মসলা দিন। ভালোভাবে পানি শুকিয়ে কচু দলা বেঁধে এলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

পুরভরা ক্যাপসিকাম

ক্যাপসিকাম	*৩টি*	*কচি ভুট্টা*	*৫০ গ্রাম*
বরবটি	*৩টি*	*গাজর*	*৫০ গ্রাম*
মটরশুঁটি	*৫০ গ্রাম*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
আলু	*৫০ গ্রাম*	*সরিষার তেল*	*১/২ চা চামচ*

প্রণালি : ক্যাপসিকাম ছাড়া সবগুলো তরকারি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে সামান্য তেলে ভাজুন। চুলা থেকে নামিয়ে একটি বাটিতে ঢেকে রাখুন। এবার ক্যাপসিকামের মুখের দিকটা কেটে ভেতরটা পরিষ্কার করে নিন। রান্না করা তরকারির পুর ক্যাপসিকামের ভেতর ভরুন। ওভেনে ১৮০° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ৫ মিনিট বেক করে নিন। হয়ে গেল পুরভরা ক্যাপসিকাম। আপনার পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

পাঁচমিশালি তরকারি

আলু	*২৫০ গ্রাম*	*ছাড়ানো মটরশুঁটি*	*১ মুঠো*
ফুলকপি	*২৫০ গ্রাম*	*হলুদ গুঁড়ো*	*১/২ চামচ*
বেগুন	*২৫০ গ্রাম*	*আদা বাটা*	*২ চা চামচ*
পটল	*২৫০ গ্রাম*	*তেজপাতা*	*২টি*
কুমড়া	*২৫০ গ্রাম*	*শুকনো মরিচ*	*১টা*
ঝিঙে	*২৫০ গ্রাম*	*পাঁচফোড়ন*	*১ চামচ*
শিম	*২৫০ গ্রাম*	*সরিষার তেল*	*২ চা চামচ*
টমেটো (বড়)	*২টি*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*

প্রণালি : আলু পটল ও কুমড়ার খোসা ছাড়িয়ে সব রকমের তরকারি সমান পরিমাণে ছোট ছোট ডুমো করে কেটে ধুয়ে রাখুন। তেল গরম হলে শুকনো মরিচ (ছিঁড়ে), তেজপাতা ও পাঁচফোড়ন ছাড়ুন। এবার আদা বাটা দিয়ে নেড়েচেড়ে আলু কপি শিম পটল কুমড়া ও বেগুন কড়াইতে দিন। লবণ ও হলুদ দিয়ে মটরশুঁটি ঢেলে নাড়ুন। ঢাকনা দিয়ে কম আঁচে সেদ্ধ হতে দিন। একটু পরে ঢাকনা খুলে টমেটো চটকে সবজিতে মেশান এবং আবার ঢেকে রাখুন। হালকা ভাজা হলে কাঁচামরিচ ১-২টা ছড়িয়ে ঢাকনা দিয়ে নামিয়ে রাখুন।

শীতের মিক্সড সবজি-১

বাঁধাকপি মোটা কুচি	*৩ কাপ*	*টমেটো টুকরো*	*৩টি*
ব্রকোলি (টুকরো)	*২ কাপ*	*তেল*	*১/২ চা চামচ*
গাজর টুকরো সেদ্ধ	*১/২ কাপ*	*জিরা*	*১/২ চা চামচ*
মটরশুঁটি খোসা ছাড়ানো	*১/২ কাপ*	*মরিচ বাটা*	*১ চা চামচ*
শিম (টুকরো)	*১/২ কাপ*	*ধনে বাটা*	*২ চা চামচ*
পেঁয়াজকলি কুচি	*১/২ কাপ*	*লবণ*	*১ চা চামচ*

প্রণালি : হাঁড়িতে তেল গরম করে জিরার ফোড়ন দিন। বাঁধাকপি ব্রকোলি গাজর মটরশুঁটি শিম পেঁয়াজকলি, বাটা মসলা ও ১/২ কাপ পানি দিয়ে ঢেকে মৃদুজ্বালে সেদ্ধ করুন। সবজি সেদ্ধ হলে লবণ দিয়ে নেড়ে দিন। পানি শুকিয়ে এলে টমেটো দিন। টমেটো সেদ্ধ হলে নামান। [মিষ্টিকুমড়া বেগুন পেঁপে আলু কাঁচকলা দিয়েও নিরামিষ করা যায়। এতে আদা বাটা, জিরা বাটা, পেঁয়াজ দেয়া যায়। ফোড়নে জিরার বদলে পাঁচফোড়ন দিতে হবে]

শীতের মিক্সড সবজি-২

লাউয়ের খোসা কুচি	*১ কাপ*	*পেঁয়াজ*	*২টি*
শিম মোটা কুচি	*১/২ কাপ*	*কাঁচামরিচ কুচি*	*৪টি*
নতুন আলু	*১/২ কাপ*	*ধনেপাতা কুচি*	*২ টেবিল চামচ*

বেগুন মোটা কুচি	*১টি*	*হলুদ বাটা*	*১/২ চা চামচ*
ফুলকপি ছোট টুকরো	*১/২ কাপ*	*তেল*	*১/২ চা চামচ*

প্রণালি : লাউয়ের খোসা আধা সেদ্ধ করে নিন। কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ এবং সব সবজি সামান্য ভেজে নিন। লবণ ও হলুদ দিয়ে নেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। প্রয়োজন হলে ২ টেবিল চামচ পানি দিন। সবজি সেদ্ধ হলে কাঁচামরিচ ও ধনেপাতা দিয়ে নেড়ে ঢেকে দিন। পানি শুকিয়ে গেলে নামান।

পুরভরা টমেটো

টমেটো	*২টি*	*অঙ্কুরিত মটরশুঁটি*	*২ টেবিল চামচ*
ক্যাপসিকাম কুচি	*১/৪ টি*	*কাঁচামরিচ কুচি*	*১/২ টি*
ধনেপাতা	*২ চা চামচ*	*লেবুর রস*	*স্বাদমতো*
পেঁয়াজ কুচি	*১/৪ টি*	*লবণ (ঐচ্ছিক)*	*পরিমাণমতো*

প্রণালি : প্রথমে টমেটোর ওপরের অংশ কেটে ভেতরের শাঁস বের করে ফেলুন। এরপর একটি পাত্রে অঙ্কুরিত মটরশুঁটি ক্যাপসিকাম পেঁয়াজ কাঁচামরিচ লেবুর রস ধনেপাতা ও লবণ ভালোভাবে মেশান। টমেটোর ভেতরে সালাদের মিশ্রণ ভরুন। ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে আপনার প্রিয় যে-কোনো চাটনি দিয়ে পরিবেশন করুন।

মসলা ঢেঁড়স

ঢেঁড়স	*২ কাপ*	*জিরা গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
রসুন কুচি	*২ কোয়া*	*আমচুর*	*১/২ চা চামচ*
কাঁচামরিচ বাটা	*১ চা চামচ*	*হলুদ গুঁড়ো*	*১/৪ চা চামচ*
চালের গুঁড়ো/ বেসন	*২ চা চামচ*	*লেবুর রস*	*১ চা চামচ*
ধনে গুঁড়ো	*১/২ চা চামচ*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*

প্রণালি : ঢেঁড়স ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে কেটে একটি বাটিতে নিন। চালের গুঁড়ো/ বেসন মেশান। এর সাথে লেবুর রস বাদ দিয়ে বাকি উপকরণগুলো অল্প একটু পানি ছিটিয়ে ভালো করে মেখে নিন। এরপর ভাপে বসান। ৫ মিনিট ভাপ দিন অথবা নরম না হওয়া পর্যন্ত ভাপ দিন। ভাপ থেকে নামিয়ে লেবুর রস ওপরে ছিটিয়ে পরিবেশন করুন।

মাশরুম কারি

বাটন মাশরুম	*২ কাপ*	*শুকনো পুদিনা পাতা গুড়ো*	*১ চা চামচ*
ঝিনুক মাশরুম	*৩/৪ কাপ*	*তুলসীপাতা*	*১ চা চামচ*
বেগুন পাতলা কুচি	*১টি*	*মরিচ গুঁড়ো*	*১ চা চামচ*

টমেটো	*৩টি*	*পানি/ সবজি স্টক (পৃ. ৩০৪)*	*১/২ কাপ*
পেঁয়াজ কুচি (বড়)	*২টি*	*ধনেপাতা কুচি*	*১ টেবিল চামচ*
রসুন কুচি	*৩ কোষ*		

প্রণালি : মাশরুম ধুয়ে কেটে নিন। টমেটো ও বেগুন টুকরো করে কেটে নিন। এবার একটি গরম কড়াইতে ধনেপাতা কুচি ছাড়া বাকি সব উপকরণ দিন। হালকা আঁচে উপকরণগুলো কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে সেদ্ধ করুন। পানি শুকিয়ে আসতে থাকলে অল্প অল্প পানি দিয়ে নাড়তে থাকুন যেন তলায় লেগে না যায়। রান্না হয়ে যাওয়ার পর প্লেটে নামিয়ে ওপরে ধনেপাতা কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

টোফু

সয়াবিন	*২৫০ গ্রাম*	*পানি*	*১ লিটার*
লেবুর রস	*২ টেবিল চামচ*		

প্রণালি : সয়াবিন ধুয়ে ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। পানি ঝরিয়ে ব্লেন্ড করে নিন অথবা পাটায় মিহি করে বেটে নিন। ১ লিটার পানি মিশিয়ে দুধ তৈরি করুন। ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে জ্বাল দিন। ফুটে উঠলে চুলা বন্ধ করুন। তিন মিনিট পর ফুটন্ত দুধে ২ টেবিল চামচ লেবুর রস অল্প অল্প করে মেশান। ধীরে ধীরে দুধ ফেটে যাবে। চুলায় একটি তাওয়া বসিয়ে তার ওপর সয়াদুধের পাত্রটি বসান। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। ১০-১৫ মিনিট অল্প আঁচে রাখুন।

এবার একটি জালিতে পাতলা কাপড় নিয়ে অল্প অল্প করে ফেটে যাওয়া দুধ নিন। এটা হচ্ছে সয়ার ছানা। ছানা থেকে আস্তে আস্তে চেপে পানি বের করুন। কাপড়টি ভালোভাবে মুড়িয়ে একটি চামচ দিয়ে চেপে চেপে যতটা সম্ভব পানি বের করুন। এবার কাপড়ে পেঁচানো ছানাটি একটি প্লেটে রেখে তার ওপর অন্য একটি স্টিলের প্লেট উল্টো করে ভারী কিছু (যেমন এক হাঁড়ি পানি) দিয়ে ঘণ্টাখানেক চাপা দিয়ে রাখুন। ঘণ্টাখানেক পর দেখা যাবে সয়ার ছানা জমে টোফু তৈরি হয়ে গেছে। এবার টোফুটি ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে উঠিয়ে নিন। টোফু নিজের পছন্দমতো আকৃতিতে কেটে নিন। এই টোফু রেফ্রিজারেটরে ৩-৫ দিন সংরক্ষণ করতে পারবেন।

টোফু-মাশরুম কারি

টোফু [পৃ. ৩১৮]	*১/২ কাপ*	*মরিচ গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
বাটন মাশরুম	*১/২ কাপ*	*জিরা গুঁড়ো*	*১/৪ চা চামচ*
পেঁয়াজ কুচি	*১ চা চামচ*	*সয়াসস*	*১/২ টেবিল চামচ*
রসুন বাটা	*১/২ চা চামচ*	*তেল*	*১/২ চা চামচ*
হলুদ গুঁড়ো	*১/২ চা চামচ*		

প্রণালি : ১/২ কাপ টোফু একটি পাত্রে নিয়ে ভেঙে গুঁড়ো করে নিন। টোফুর সাথে পেঁয়াজ কুচি, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো মেখে রেখে দিন। এবার একটি কড়াইতে ১/২ চা চামচ তেল দিয়ে কড়াই গরম করুন। চুলার আঁচ কমিয়ে তাতে মাশরুম কুচি এবং সয়াসস দিয়ে নাড়ুন। মাশরুম নরম হয়ে এলে তাতে আগে মেখে রাখা টোফুর উপকরণ দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে ফেলুন। ২ মিনিট নেড়ে ভাজা ভাজা করুন। এবার একটি প্লেটে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

ফুলকপি-মটরশুঁটি ভুনা

ফুলকপি	*৪ কাপ*	*হলুদ গুঁড়ো*	*১ চা চামচ*
আলু	*৩ কাপ*	*মরিচ গুঁড়ো*	*১১/২ চা চামচ*
টমেটো কুচি	*১ কাপ*	*ধনে গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
মটরশুঁটি	*১ কাপ*	*জিরা গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
পেঁয়াজ কুচি	*১১/২ কাপ*	*পানি*	*পরিমাণমতো*
আদা বাটা	*৩ চা চামচ*	*ধনেপাতা কুচি*	*১/২ কাপ*
রসুন কুচি	*৩ কোয়া*		

প্রণালি : ফুলকপি ও আলু ধুয়ে টুকরো করে কেটে নিন। এবার একটি পাত্রে পেঁয়াজ কুচি আদা বাটা ফুলকপি আলু এবং পানি নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে সেদ্ধ করুন। চুলার আঁচ কমিয়ে হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো ও রসুন কুচি দিন। কয়েক মিনিট নেড়ে রান্না করুন। টমেটো ও মটরশুঁটি দিয়ে আরো ১০ মিনিট রান্না করুন। পানি শুকিয়ে ফেলুন। সবশেষে ওপরে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন।

টমেটো-ঢেঁড়স ভুনা

ঢেঁড়স টুকরো	*২ কাপ*	*কাঁচামরিচ বাটা*	*১ চা চামচ*
পেঁয়াজ কুচি	*১ কাপ*	*লেবুর রস*	*১ টেবিল চামচ*
রসুন কুচি	*২ চা চামচ*	*লেবুর খোসা কুচি*	*১ চা চামচ*
ভিনেগার	*১/৪ কাপ*	*গোলমরিচ গুঁড়ো*	*স্বাদমতো*
টমেটো কুচি	*১ কাপ*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*

প্রণালি : ঢেঁড়স ধুয়ে পানি ঝরিয়ে শুকিয়ে নিন। তারপর ঢেঁড়সের বোঁটা এবং আগার দিক কেটে ১/৪ ইঞ্চি করে টুকরো করুন। এবার একটি কড়াইতে পেঁয়াজ ও রসুন কুচি নিয়ে এর মধ্যে ভিনেগার দিয়ে ভেজে নরম করুন। ভাজা হলে ঢেঁড়স, টমেটো কুচি, কাঁচামরিচ বাটা দিয়ে নেড়ে ভাজুন। চুলার আঁচ কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ৮-১০ মিনিট সেদ্ধ করে ঢেঁড়স নরম করুন। ঢাকনা সরিয়ে লেবুর রস ও লেবুর খোসা কুচি দিয়ে নেড়ে পানি শুকিয়ে ফেলুন। সবশেষে লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়ো ছিটিয়ে পরিবেশন করুন।

সরিষা-ডুমুর

ডুমুর	*২ কাপ*	*পানি*	*১/২ কাপ*
সরিষা বাটা	*১/২ কাপ*	*জিরা গুঁড়ো (ভাজা)*	*১ চা চামচ*
রসুন ও আদাবাটা	*১ চা চামচ*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
শুকনো মরিচ গুঁড়ো	*১ চা চামচ*	*গরম মসলার গুঁড়ো*	*১ চা চামচ*
ধনেগুঁড়ো	*১ চা চামচ*	*কাঁচামরিচ*	*৩-৪টি*
হলুদগুঁড়ো	*১/২ চা চামচ*	*পেঁয়াজ বাটা*	*২ টেবিল চামচ*

প্রণালি : ডুমুর কেটে টুকরো করে নিন। কাটা ডুমুর কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখুন যেন ডুমুরের কষ বের হয়ে যায়। এবারে ভালো করে ধুয়ে নিন (চাইলে একটা আলু ছোট ছোট টুকরো করে কেটে সাথে দিতে পারেন)। এবার কড়াইয়ে একে একে সব মসলা দিয়ে নেড়ে সেদ্ধ হওয়ার জন্যে ১/২ কাপ পানি দিয়ে ঢেকে দিন। সেদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে মাখা মাখা হয়ে এলে জিরা গুঁড়ো, গরম মসলার গুঁড়ো, কাঁচামরিচ ফালি দিয়ে নেড়ে ঢেকে রাখুন আরো ৫ মিনিট। সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হলে (মাংস রান্নার মতো) নামিয়ে পরিবেশন করুন।

মিষ্টিকুমড়া-পুঁইশাক

মিষ্টিকুমড়া	*১/২ কেজি*	*মরিচ গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
পুঁইশাক	*১/২ কেজি*	*কাঁচামরিচ*	*২টি*
পেঁয়াজ কুঁচি	*৩টি*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
রসুন বাটা	*১ চা চামচ*	*পানি*	*পরিমাণমতো*
আদা বাটা	*১/২ চা চামচ*	*তেল*	*১/২ চা চামচ*
হলুদ গুঁড়ো	*১/৪ চা চামচ*		

প্রণালি : কড়াইতে তেল গরম করে লবণ দিয়ে পেঁয়াজ কুচি ভাজুন। তারপর রসুন ও আদা বাটা, হলুদ ও মরিচ গুঁড়ো এবং আধা কাপ পানি দিয়ে কষিয়ে নিন। কাঁচামরিচ দিয়ে দিন। এবার ধুয়ে কেটে রাখা মিষ্টিকুমড়া দিয়ে দিন। ভালো করে মিশিয়ে ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন। কুমড়ার পানি বের হয়ে ঝোল হয়ে যাবে। এবার ধুয়ে কেটে রাখা পুঁইশাক দিয়ে দিন। ভালো করে মিশিয়ে নিন। আধা কাপ পানি দিয়ে আবার ঢাকনা দিয়ে ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন। চাইলে ঝোল আরো কমিয়ে নিতে পারেন। নামিয়ে পরিবেশন করুন।

সুইট অ্যান্ড সাওয়ার ভেজিটেবল

গাজর (পাতলা করে কাটা)	*২টি*	*টমেটো সস*	*১ কাপ*
ক্যাপসিকাম (বড় বড় টুকরো)	*২টি*	*ভিনেগার*	*১/২ চা চামচ*
টমেটো (বড় বড় টুকরো)	*৩টি*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
পেঁয়াজ (বড় বড় টুকরো)	*২টি*	*সরিষার তেল*	*১/২ চা চামচ*

গুড় (গুঁড়ো বা তরল)	*১½ চা চামচ*	*ময়দা*	*১ চা চামচ*
আদা ও রসুন কুচি	*১ চা চামচ*		

প্রণালি : সরিষার তেল কড়াইতে দিয়ে আদা ও রসুন কুচি দিন। ৩ মিনিট ভাজার পর টমেটো সস, ভিনেগার ও লবণ দিন। ভালোভাবে নাড়তে থাকুন। গাজর, ক্যাপসিকাম ও টমেটো দিয়ে নেড়ে নিন। এরপর কড়াইতে ১ কাপ পানি দিন। সবজি আধা সেদ্ধ হলে ১ চা চামচ ময়দা গুলে তার মধ্যে ঢেলে নেড়ে দিন। ঘন হয়ে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

বাঁধাকপি ভাজি

বাঁধাকপি কুচি	*৩ কাপ*	*সয়াসস*	*২ টেবিল চামচ*
গাজর কুচি (মাঝারি)	*১টি*	*লেবুর রস*	*২ টেবিল চামচ*
পেঁয়াজ কুচি	*১টি*	*পানি*	*২ টেবিল চামচ*
পুদিনা পাতা কুচি	*২ টেবিল চামচ*	*আখের গুড়*	*½ চা চামচ*
ধনেপাতা কুচি	*২ টেবিল চামচ*	*লেবুর খোসা (গ্রেট)*	*১ টেবিল চামচ*
তুলসীপাতা কুচি	*২ টেবিল চামচ*	*তিল (ভাজা)*	*১½ চা চামচ*

প্রণালি : বাঁধাকপি গাজর পেঁয়াজ ধনেপাতা তুলসীপাতা ও পুদিনা পাতা ধুয়ে ঝুরি করে কেটে একটি বড় বাটিতে মিশিয়ে নিন। এরপর সয়াসস পানি গুড় এবং লেবুর রস, গ্রেট করা লেবুর খোসা ভালো করে মিশিয়ে নিন। পরিবেশন করার আগে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করুন। পরিবেশনের সময় ভাজা তিল ওপরে ছড়িয়ে দিন।

ভাত খিচুড়ি

নরম গরম খিচুড়ি (তরল খিচুড়ি)

চাল	*১০০ গ্রাম*	*বেরেস্তা*	*২ টেবিল চামচ*
মসুরের ডাল	*১০০ গ্রাম*	*শুকনো মরিচ*	*৩টি*
হলুদ গুঁড়ো	*½ চা চামচ*	*ধনেপাতা কুচি*	*২ টেবিল চামচ*
মরিচ গুঁড়ো	*½ চা চামচ*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*

প্রণালি : একটি হাঁড়িতে ৬০০ মি.লি. পানি নিয়ে ফুটান। এর মধ্যে হলুদ মরিচ লবণ দিন।

চাল ও ডাল ভালো করে ধুয়ে ফুটন্ত পানিতে দিন। তারপর ১০ মিনিটের জন্যে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। ১০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে দেখুন খিচুড়ি তৈরি হয়ে গেছে। এবার একটি বড় কড়াইতে শুকনো মরিচ টেলে খিচুড়ি কড়াইতে ঢেলে দিন। তারপর বেরেস্তা ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পর সুস্বাদু নরম গরম খিচুড়ি একটি সুন্দর ডিশে পরিবেশন করুন।

পাঁচমিশালি খিচুড়ি

চাল	*২৫০ গ্রাম*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
পাঁচ রকমের ডাল	*২৫০ গ্রাম*	*গরম মসলা*	*পরিমাণমতো*
হলুদ গুঁড়ো	*১/২ চা চামচ*	*গরম পানি*	*৭৫০ গ্রাম*
মরিচ গুঁড়ো	*১/২ চা চামচ*		

প্রণালি : চাল ও ডাল ভালো করে ধুয়ে ৭৫০ গ্রাম ফুটন্ত পানি দিয়ে একটি পাত্রে চুলায় বসান। তারপর হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, গরম মসলা ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে ভালো করে নেড়ে ১৫ মিনিটের জন্যে একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। ১৫ মিনিট পর ঢাকনা খুলে নেড়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল পাঁচমিশালি খিচুড়ি।

ভুনা খিচুড়ি

মুগ ডাল	*১ কাপ*	*দারুচিনি (২ সে.মি.)*	*৩ টুকরো*
পোলাও-এর চাল	*২ কাপ*	*আদা মিহি কুচি*	*২ চা চামচ*
তেজপাতা	*১টি*	*পানি (ফুটানো)*	*৫ কাপ*
লবঙ্গ	*২টি*	*লবণ*	*১১/২ চা চামচ*
সরিষার তেল	*১ চা চামচ*		

প্রণালি : মুগ ডাল ভেজে নিন। চাল ও ডাল ধুয়ে পানি ঝরান। সরিষার তেলে আদা ও তেজপাতা দিয়ে চুলায় দিন। এরপর চাল ডাল লবঙ্গ দারুচিনি দিয়ে ভাজুন। ভাজা হলে ফুটানো পানি ও লবণ দিয়ে নাড়ুন। ফুটে উঠলে ঢেকে দিন। মৃদু জ্বালে ২০-২২ মিনিট ফুটান। বেরেস্তা দিয়ে ভুনা খিচুড়ি সাজিয়ে পরিবেশন করুন। [হলুদ, মরিচ দিয়ে ঝাল ভুনা খিচুড়িও তৈরি করতে পারেন]

সবজি খিচুড়ি

পোলাও-এর চাল	*১/৩ কাপ*	*গাজর (ছোট)*	*১টি*
মসুর ডাল	*১/৪ কাপ*	*পেঁয়াজ*	*২টি*
জিরা	*১ চা চামচ*	*তেজপাতা*	*১টি*
আলু	*১টি*	*সরিষার তেল*	*২ চা চামচ*

ফুলকপি	*১/৪ কাপ*	*লবণ*	*১১/২ চা চামচ*
মটরশুঁটি	*১/৪ কাপ*	*পানি*	*২ কাপ*

প্রণালি : আলু এবং ফুলকপি তেলে ভেজে তুলে রাখুন। তেলে পেঁয়াজ দিয়ে সামান্য ভেজে জিরা এবং তেজপাতা দিয়ে আরো কিছুক্ষণ ভাজুন। এরপর চাল ডাল গাজর এবং মটরশুঁটি দিন। সব একত্রে ভেজে লবণ এবং পানি দিয়ে নাড়ুন। ফুটে উঠলে ভাজা সবজি দিয়ে ঢেকে দিন। ২০-২২ মিনিট পর চাল সেদ্ধ হলে এবং সবজি নরম হলে নেড়ে চুলা থেকে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

মটরশুঁটি-বাসমতির ভাত

বাসমতি চাল	*১ কাপ*	*শুকনো তুলসীপাতা*	*১/২ চা চামচ*
মটরশুঁটি	*২ কাপ*	*লবণ*	*১ চা চামচ*
পেঁয়াজ কুচি	*১/২ টি*	*মরিচ গুঁড়ো*	*১/২ চা চামচ*
রসুন কুচি	*১ কোয়া*	*সবজি স্টক [পৃ. ৩০৪]*	*২ কাপ এবং ২ টেবিল চামচ*

প্রণালি : বাসমতি চাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। ২ টেবিল চামচ সবজি স্টক একটি পাত্রে নিয়ে গরম করে তাতে পেঁয়াজ রসুন কুচি ও শুকনো তুলসীপাতা দিয়ে ২ মিনিট জ্বাল করুন। এবার ২ কাপ সবজি স্টক, চাল, লবণ এবং মরিচ গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে অল্প আঁচে ২০ মিনিট রান্না করুন। ২০ মিনিট পর ঢাকনা সরিয়ে মটরশুঁটি মিশিয়ে আরো ৫ মিনিট রান্না করুন। এবার প্লেটে বেড়ে অন্যান্য সবজি ও সালাদের সাথে পরিবেশন করুন।

লাল চালের ভাত ও সবজি মিক্স

লাল চাল	*১ কাপ*	*পুদিনা পাতা কুচি*	*১/২ কাপ*
টমেটো (বড়)	*২টি*	*লেবুর খোসা কুচি*	*১টি*
ধনেপাতা কুচি	*১ কাপ*	*লেবুর রস*	*১/২ কাপ*
রসুন কুচি	*১ কোয়া*	*আঙুরের রস*	*১/৪ কাপ*
তুর্কি পেঁয়াজ	*১টি*	*লেটুস পাতা*	*১টি*
পেঁয়াজপাতা কুচি	*৪টি*	*পানি*	*১ কাপ*
শসা	*১টি*		

প্রণালি : চাল ধুয়ে একটি পাত্রে পানি দিয়ে চুলায় বসান। ভাত হয়ে গেলে মাড় ঝরিয়ে নিন। এবার গরম ভাত একটি বড় বাটিতে নামিয়ে তার মধ্যে টমেটো কুচি, ভালো করে মেশান যেন টমেটোর রস ভাতের সাথে মিশে যায়। এবার ধনেপাতা রসুন পেঁয়াজপাতা পেঁয়াজ ও শসা কুচি ভাতের সাথে মেশান। এর মধ্যে লেবুর খোসা কুচি, লেবু ও আঙুরের রস দিন। এরপর সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঠান্ডা করে প্লেটে বেড়ে ওপরে লেটুস পাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ডাল

লাউ ডাল

ছোলার ডাল	*২ টেবিল চামচ*	*গরম মসলা গুঁড়ো*	*১ চা চামচ*
লাউ	*১০০ গ্রাম*	*তেল*	*১ চা চামচ*
শুকনো মরিচ গুঁড়ো	*১ চা চামচ*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
জিরা	*১ চা চামচ*	*হলুদ গুঁড়ো*	*১ চা চামচ*

প্রণালি : প্রথমে ডাল অল্প সেদ্ধ করে নিন। লাউ ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ভালো করে ধুয়ে তাতে লবণ মরিচ ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে নরম করে সেদ্ধ করে নিন। এবার চুলায় কড়াই দিয়ে গরম হলে তেল দিয়ে জিরা সামান্য ভেজে নিন এবং সেদ্ধ ডাল ও লাউ দিয়ে দিন। সামান্য ফুটলে নামিয়ে নিন এবং ওপরে গুঁড়ো গরম মসলা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।
[**বি. দ্র.** যে-কোনো ডাল দিয়ে লাউ ডাল তৈরি করতে পারেন]

মিক্সড সবজি-ডাল

গাজর	*১ কাপ*	*ধনে বাটা*	*২ চা চামচ*
লাউ	*১ কাপ*	*এলাচ*	*৪টি*
ফুলকপি	*১ কাপ*	*দারুচিনি (২ সে.মি.)*	*৩টি*
ওলকপি	*১ কাপ*	*তেজপাতা*	*১টি*
ছোলার ডাল	*২ কাপ*	*কাঁচামরিচ*	*৪টি*
মটর ডাল	*১/২ কাপ*	*লবণ*	*২ চা চামচ*
মুগ ডাল	*২ কাপ*	*ধনেপাতা কুচি*	*৩ টেবিল চামচ*
আদা বাটা	*১/২ চা চামচ*	*পেঁয়াজ স্লাইস*	*২ চা চামচ*
রসুন বাটা	*১/২ চা চামচ*	*আদা কুচি*	*১ চা চামচ*
হলুদ বাটা	*১ চা চামচ*	*জিরা বাটা*	*২ চা চামচ*
মরিচ বাটা	*১/২ চা চামচ*		

প্রণালি : সবজি ২ সে.মি. চৌকো টুকরো করুন। গাজর অপেক্ষাকৃত ছোট টুকরো করুন। মুগ ডাল অল্প টেলে নিন। সবগুলো ডাল মিশিয়ে হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। ডালে সবজি, বাটা মসলা, গরম মসলা, তেজপাতা, লবণ ও ৬ কাপ পানি দিয়ে সেদ্ধ করুন। সবজি ভালোভাবে সেদ্ধ হলে এবং ডাল সেদ্ধ হয়ে ঘন হলে কাঁচামরিচ লবণ ও ধনেপাতা দিয়ে নামান। গরম কড়াইতে পেঁয়াজ এবং আদা কুচি ভেজে ডাল বাগাড় দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

পালং-মুগ ডাল

মুগ ডাল	*১৫০ গ্রাম*	*জিরা*	*১ চা চামচ*
পালং শাক	*২৫০ গ্রাম*	*মরিচ গুঁড়ো*	*১ চা চামচ*
পানি	*৫-৬ কাপ*	*লেবুর রস*	*১ চা চামচ*
হলুদ বাটা	*১ চা চামচ*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
ধনে গুঁড়ো	*১ চা চামচ*	*আদা কুচি*	*১ টেবিল চামচ*

প্রণালি : প্রথমে মুগ ডাল সামান্য বাদামি করে ভেজে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি পাত্রে মুগ ডাল, পানি, হলুদ, ধনে, আদা কুচি দিয়ে ভালোভাবে সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ হলে লবণ দিন। ডালঘুটনি দিয়ে ডাল ভালোভাবে ঘুটে নিন। সাথে পালং শাকের কুচি মিশিয়ে ৪ মিনিট ফুটান। এবার আরেকটি কড়াই গরম করে জিরা ফোড়ন দিন। জিরা একটু গরম হলে মরিচ গুঁড়ো দিয়ে নেড়েচেড়ে ফোড়নটি ডালের পাত্রে ঢেলে সাথে সাথে ঢেকে দিন। ২-৩ মিনিট পর লেবুর রস মিশিয়ে নেড়েচেড়ে পরিবেশন করুন। [**বি. দ্র.** চাইলে ছোলার ডাল বা মসুর ডাল দিয়ে করতে পারেন। এ-ক্ষেত্রে ডাল ভাজার প্রয়োজন নেই। আর পালং শাকের পরিবর্তে উপকরণ হিসেবে ঝিঙা দিয়ে তৈরি করতে পারেন ঝিঙা-মুগ ডাল]

অড়হর ডালে মিষ্টি আলু

অড়হর ডাল	*১ কাপ*	*গুড়*	*২ চা চামচ*
মিষ্টি আলু	*১১/২ কাপ*	*হলুদ গুঁড়ো*	*১ চা চামচ*
তেঁতুল	*১ টেবিল চামচ*	*হিং (ঐচ্ছিক)*	*সামান্য*
আদা	*১ চা চামচ*	*লবণ*	*১ চা চামচ*
কাঁচামরিচ	*২টি*	*সরিষার তেল*	*১/২ চা চামচ*

প্রণালি : ডাল হালকা গরম পানিতে ধুয়ে নিন। আলু ছোট টুকরো করুন। তেঁতুল অল্প পানিতে ভিজিয়ে ছেনে নিন। আদা ও কাঁচামরিচ মিহি কুচি করে নিন। তিন কাপ ফুটানো পানি দিয়ে অড়হর ডাল চুলায় দিন। অর্ধসেদ্ধ হলে মিষ্টি আলু দিন। মিষ্টি আলু সেদ্ধ হলে আদা, কাঁচামরিচ কুচি, লবণ ও হলুদ দিয়ে কয়েকবার ফুটান। তেঁতুল ও গুড় দিয়ে নেড়ে নামান। মটরের সমান ছোট ছোট টুকরো করে হিং ভেঙে নিন। হিং-এর ফোড়ন দিয়ে ডাল বাগাড় দিন। গরম ডাল পরিবেশন করুন।

শিমের বিচির কাবাব

শিমের বিচি/ রাজমা	*১ কাপ*	*পুদিনা পাতা কুচি*	*১/২ চা চামচ*
পালং শাক	*১ কাপ*	*জিরা গুঁড়ো*	*১ চা চামচ*
রসুন কুচি	*২-৩ কোয*	*কাঁচামরিচ*	*১টি*
পেঁয়াজ কুচি (মাঝারি)	*১টি*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*

প্রণালি : শিমের বিচি/ রাজমা আগের রাতে ভিজিয়ে রাখুন। একটি ব্লেন্ডারে ভেজানো শিমের বিচি/ রাজমা, লবণ, পুদিনা পাতা, কাঁচামরিচ এবং রসুন কুচি নিয়ে ব্লেন্ড করুন। এর সাথে পেঁয়াজ কুচি, জিরা এবং পালং শাক মিশিয়ে নিন। এরপর নিজের পছন্দমতো আকৃতিতে কাবাব তৈরি করুন। এবার চুলায় পানি গরম করে কাবাবগুলো ভাপ দিন ১৫-২০ মিনিট। নিজের পছন্দমতো সালাদ ও চাটনি দিয়ে পরিবেশন করুন। [জমাটবাঁধার জন্যে চাইলে বেসন মেশাতে পারেন।]

ভর্তা

লাউয়ের খোসার ভর্তা

লাউয়ের খোসা	*১১/২ কাপ*	*কাঁচামরিচ*	*৩-৫টি*
পেঁয়াজ মিহি কুচি	*১ টেবিল চামচ*	*লবণ*	*১/২ চা চামচ*
ধনেপাতা কুচি	*১ টেবিল চামচ*	*সরিষার তেল*	*১ চা চামচ*

প্রণালি : লাউয়ের খোসা ধুয়ে অল্প পানিতে সেদ্ধ করুন। এরপর লাউ ও কাঁচামরিচ ব্লেন্ড করে নিন। পেঁয়াজ, ধনেপাতা কুচি, লবণ ও তেল ভালো করে মেখে পরিবেশন করুন। [মিষ্টিকুমড়ার খোসা, কাঁচাকলার খোসা ও পটলের খোসার ভর্তা এভাবে করা যায়। এতে শুকনো মরিচ টেলে দিতে হয়। খোসার মতো লাউয়ের পোক্ত বিচিরও ভর্তা করা যায়।]

ভাপানো শাকপাতার ভর্তা

সজনে পাতা/ কালো কচুর পাতা/ লাউ পাতা/ চালকুমড়ার পাতা/ ধনে ও বিলাতি ধনেপাতা/ থানকুনি পাতা অল্প পানিতে সামান্য ভাপিয়ে বেটে ভর্তা করা যায়। রসুন পেঁয়াজ ও কাঁচামরিচ ছেঁকা তেলে টেলে নিয়ে পাতার সাথে বেটে লবণ ও সরিষার তেল দিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে। সরিষা পাতা শুধু কাঁচা সরিষার তেল ও পেঁয়াজ মাখিয়েও ভর্তা করা যায়।

কালোজিরার ভর্তা

কালোজিরা ঝেড়ে, বেছে, ধুয়ে শুকিয়ে রাখুন। ১ টেবিল চামচ কালোজিরা টেলে নিন। ২টি রসুনের কোষ আলাদা করে তাওয়ায় টালুন। ৩টি শুকনো মরিচ টেলে নিন। রসুনের খোসা ছাড়িয়ে কালোজিরা রসুন শুকনো মরিচ ও ১/৪ চা চামচ লবণ একসাথে সামান্য পানি দিয়ে বেটে নিন।

তিলের ভর্তা

তিল টেলে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে। ২ টেবিল চামচ তিল, ১টি পেঁয়াজ, ২টি শুকনো মরিচ ও ১/৪ চা চামচ লবণ একসাথে অল্প পানি দিয়ে বেটে ভর্তা করে নিন। তাওয়া বা খোলায় কাঁঠালের বিচি টেলে ভর্তা করা যায়।

চাটনি

রসুনের চাটনি

রসুন	*৭-৮ কোয়া*	*গুড়*	*পরিমাণমতো*
কাঁচামরিচ	*৩-৪টি*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
ভিনেগার	*অল্প পরিমাণ*		

প্রণালি : রসুন ও মরিচ কুচিয়ে নিন। ভিনেগারে লবণ ও গুড় মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। ভিনেগার নামিয়ে তাতে রসুন ও মরিচের কুচি দিন। এরপর ঠান্ডা করুন। তৈরি হয়ে গেল রসুনের চাটনি।

বেগুনের ঝাল মসলার চাটনি

জিরা	*১ চা চামচ*	*বেগুন (ছোট)*	*১ কেজি*
মেথি	*১/২ চা চামচ*	*পেঁয়াজ কুচি*	*১/৪ কাপ*
মৌরি	*১ চা চামচ*	*গুড়*	*১/৪ কাপ*
শুকনো মরিচ	*৬টি*	*সরিষার তেল*	*২ চা চামচ*
তেঁতুলের মাড়	*১/৪ কাপ*	*পাঁচফোড়ন*	*১ চা চামচ*

প্রণালি : জিরা, মেথি, মৌরি ও শুকনো মরিচ অল্প টেলে গুঁড়ো করে নিন। তেঁতুল ভিজিয়ে ১/৪ কাপ মাড় ছেনে নিন। বেগুন বোঁটার কাছে জোড়া রেখে লম্বায় ৪-৬ ফালি করে কাটুন। অল্প পানিতে বেগুন অর্ধসেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন। তেলে পাঁচফোড়ন ছেড়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন। পেঁয়াজ হালকা বাদামি রং হলে বেগুন ও লবণ দিয়ে ভাজুন। বেগুন রং ধরলে তেঁতুল, গুঁড়ো মসলা ও গুড় দিয়ে মৃদু আঁচে ঢেকে রাখুন। তেলের ওপর উঠলে নামান। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু চাটনি।

তাহিনা

তিল	*১/৪ কাপ*	*জিরা ভাজা গুঁড়ো*	*২ চা চামচ*
রসুন বাটা	*৪ কোষ*	*লবণ*	*১/২ চা চামচ*
লেবুর রস	*৩ টেবিল চামচ*		

প্রণালি : তিলের খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে ঢেলে ১/৪ কাপ মেপে নিন। তিল শুকনো করে বেটে রসুন বাটা ও লেবুর রস বা সিরকা মেশান। জিরা ও লবণ দিয়ে ভালো করে ফেটে নিন। গুঁড়ো মরিচ দিতে পারেন। মচমচে নিমকি বা নানরুটির সাথে তাহিনা পরিবেশন করুন।

তেঁতুল-খেজুরের চাটনি

খেজুর কুচি	*১ কাপ*	*রসুন*	*৩-৪ কোয়া*
তেঁতুলের মাড়	*১/২ কাপ*	*লেবুর রস (ঐচ্ছিক)*	*পরিমাণমতো*
কাঁচামরিচ	*১টি*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
পানি	*১১/২ কাপ*		

প্রণালি : আধা কাপ তেঁতুল ধুয়ে পানিতে দেড় ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। বিচি বের করে খেজুর কুচি করে কেটে নিন। এবার তেঁতুলের কাথ, খেজুর কুচি, কাঁচামরিচ, রসুন এবং পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। খুব মসৃণ করে ব্লেন্ড করতে হবে। তৈরি হয়ে গেল চাটনি। এই চাটনি আপনি দীর্ঘদিন রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করতে পারেন।

আমলকির চাটনি

আমলকি কুচি	*২৫০ গ্রাম*	*কাঁচামরিচ টুকরো*	*৬টি*
ধনেপাতা কুচি	*১/২ কাপ*	*আদা কুচি*	*১ চা চামচ*
পুদিনা পাতা কুচি	*১/২ কাপ*	*লবণ*	*১ টেবিল চামচ*
লেবুর রস	*১/২ কাপ*		

প্রণালি : আমলকি ধুয়ে বিচি ছাড়িয়ে কুচি করে কেটে নিন। এবার সবগুলো উপকরণ ব্লেন্ডারে দিয়ে ব্লেন্ড করে ঘন পেস্ট তৈরি করুন (ব্লেন্ডার না থাকলে পাটায় পিষে করতে পারেন)। প্রস্তুত হয়ে গেল আমলকির চাটনি।

ক্যাপসিকামের চাটনি

যে-কোনো রঙের ক্যাপসিকাম	*২৫০ গ্রাম*	*লেমন এসেন্স*	*১ চা চামচ*
গুড়	*১০০ গ্রাম*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
লেবুর রস	*১ কাপ*	*পানি*	*পরিমাণমতো*

প্রণালি : ক্যাপসিকাম থেকে দানা ফেলে খুব ঝিরিঝিরি করে কেটে নিন। গরম কড়াইতে আধাকাপ পানির মধ্যে গুড় দিয়ে দিন। ক্যাপসিকাম ছেড়ে আরো কিছুক্ষণ জ্বাল দিন। লবণ দিয়ে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হলে ক্যাপসিকাম মিশ্রণ ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে মসৃণ করে নিন। লেবুর রস দিয়ে কাচের পাত্রে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন সুস্বাদু চাটনি।

পুদিনার চাটনি

পুদিনা পাতা	*১/৪ কাপ*	*রসুন বাটা*	*২ চা চামচ*
তেঁতুলের মাড়	*১ টেবিল চামচ*	*গুড়*	*২ টেবিল চামচ*
লবণ	*১/২ চা চামচ*	*কাঁচামরিচ*	*১টি*

প্রণালি : পুদিনা পাতা ধুয়ে নিন। এবার ব্লেন্ডারে সব উপকরণ দিয়ে ব্লেন্ড করুন। অল্প অল্প করে পানি দিয়ে ব্লেন্ড করুন। মিশ্রণটি ঘন মসৃণ না হওয়া পর্যন্ত ব্লেন্ড করুন। তৈরি হয়ে গেল পুদিনার চাটনি। এই চাটনি আপনি ২-৩ দিন রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করতে পারেন।

হামোজ

মটর/ ছোলার ডাল	*১ কাপ*	*লেবুর রস*	*২ টেবিল চামচ*
পানি	*৫ কাপ*	*জিরা গুঁড়ো*	*৩/৪ চা চামচ*
তেজপাতা	*৫-৬টি*	*শুকনো মরিচ গুঁড়ো*	*১/৪ চা চামচ*
তিল	*১/২ কাপ*	*গোলমরিচ গুঁড়ো*	*১/৪ চা চামচ*
পেঁয়াজ কুচি	*৩/৪ কাপ*	*লবণ*	*৩/৪ চা চামচ*
রসুন	*১ কোয়া*	*ধনেপাতা/ পুদিনা পাতা কুচি*	*১ টেবিল চামচ*
টমেটোর রস	*২/৩ কাপ*		

প্রণালি : মটর/ ছোলার ডাল ধুয়ে সারারাত পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর পানি ঝরিয়ে একটি পাত্রে নিন। ৫ কাপ পানি এবং তেজপাতা দিয়ে সেদ্ধ করুন। পানি ফুটে উঠলে চুলার আঁচ কমিয়ে দেড় ঘণ্টা রান্না করুন। অথবা ডাল পুরোপুরি নরম হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুলায় রেখে তারপর নামান। পানি ছেঁকে ডাল আলাদা করে একটি ব্লেন্ডারে নিন। তার সাথে পেঁয়াজ কুচি, রসুন, টমেটোর রস, লেবুর রস, জিরা গুঁড়ো, শুকনো মরিচ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, তিল ও লবণ দিয়ে খুব মসৃণ করে ব্লেন্ড করুন। এবার একটি বাটিতে ধনেপাতা বা পুদিনা পাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।
[এটা আপনি চিতই পিঠা/ রুটি/ বিস্কুট/ সালাদের সাথে পরিবেশন করতে পারেন।]

পালং-মটর চাটনি

পালং শাক কুচি	*২ কাপ*	*রসুন*	*৪-৬ কোয়া*
সেদ্ধ মটর	*২ কাপ*	*লবণ*	*১½ চা চামচ*
লেবুর রস	*⅓ কাপ*	*জিরা গুঁড়ো*	*১ চা চামচ*
তাহিনা (পৃ. ৩১৬)	*১ টেবিল চামচ*	*মরিচের গুঁড়ো*	*¼ চা চামচ*

প্রণালি : পালং শাক ধুয়ে পানি ঝরিয়ে কুচি করে কেটে নিন। এবার একটি ব্লেন্ডারে সেদ্ধ মটর তাহিনা রসুন লবণ জিরা মরিচ এবং লেবুর রস দিয়ে মসৃণ করে ব্লেন্ড করুন। প্রয়োজন হলে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে ব্লেন্ড করুন। এবার পালং শাক দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। এবার একটি ঢাকনা দেয়া প্লাস্টিকের বক্সে নিয়ে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। এটি আপনি সবজি রুটি অথবা পিঠা দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

কাজুবাদামের চাটনি

কাজুবাদাম (ভিজানো)	*১½ কাপ*	*লেবুর রস*	*১ টেবিল চামচ*
গোলমরিচ গুঁড়ো	*১ চিমটি*	*কাঁচামরিচ*	*১টি*
পানি	*পরিমাণমতো*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
রসুন	*২ কোষ*		

প্রণালি : একটি বাটিতে কাজুবাদাম/ কাঠবাদাম ১-২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পানি ঝরিয়ে সব উপকরণ একটি ব্লেন্ডারে নিয়ে ব্লেন্ড করুন। মসৃণ না হওয়া পর্যন্ত ব্লেন্ড করুন। সবজি অথবা ফলের সাথে পরিবেশন করুন। [**বি. দ্র.** হৃদরোগীরা খাবেন না]

ডুমুর-স্ট্রবেরি মোরব্বা

কমলার রস	*১½ কাপ*	*ভিনেগার*	*১ টেবিল চামচ*
আঙুরের রস	*১ কাপ*	*ডুমুর*	*১৫-২০টি*
লেবুর রস	*৩ টেবিল চামচ*	*পাকা কলা*	*১টি*
আদা কুচি	*½ চা চামচ*	*স্ট্রবেরি*	*৩ টেবিল চামচ*
মধু	*২ টেবিল চামচ*	*পুদিনা পাতা*	*৮টি*

প্রণালি : একটি কাঁটা-চামচ দিয়ে ডুমুরের চারপাশ কেচে নিন। কলা খোসা ছাড়িয়ে ¼ ইঞ্চি পুরু স্লাইস করে কেটে নিন। স্ট্রবেরি ধুয়ে কেটে নিন। কমলার রস, আঙুরের রস ও লেবুর রস একটি স্টেইনলেস স্টিলের পাত্রে মিশিয়ে এর সাথে আদা কুচি, মধু এবং ভিনেগার মিশিয়ে জ্বাল দিন। এবার কেটে রাখা ফল জ্বাল করা রসে ডুবিয়ে দিন। চুলা থেকে নামান। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঠান্ডা করুন। এরপর ১ ঘণ্টা রেফ্রিজারেটরে রাখুন। কাচের বাটিতে বেড়ে পুদিনা পাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ডেজার্ট

খেজুরের হালুয়া

আটা	*৪০০ গ্রাম*	*জাফরান রং*	*১/২ চা চামচ*
খেজুর	*৪০০ গ্রাম*	*গুড়*	*পরিমাণমতো*
গোলাপজল	*১ কাপ*	*লবণ*	*পরিমাণমতো*
এলাচ গুঁড়ো	*১ চা চামচ*		

প্রণালি : প্রথমে চুলায় একটি কড়াই চাপিয়ে আটা ভেজে নিন। বাদামি না হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। এতে গোলাপজল এবং বিচি ছাড়ানো খেজুরের কুচি দিন। নেড়ে দিয়ে পরিমাণমতো গুড় দিন। এবার এলাচ গুঁড়ো এবং জাফরান রং গুলে ৫ মিনিট নাড়ুন। নামিয়ে ওপরে কিছু খেজুর কুচি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

গাজরের হালুয়া

গাজর (গ্রেট করা)	*১ কাপ*	*শুকনো আদা গুঁড়ো*	*১ চিমটি*
গুড়	*৩/৪ কাপ*	*কাঠবাদাম কুচি*	*৩টি*
কাজুবাদাম (ভাজা)	*১/২ কাপ*	*কিশমিশ*	*১০-১২টি*
এলাচ গুঁড়ো	*১ চিমটি*	*পানি*	*পরিমাণমতো*

প্রণালি : গ্রেট করা গাজর ১০-১৫ মিনিট সেদ্ধ করুন। এরপর পানি ঝরিয়ে নিন। গাজরের পানি দিয়ে কাজুবাদাম ব্লেন্ড করে নিন। এর সাথে এলাচ ও আদা গুঁড়ো মিশিয়ে তৈরি করুন কাজুবাদামের ঘন পেস্ট। এখন সেদ্ধ করা গাজর একটি বাটিতে নিন। এর সাথে গুড় অথবা মধু এবং কাজুবাদামের পেস্ট একটি চামচ দিয়ে ভালো করে মেশান। এবার এর ওপর কাঠবাদাম কুচি ও কিশমিশ দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

[**বি. দ্র.** হৃদরোগীদের জন্যে বাদাম বাদ দিয়ে তৈরি করুন]

সুইট ডিলাইট

কলা	*১টি*	*কাজুবাদাম (ভিজানো)*	*১০টি*
আপেল	*১/২ টি*	*নারিকেল*	*১ টুকরো*
কিশমিশ (ভিজানো)	*৫-৬টি*	*খেজুর কুচি*	*৩টি*
কাঠবাদাম (ভিজানো)	*৫-৬টি*		

প্রণালি : কলা ও আপেল খোসা ছাড়িয়ে কুচি করে একটি বাটিতে নিন। কাজুবাদাম

নারিকেল এবং খেজুর ব্লেন্ড করে ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। পেস্ট ফল কুচির সাথে মিশিয়ে নিন। কিশমিশ এবং কাঠবাদাম দিয়ে নেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে পরিবেশন করুন। [**বি. দ্র.** হৃদরোগীদের জন্যে বাদাম বাদ দিয়ে তৈরি করুন]

তিলের লাড্ডু

তিল গুঁড়ো	*১ কাপ*	*খেজুর কুচি*	*১ কাপ*
তিল	*২ টেবিল চামচ*	*শুকনো আদা গুঁড়ো*	*১/৪ কাপ*

প্রণালি : ১ কাপ তিলকে ভালো করে ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে নিন। এবার এর সাথে খেজুর কুচি এবং শুকনো আদার গুঁড়ো মিশিয়ে ব্লেন্ড করুন। এবার গোল গোল করে লাড্ডু বানান। একটি প্লেটে ২ টেবিল চামচ তিল নিয়ে তৈরি করা লাড্ডুগুলো তিলে আবৃত করুন। এবার আরেকটি প্লেটে লাড্ডু সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

গাজরের কেক

গাজর	*১টি*	*বেকিং সোডা*	*১ চা চামচ*
লাল আটা	*১১/২ কাপ*	*লবণ*	*১/৪ চা চামচ*
লাল চালের গুঁড়ো	*১/৪ কাপ*	*মধু*	*৩/৪ কাপ*
দারুচিনি গুঁড়ো	*১ চা চামচ*	*জয়ফল*	*১/৪ চা চামচ*
গরম মসলা	*১ চা চামচ*	*কিশমিশ*	*১ কাপ*
লবঙ্গ	*১/২ চা চামচ*	*পানি*	*১১/২ কাপ*
বেকিং পাউডার	*১১/২ চা চামচ*		

প্রণালি : গাজর ধুয়ে গ্রেট করে নিন। এবার একটি বাটিতে শুকনো উপকরণগুলো—গরম মসলা, দারুচিনি গুঁড়ো, জয়ফল, লবঙ্গ, লাল আটা, লাল চালের গুঁড়ো, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা ও লবণ মিশিয়ে নিন। আরেকটি বাটিতে ভেজা উপকরণগুলো—গ্রেট করা গাজর কিশমিশ মধু ও পানি মিশিয়ে নিন।

এবার ভেজা উপকরণের বাটিতে শুকনো উপকরণগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিন। খুব বেশি ফেটানোর দরকার নেই। একটি স্টিলের বাটিতে উপকরণের মিশ্রণটি ঢালুন। এবার চুলায় একটি তাওয়া বসান। তার ওপর একটি বড় হাঁড়ি এবং তার ভেতরে ঢাকনাসহ স্টিলের বাটিটি ২ ঘণ্টা রাখুন। [চুলায় কেক যে পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়, সেই একই পদ্ধতিতে গাজরের কেক বেক করতে হবে।] যদি ওভেন থাকে তাহলে বেক করা খুব সহজ। ৩৫০° ফা. (১৭৬° সে.) তাপমাত্রায় ওভেন গরম করে নিন। তারপর স্টিলের বাটিতে দেয়া উপকরণটি সোয়া ঘণ্টা বেক করুন। কেক জমেছে কিনা বোঝার জন্যে একটি টুথপিক ঢুকিয়ে বের করুন। যদি টুথপিকের গায়ে কোনো উপকরণ না লাগে, তাহলে কেক বেক হয়ে গেছে। আর যদি আঠালো উপকরণ লেগে থাকে, তাহলে আরো কিছুক্ষণ বেক করতে হবে। বেক হয়ে গেলে নামিয়ে ঠান্ডা করে প্লেটে পরিবেশন করুন।

কলার কেক

লাল আটা	*২ কাপ*	*আপেলের রস*	*১/২ কাপ*
ময়দা	*১/২ কাপ*	*মধু*	*২ চা চামচ*
বেকিং পাউডার	*১ চা চামচ*	*কিশমিশ*	*১/২ কাপ*
বেকিং সোডা	*১/৪ চা চামচ*	*পানি*	*২/৩ কাপ*
পাকা কলা	*৪টি*		

প্রণালি : কলা খোসা ছাড়িয়ে একটি বাটিতে ভালোভাবে চটকে নিতে হবে। এবার বাটিতে ভেজা উপকরণগুলো—কলা মধু কিশমিশ পানি ও আপেলের রস মেশান। আরেকটি বাটিতে শুকনো উপকরণগুলো—লাল আটা, ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন। এবার ভেজা উপকরণের সাথে শুকনো উপকরণগুলো অল্প অল্প করে চামচ দিয়ে মিশিয়ে নিন। এবার মিশ্রণটি একটি স্টিলের বাটিতে ঢেলে নিন। এরপর চুলায় একটি তাওয়া বসান। তার ওপর একটি বড় হাঁড়ি এবং তার ভেতরে ঢাকনাসহ স্টিলের বাটিটি ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট রাখুন। [চুলায় কেক যে পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়, সেই একই পদ্ধতিতে কলার কেক বেক করতে হবে।]

যদি ওভেন থাকে তাহলে ৩৫০° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ওভেন গরম করে নিন। তারপর স্টিলের বাটিতে দেয়া উপকরণটি ১ ঘণ্টা বেক করুন। কেক হয়ে গেলে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। কেটে পরিবেশন করুন।

তিসির প্যানকেক

গম	*১ কাপ*	*লেবুর রস*	*২ চা চামচ*
তিসি	*১ টেবিল চামচ*	*বেকিং পাউডার*	*২ চা চামচ*
পানি	*২ কাপ*	*বেকিং সোডা*	*১/২ চা চামচ*
বেসন	*১/৩ কাপ*	*লবণ*	*১/২ চা চামচ*
মধু	*১ টেবিল চামচ*		

প্রণালি : একটি ব্লেন্ডারে গম, তিসি এবং পানি নিয়ে ২ মিনিট ব্লেন্ড করুন। এরপর বেসন দিয়ে আরো ২ থেকে ৩ মিনিট ব্লেন্ড করে মসৃণ করুন। এবার বাকি সব উপকরণ দিয়ে আরো কিছুক্ষণ ব্লেন্ড করুন। এবার একটি তাওয়া চুলায় বসিয়ে গরম করে চুলার আঁচ কমিয়ে দিন। ১/৩ কাপ মিশ্রণ তাওয়ায় দিন। চিতই পিঠার মতো আকৃতি হবে। ২-৩ মিনিটে প্যানকেক ফুলে উঠলে উল্টে দিতে হবে। অপর দিকও সেঁকে নামিয়ে নিন (প্যানকেক ফুলে উঠবে কিন্তু পুড়ে যেন না যায়)। এভাবে বাকি মিশ্রণ দিয়ে আরো কয়েকটি প্যানকেক তৈরি করে নিন।

প্রিয় পাঠক,

এ বইয়ের কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

ডা. মনিরুজ্জামান

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব ॥ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

বাড়ি-২৩, রোড-১, ব্লক-এ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

E-mail : dr.monir@quantummethod.org.bd
dr.ataur@quantummethod.org.bd

তথ্যসূত্র :

1. Program for Reversing Heart Disease : The only System Scientifically Proven to Reverse Heart Disease without Drugs or Surgery. Author : Dean Ornish, MD
2. The Spectrum. Author : Dean Ornish, MD
3. Eat More Weigh Less. Author : Dean Ornish, MD
4. Prevent and Reverse Heart Disease : The Revolutionary, Scientifically Proven, Nutrition-Based Cure. Author : Caldwell B Esselstyn Jr. MD
5. Mind Your Heart : A Mind-Body Approach to Stress Management, Exercise and Nutrition for Heart Health. Author : Aggie Casey, MS, RN and Herbert Benson, MD
6. Braunwald’s Heart Disease : A Textbook of Cardiovascular Medicine. (Eighth Edition)
7. Hurt’s The Heart : 12th Edition
8. The China Study : The Most Comprehensive Study of Nutrition Ever Conducted. Author: T. Colin Campbell, PhD and Thomas M. Campbell II, MD
9. Neal Barnard’s Program for Reversing Diabetes: Scientifically Proven System for Reversing Diabetes without drugs. Author : Neal Barnard, MD
10. The End of Diabetes : The Eat to Live plan to Prevent and Reverse Diabetes. Author : Joel Fuhrman, MD
11. The Diabetes Code : Prevent and Reverse Type-2 Diabetes Naturally. Author : Jason Fung, MD
12. Reversing Hypertension : A Vital new Program to Prevent, Treat and Reduce High Blood Pressure. Author : Julian Whitaker, MD
13. The Blue Zones Solutions : Eating and Living like the World’s Healthiest People. Author : Dan Buettner
14. The Blood Code : Unlock the Secrets of Your Metabolism. Author : Dr. Richard Maurer

15. The Complete Guide to Fasting : Heal Your Body Through Intermittent, Alternate-Day and Extended Fasting. Author : Jason Fung, MD
16. The Obesity Code. Unlocking the Secrets of Weight Loss. Author : Jason Fung, MD
17. Whole : Rethinking the Science of Nutrition. Author : T. Colin Campbell, PhD & Howard Jacobson, PhD
18. William's Basic Nutrition and Diet Therapy. Author : Staci Nix
19. Nutrition and Dietetics. Author : Shubhangini A Joshi
20. Recipies to Cure Lifestyle Diseases. Author : Neerja Roy Chowdhury
21. The Whole Foods Diet : The Lifesaving Plan for Health and Longevity. Author : John Mackey, Alona Pulde, MD and Matthew Lederman, MD
22. Fast Food Nation : The Dark Side of the All-American Meal. Author : Eric Schlosser
23. For God, Country & Coca-Cola. Author : Mark Pendergrast
24. 100 ways to Boost Your Immune System. Author : Theresa Cheung
25. Love, Medicine and Miracles. Author : Bernie S. Siegel, MD
26. Davidson's Principles & Practice of Medicine : 23rd Edition
27. How not to die. Author : Michael Greger, MD and Gene stone
28. The Time Magazine (February 23 & March 2, 2015)
29. The Time Magazine (June 6, 2010)
30. www.healthline.com
31. www.heartuk.org.uk
32. www.medicalnewstoday.com
33. www.livescience.com
34. www.nutritionvalue.org
35. www.bbcgoodfood.com
36. www.healthyeating.org
37. www.webmd.com
38. www.health.com
39. www.whfoods.com
40. www.mayoclinic.org
41. www.health.harvard.edu
42. www.hsph.harvard.edu
43. www.nytimes.com
44. www.nejm.org
45. www.dietdoctor.com
46. www.nih.gov
47. www.nature.com
48. www.ncbi.nlm.nih.gov
৪৯. সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড। *লেখক : মহাজাতক*
৫০. রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা। *লেখক : নাহার আল বোখারী*
৫১. জীবনের কিছু কথা। *লেখক : জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক*
৫২. সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন। *সংকলক : ডা. আতাউর রহমান*
৫৩. মাসিক গণস্বাস্থ্য (আগস্ট ২০০৪ ও জুলাই ২০০৮)
৫৪. রান্না খাদ্য পুষ্টি। *লেখক : অধ্যাপিকা সিদ্দিকা কবীর*
৫৫. আধুনিক রান্না খাদ্য ও পুষ্টি। *সংকলক : জাকিয়া ফরহাদ*
৫৬. ভেজিট্যাবল রেসিপি। *সংকলক : খন্দকার আরফিনা আরজু*

কোয়ান্টাম প্রকাশিত আরো বই

কোয়ান্টাম

আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম। সঠিক জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে মেধা ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে অনন্য মানুষে রূপান্তরিত করাই এর লক্ষ্য।

স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে সৃষ্টির সেবায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জাতিতে রূপান্তরিত করাই এর মনছবি। কোয়ান্টাম মেথড অনুশীলন করে সমাজের সর্বস্তরের লাখো মানুষ অশান্তিকে প্রশান্তিতে, রোগকে সুস্থতায়, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। কোয়ান্টাম চর্চার মাধ্যমে আপনিও বদলে দিতে পারেন আপনার জীবন।

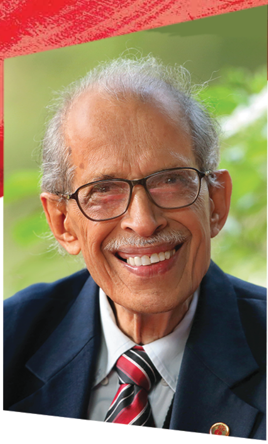

আমাদের মনে রাখা উচিত বাইপাস অপারেশন বা এনজিওপ্লাস্টি স্থায়ী সমাধান নয়, স্থায়ী সমাধান হলো জীবনধারা পরিবর্তন। যুক্তরাষ্ট্রের ডা. ডিন অরনিশ প্রমাণ করেছেন যে, সুস্থ জীবনযাপন, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস, কায়িক পরিশ্রম বা ব্যায়াম, মেডিটেশন বা ধ্যানের মাধ্যমে অনেক হৃদরোগী অপারেশন বা এনজিওপ্লাস্টি ছাড়াই সুস্থ হয়েছেন এবং সুস্থ আছেন।

জাতীয় অধ্যাপক
ব্রিগেডিয়ার (অব.)
ডা. আব্দুল মালিক

অভ্যাস পরিবর্তন করে, মনে শান্তি এনে, নিয়ম মেনে যদি সুস্থ থাকতে পারেন, তবে কেন অনর্থক কাটাছেঁড়া করবেন? আল্লাহ যেটা দিয়েছেন সেটা কেন আপনি নষ্ট করবেন? বিশ্বাস রাখুন, অভ্যাসের পরিবর্তন করুন, খাওয়া-দাওয়া পরিবর্তন করুন, মনে শান্তি আনুন, তাহলেই আপনি ভালো থাকবেন।

প্রয়াত চিকিৎসাবিজ্ঞানী
জাতীয় অধ্যাপক
ডা. নুরুল ইসলাম

প্রকৃতিই সবচেয়ে ভালো নিরাময়কারী! কার্ডিয়াক সার্জারির ইতিহাস খুব বেশি হলে ৫০ বছরের। এর আগে তো মানুষ এটা ছাড়াই বেঁচে ছিল। এখন এটা আমাদের এক বড় চ্যালেঞ্জ। একালের মানুষেরা সারাক্ষণই চায়—তার শরীরটা নিয়ে কিছু করা হোক। বেশিরভাগ মানুষ এখন অসুস্থ, কারণ যে জীবন তারা যাপন করছে, তা-ই তাদেরকে ঠেলে দিচ্ছে অসুস্থতার দিকে।

ডা. দেবী শেঠি
উপমহাদেশের প্রখ্যাত
কার্ডিয়াক সার্জন

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব

quantummethod.org.bd